শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

১ম সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

"শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী"

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌॥

প্রার্থনা।

জগন্মঙ্গল মঙ্গল্যং ভক্তীশং ভক্তবান্ধবং।
ভক্তিপ্রিয়ং ভক্তিগম্যং ভগবন্‌ ত্বাং সমাশ্রয়ে॥
ভক্তিং বর্দ্ধয় দেবেশ ভক্তিং দেহি ত্বয়ি প্রভো।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্তং ভাবং চ সংপ্রযচ্ছ মে॥

হে মঙ্গল ময়! তুমি এক মাত্র মঙ্গল স্বরূপ, তুমিই নিত্য, তুমিই সত্য, মিই পূর্ণ। তোমার নিত্যতা, তোমার সত্যতা, তোমার পূর্ণতা এবং তোমার দল সত্তার প্রভাবে জগতের অনিত্য, অসত্য ও অপূর্ণ বস্তু হইতেও জীব সকল জ নিজ মঙ্গল লাভ করিতেছে। তোমার সর্ব্বোত্তম অদ্বিতীয় মঙ্গলময় ভাবের । হউক। তুমি ভক্তির অধীশ্বর, তুমি ভক্তি দাতা, তুমি ভক্তি প্রিয়, তুমি ক্তির বাধ্য। হে ভক্তি প্রিয়! তোমার চরণে প্রার্থনা করি আমার "ভক্তিকে" া করিও, তোমার চরণে ভক্তি দাও। "ভক্তি" দ্বারা যেন চির জীবন তোমার য়কার্য্য সাধন করিতে পারি। ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া যেন জীবের আধ্যা-

ত্মিক কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতে পারি। আবার ইহাও আশীর্ব্বাদ কর যেন ভক্তিদেবী আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা তোমার ভাব স্মরণ করাইয়া সদানন্দে বাস করেন। প্রভো! তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম তুমি কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখনা! তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা ভাবিলে মহা মহা পাষণ্ডের পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। হে বিশ্বনিয়ামক। তোমার প্রদত্ত ভাব ধারণা করিয়াই যাহা কিছু আনন্দ পাইতেছি, তুমি এক মুহূর্ত্ত ভাল না বাসিলে বাঁচিতে পারিনা। তুমি এক মুহূর্ত্ত ভাব না দিলে হৃদয় শ্মশান তুল্য হইয়া যায়। দিবানিশি তোমার ভালবাসা প্রত্যক্ষ করিয়া তোমার প্রদত্ত ভাবোচ্ছ্বাসের আধার স্বরূপা "ভক্তির" জন্য সাংসারিক সুখ দুঃখ, শারীরিক শান্তি অশান্তি, আর্থিক ভাব অভাব, অবাধে সহ্য করিতেছি। তুমি অন্তর্য্যামী তোমায় বলিয়া বুঝাবার কিছুই নাই। তোমার অমৃতময় করুণা ও জীব বৎসলতা বুঝাইয়া নর নারীকে তোমার ভাবে ভাবিত করিবার প্রত্যাশায় তোমারই প্রদত্ত নিজের ও পরের ভাবোচ্ছ্বাস সকল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ভক্তি পত্রিকারূপ পাত্র ঘরে ঘরে প্রচার করিতে আজ আটবৎসর চলিয়াগেল। তোমারই শক্তিবলে সুখে দুঃখে একরকমে ভক্তির কার্য্য করিয়াছি। হে বিশ্বনিয়ামক! আজ নবম বর্ষের প্রথম দিন তাই তোমার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তোমারই অমোঘ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। ভাব দাও এবং প্রাণের ভাব ভাষায় সরল ভাবে ব্যক্ত করিবার শক্তি দাও, আমি আনন্দ মনে তোমার লীলা তোমার শক্তি তোমার বিশ্ব কর্তৃত্ব তোমার বিশ্বব্যাপিত্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ভক্তি দ্বারা যেন নর নারীর মনের সংশয় দূর করিতে পারি। আর ভক্তির প্রভাবে ভক্ত হইয়া নরনারী ভক্তিভাবে তোমায় ডাকিয়া এবং তোমায় ভালবাসিয়া যাহাতে ভবসাগর পার হইতে পারে তাহার সুপথ যেন দেখাইতে পারি। হে বিশ্বগুরো! দেখ যেন অভিমান আসিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ঠ না করে। আর শক্তি দিও ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া যেন ভ্রান্ত মতের অনুসরণ না করি। তুমি জ্ঞান দাও, বিজ্ঞান দাও, বিবেক দাও, ধৈর্য্য দাও, ধারণা দাও, তোমার প্রদত্ত শক্তি বলে যেন সত্যের প্রভাব দিবানিশি হৃদয়ে জাগরুক থাকে। আর অকপট হৃদয়ে নির্ভয় প্রাণে, সরল ভাষায় সরলভাবে যেন পবিত্র আর্য্যধর্ম্মতত্ত্ব ব্যক্ত করিতে পারি। দীনের আজ ইহাই প্রার্থনা। শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা।

উচ্ছ্বাস ।

—:০:—

(গীতিকা)

ওহে গৌর হরি দীনে কৃপা করি,
স্থান দাও রাঙ্গা চরণে ।
বিষম জ্বালায়, প্রাণ জ্বলে যায়,
বারেক হেরহে করুণা নয়নে ॥

জীবের দুর্গতি করিবারে দূর,
হয়েছ সন্ন্যাসী দয়ার ঠাকুর,
জীবের জীবন করিলে মধুর,
নাম প্রেম রস সিঞ্চনে ।

দুঃখের অনলে এহৃদি আমার,
হইতেছে সদা পুড়ি ছারখার,
করিয়ে করুণা, ঘুচাও যাতনা,
আমি নিবেদি কাতর বচনে ॥

আসিয়াছি আমি বড় আশা ক'রে,
পাদপদ্ম দুটী দাও বক্ষোপরে,
শ্রীপদ পরশে, প্রেমের আবেশে
জুড়াই তাপিত জীবনে ।

অধম বলিয়ে যদি না চাহিবে,
অধম তারণ নাম কেন তবে,
নামের গৌরব, রাখহে মাধব,
বিতরিয়ে কৃপা এ দীনে ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার ।

বৈষ্ণব পদে।

—ঃ*ঃ—

বৈষ্ণব বৈষ্ণব বলি সহজ ত নয়।
বিষ্ণুরে জানিলে সেই বৈষ্ণব নিশ্চয়॥
যে বৈষ্ণব সেই বিষ্ণু বিষ্ণু যে বৈষ্ণব।
অতএব বৈষ্ণব সে ভক্তি যোগ্য হয়॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁরপদে নমঃ শত বার॥
বংশেতে বৈষ্ণব যদি জন্মে একজন।
সেই পুত্র হয় কুল পবিত্র কারণ॥
সুন্ধরা ধন্য মানে তাঁরে শিরেধরি।
জননীকৃতার্থ তাঁর সুপবিত্র পুরী॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁরপদে নমঃ শতবার॥
বৈষ্ণবের সহবাসে থাকে যেই জন।
মলয় চন্দনে যথা কুবৃক্ষ মিলন॥
অকস্মাৎ আসে তায় চন্দনের বাস।
সুবাস আভাষ তাঁর হয় পরকাশ॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নমঃ শত বার॥
ছুন্দরীর সহথাকি বংশ আর সূত।
ছুন্দরীর দরে তাহা হয়ত বিক্রীত॥
মহাপাপী পায় যদি বৈষ্ণবের সঙ্গ।
বহুই তার মুখে নামের তরঙ্গ॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নমঃ শতবার॥

জনমে যাহার কৃষ্ণ নাহি পড়ে মনে।
বৈষ্ণব দেখিলে কৃষ্ণ আইসে স্মরণে॥
যাহারে দেখিলে হয় কৃষ্ণ দরশন।
বুঝ মন সে কখন সামান্য ত নন॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নমঃ শত বার॥
বৈষ্ণবের পদ ধূলী যার গৃহে পড়ে।
গৃহলক্ষ্মী বন্দিরয় নাহি কভু ছাড়ে॥
বৈষ্ণবের পদরেণু করিলে ভক্ষণ।
গোলোকে গমন তার শাস্ত্রের বচন॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নম শতবার॥
বৈষ্ণবের পদ ধূলী থাকুক মাথায়।
তবেত কৃতার্থ মানি বৈষ্ণব কৃপায়॥
বৈষ্ণব হইলে তুষ্ট বিষ্ণু তুষ্টরয়।
অতএব বৈষ্ণব সে ভক্তি যোগ্য হয়॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নমঃ শতবার॥
বৈষ্ণব হইবে যাঁর মনে আছে আশা।
তাঁহার চরণ রেণু পাব করি আশা॥
বৈষ্ণবের দয়া যেন রয় মূঢ় জনে।
ঐপদ বাঞ্ছা করি সদা সর্ব্বক্ষণে॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নমঃ শতবার॥
সহজে সরল সর্প বক্র সেগমনে।
সাধুর সরল মতি বক্র সংগোপনে॥

ভাগ্যে যদি কৃপা হয় দেয় গোপ্যধন।
অকৃপা হইলে নাহি পায় অন্য জন॥

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নমঃ শতবার॥

হে বৈষ্ণব! কৃপা যেন রয় চিরকাল।
ধীবর কালের কাটি জাল মহাজাল॥

খর স্রোত নীরসহ সিন্ধু পায় মীন।
সেই রূপ সাধুসহ তারে দীন হীন॥

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নমঃ শতবার॥

সঙ্গে করি হরিনাম গাইবে সদাই।
আমিও করিব গান তবসঙ্গ পাই॥

সঙ্গ গুণে সর্ব্বক্ষণ পিব গান সুধা।
গান ক'রে দাসইন্দ্র নাশে ভব ক্ষুধা॥

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিন্নাকার।
নমঃ নমঃ তাঁর পদে নমঃ শতবার॥

দীন শ্রীইন্দ্রনারায়ন আচার্য্য।

দম্পতী দর্পণ। (১১)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:o:—

ঐ রূপ ব্যবহার করিলে আমিও তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত থাকিব, তুমিও সংসারে শান্তি পাইবে। উপস্থিত আমার পিতা মাতার আদেশ পালন ও সেবাই তোমার প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ কর, আমি ক্রমিক যেমন আবশ্যক হইবে বুঝাইব। অনেক কুলবধু পতির পিতা মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিয়া তাহাদের কথায় অবাধ্য হইয়া সংসারে এমন একটা অশান্তি প্রবেশ করায় যে, শেষে কিছুইতেই শান্তি স্থাপন করিতে পারনা এবং পতির নিকট হইতেও পবিত্র ভালবাসা লাভে বঞ্চিতা হয়। এইরূপে অশান্ত পরিজনের মধ্যে গঠিত পুত্র কন্যাও গুরুজন বিদ্বেষী অভক্ত ও কপটী হইয়া দুঃখ দেয়।

একবার তাহাদের প্রিয় হইতে পারিলেই সবরকমে সুখ হয়। শ্বশুর শাশুড়ী যদি তোমার আচরণে সন্তোষ লাভ করেন, তবে তাহারা তোমারই

হাতে সংসারের সকল কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিবেন, আর তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইলে চিরদিন সংসারে চাকরাণীর ন্যায় পর ও পরমুখাপেক্ষী ও অবিশ্বাসী হইবে; আমি আমার পিতা মাতাকে শীঘ্রই এমন করিয়া সংসারে রাখিব যে, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মোন্নতির নিমিত্ত দিবা রাত্র যোগ ও তপস্যা করিবেন, তোমাদের নিকট কেবল সময়ে খাদ্য বস্তু পাইলেই যথেষ্ট মনে করিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। গুরুজনের প্রাণ খোলা আশীর্ব্বাদ যে অমোঘ তাহা আমি অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব উপস্থিত যেরূপে আমার পরিজনের সহিত ব্যবহার করিবে তাহা ভাব, অনর্থক কান্দিয়া কি হইবে, যখন যখন তোমার পিতা মাতাকে দেখিতে ইচ্ছা হইবে তখনই দেখিতে পাইবে; ভয় কি!

প্রবোধের বাক্যে সুশীলা রোদন সম্বরণ করিলেন, স্বামী যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে পাল্কি গ্রামের নিকট আসিল, পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থাপিত লোকজন অগ্রসর হইয়া বাদ্যকরদিগকে ডাকাইয়া নানাবিধ বাদ্যোদ্যমে মহা সমারোহে প্রবোধ ও সুশীলাকে লইয়া প্রবোধের পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল।

প্রবোধের বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে ও পুত্রবধূকে নিজের নিকট আনিতে বলিলেন এবং পুত্রকে ও পুত্রবধূকে সস্নেহে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন ও শুভ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, সুশিক্ষিতা সুশীলা কেহ না বলিতে বলিতেই শ্বশুরের চরণে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন, প্রণাম করিয়া অতি ধী ভাবে দাঁড়াইলেন, স্ত্রীগণ আসিয়া যথাযোগ্য স্ত্রী-আচার সমাধান করত উভয়কে ঘরে লইয়া গেল। সুশীলা আজ আর একটী নূতন সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, কাহাকেও জানেনা, এদিকে স্বামীর সনির্ব্বন্ধ আদেশ তাহার আত্মীয় স্বজনকে আপন করিয়া ভাল বাসিতে হইবে। একদিকে মাতা পিতার বিরহ বেদনা অপর দিকে নূতন নূতন লোকের সহিত মিশিবার চেষ্টা এবং যে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহার সদুত্তর দেওয়া, সুশীলা যেন এক মহান্ সংসারের ভাবে প্রবেশ করিয়া সংসার সাগরের নূতন নূতন ভাব তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতেছেন, সুশীলা সুশিক্ষিতা তাই অতি অল্প সময় মধ্যেই নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন. শিক্ষার এমনই গুণ, অশিক্ষিতা হইলে এই সময় দুই চারি মাস কেবল ফুপিয়ে ফুপিয়ে

কান্দিয়া কান্দিয়াই কাটাইত। শাশুড়ীকে অতি বিনীত ভাবে বলিল মা! যত যত লোক আমাকে দেখিতে আসিতেছেন, ইহার মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে কাহার সহিত কি সম্বন্ধ কাহাকে বা নমস্কার করিতে হইবে আমায় বলিয়া দিউন। প্রবোধের বৃদ্ধা জননী পূর্ব্ব হইতে সুশীলা সুশিক্ষিতা একথা শুনিয়া ছিলেন, এক্ষণে সুশীলার ব্যবহারে তাহার পরিচয় পাইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাইলেন, বার বার "এস মা, এস আমার গৃহলক্ষ্মী" ইত্যাদি সাদর সম্ভাষণে আদর করিয়া সকলের নিকট ঐ কথা বলিয়া নিজের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আজ মার পুত্র হইতে পুত্রবধূর প্রতি যেন অধিক ভালবাসা পুত্র বাহির বাটীতে গিয়াছে সেদিকে লক্ষ্য নাই কিন্তু পুত্রবধূকে অতি স্নেহে পুত্র কন্যা হইতেও অতি ভালবাসার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, "আহা বাছা মা বাপ ছাড়িয়া আসিয়াছে বাছা আমার পাল্‌কির মধ্যে গরমে ঘামিয়াছে" এই বলিয়া গায়ের কাপড় খুলিয়া নিজেই হাত বুলাইতেছেন এবং বাতাস করিতেছেন কোলের কাছে লইয়া যখন সুশীলার পৃষ্ঠে বাম হাত দিয়া দক্ষিণ হস্তে বাতাস করিতেছেন তখন সুশীলা শাশুড়ীর কাছে ঐরূপ আদর পাইয়া মাতৃ স্নেহ স্মরণ করিয়া একেবারে অধীরা হইল, শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ও অবিরত চক্ষুর জল ফেলিয়া অস্ফুট স্বরে রোদন করিতে লাগিল। সুশীলার অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধার আর ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না, বৃদ্ধা বুঝিলেন সুশীলার মাকে মনে পড়িয়াছে বৃদ্ধা "এস মা এস মা আমার" এই কথা বলিয়া সুশীলার মুখে হাত দিয়া চক্ষুর জল মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মা আমিও তোমার মা কাঁদ কেন তোমার যখন যাহা ইচ্ছা বলিবে সেখানে যেমন মার কাছে ছিলে এখানে তাহা হইতে কোনরূপ অন্য ভাব মনে করিও না, আমার একমাত্র পুত্র প্রবোধ তাহা হইতে তোমায় পাইয়াছি, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, প্রবোধ হইতেও তুমি আমার স্নেহের পাত্রী, শীঘ্রই তোমার মার সহিত দেখা করাইব। মা আমার তুমি সুশিক্ষিতা তুমি জান যে কন্যা সন্তান চিরদিন বাপমায়ের নিকট থাকে না আমি তোমার মা তুমি আমার সন্তানের ন্যায় অতি স্নেহের পাত্রী ভয় কি মা এখানে তোমার কোন রকম কষ্ট হইবে না। তুমি এ সংসারের সকলেরই স্নেহের পাত্রী। তুমি যদি

শান্ত স্বভাব ও প্রিয়ভাষিণী হইয়া সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পার তবে দেখিবে অতি অল্প সময় মধ্যেই তুমি যশস্বিনী হইবে আর সাধারণঃ স্ত্রী-জাতীর ভাগ্যে যাহা ঘটে না তুমি সেরূপ স্বর্গীয় সুখ এই সংসারে থাকিয়া ভোগ করিতে পারিবে।"

এইরূপে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সুশীলাকে সান্ত্বনা করিয়া প্রবোধের জননী সুশীলার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন, প্রবোধের জননীর সুশীলার প্রতি যথার্থই অপত্যস্নেহ আসিয়াছে, কিসে সুশীলা সুখ পাইবে, কিসে সুশীলা পিতা মাতার অদর্শন জনিত দুঃখ ভুলিয়া যাইবে এবং কিসে সুশীলা সকলকে সুখী করিতে পারিবে, বৃদ্ধা তাহাই ভাবিয়া ভাবিয়া নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রায় সর্ব্বত্রই প্রথম প্রথম এইরূপ সদ্ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ীর অপত্যস্নেহ থাকে। এমন কি গর্ভে ধারণ ও দীর্ঘকাল পোষণ করিয়া পুত্রের প্রতি যে অপত্যস্নেহ প্রগাঢ় রূপে থাকে পুত্রবধূ পাইয়া পুত্র জননীর ঐ গাঢ়তম ভালবাসা যেন দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যে সংসারের এই ভালবাসার প্রতিদান অক্ষুণ্ণভাবে পুত্রবধূও শাশুড়ী উভয়কে আনন্দে রাখিতে পারে সে সংসারে চঞ্চলা লক্ষ্মী যে নিশ্চলা হইয়া বাস করেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতিশয় চঞ্চলমতি অশিক্ষিতা অথবা অর্দ্ধশিক্ষিতা বধূগণ শাশুড়ীকে সন্তোষ না করিয়া শাশুড়ীর হৃদয়ে ব্যথা দিয়া আপন মঙ্গলঘট আপনিই চূর্ণ বিচূর্ণ করে, শ্বশুর শাশুড়ীর অতি স্নেহের পাত্রী পুত্রবধূ অবিনীত স্বভাবা মুখরা ও ভোগ পরায়ণা হইয়া নিজেদের কর্ম্মদোষে স্বামীর পিতামাতা হইতে সুনির্ম্মল অপত্যস্নেহ লাভ করিতে পারে না, কেবল অনিত্য ভোগ সুখ লালসায় দিবারাত্র নিজেদের শারীরিক ভোগের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া পবিত্র ভাব নষ্ট করিয়া স্বামীর ও নিজের বদ্ধমূল অপরিতৃপ্ততা ও অশান্তিই সঞ্চয় করে। অনেক বধূরা আবার শ্বশুর শাশুড়ীকে লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম অর্থাৎ বাহ্যিক বার ব্রতাদির অনুসরণ করিয়া শান্তিলাভের প্রত্যাশা করে। আমরা ভাবিয়া পাই না যে স্ত্রীজাতির একমাত্র অবলম্বনীয় গুরুজন সেবা পরিত্যাগ করিয়া এবং পতির পিতামাতার মনে দুঃখ দিয়া যাহারা তাঁহাদের ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার হেতুভূতা হইয়া যে সকল পাপ সঞ্চয় করে এমন কোন ব্রত

নিয়মাদি নাই যে যাহাদ্বারা ঐ পাপ বিধৌত হইতে পারে। তবে যদি গুরুজন গুরুজনের যোগ্য ব্যবহার না করেণ সে পৃথক কথা। আজ কাল প্রায় অধিকাংশ সংসারে প্রায়ই শাশুড়ী ও পুত্রবধূর অকপট মিলন দেখা যায় না। ইহা অশিক্ষার পরিণতি, আর ইহার প্রধান কারণ পুরুষেরা বিবাহ করিয়াই স্ত্রী হইতে অমানুষিক ব্যবহার প্রত্যাশা করে। সুতরাং পুরুষের স্ত্রীকে সদুপদেশ না দিয়া একেবারে স্ত্রীর বাধ্য হওয়াই এই অনর্থকতার মুলীভূত কারণ।

ভাগ্যবতী সুশীলা বিবাহ হইবার পরেই যোগ্য পতি প্রবোধচন্দ্র হইতে যেরূপ সংশিক্ষা ও সদুপদেশ পাইয়াছে আবার শশুর বাড়ী আসিবামাত্র শাশুড়ীর নিকট হইতে যেরূপ সস্নেহ ব্যবহার ও সরল উপদেশ পাইয়াছে এইরূপ ভাবের অনুসরণ করা সকল গৃহস্থ দম্পতীরই উচিত।

প্রবোধের মা তাহার বিধবা কন্যাটীকে ডাকিয়া আনিলেন, সুশীলার নিকট বসাইয়া বলিলেন মা সুশীলা এইটী তোমার ছোট ননদিনী। তুমি ইহাকে আপন সহোদরা ভগ্নীর মত দেখিবে। কখনও পরস্পর পরস্পরকে পর মনে করিবে না। দুজনে সর্ব্বদা একত্রে থাকিবে। তোমার যখন মনে যাহা হইবে আপন ভগ্নীর মতন অনায়াসে ইহাকে বলিবে। যদি কখনও তোমার অবাধ্যা হইয়া সুবালা (প্রবোধের ভগ্নীর নাম সুবালা) তোমার কথার অবহেলা করে বা কোন কার্য্যে তোমার মনে ব্যথা দেয় তবে তুমি তাহা সহ্য করিয়া আমাকে বলিবে। আমি যথোচিত প্রতিকার করিব। তুমি কখনও ইহার মনে ব্যথা দিও না। দেখ সুবালার তোমরা বই আর কেহই নাই। বাছা আমার স্বামী পুত্র বিরহিতা চিরদুঃখিনী। তোমরাই ইহার প্রতিপালক। আশা করি সুবালা কখনও তোমার অবাধ্যা হইবে না। প্রবোধ সুবালাকে বড়ই ভালবাসে এমন কি সুবালাকে সুশিক্ষিতা ও ধার্ম্মিকা করিবার জন্য প্রবোধ অনেক যত্ন করিয়াছে ও করিতেছে। আমি গৃহাগত আত্মীয় স্বজনের আদর অভ্যর্থনায় চলিলাম একণে তোমরা দু'জনে গল্প কর। এই বলিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া গেলেন সুশীলা ও সুবালা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া লইল উভয় উভয়কে যেন সেই শুভযোগে একেবারে আপন করিয়া লইল। প্রাণ খুলিয়া উভয় উভয়কে প্রাণের কথা বলিতে লাগিল। এই সুবালাকে ভাল বাসিবার জন্য

পূর্ব্ব হইতেই সুশীলা স্বামীর নিকট আদেশ পাইয়া ছিল। এক্ষণে আবার শাশুড়ীর আদেশ পাইয়া আরও উৎসাহিতা হইল। সুশীলার দিন আনন্দে কাটিতে লাগিল। মা বাপের একমাত্র সন্তান সুশীলা সংসারে একাকিনী বৰ্দ্ধিতা হইয়াছে আজ এক নূতন সংসারে নূতন নূতন ভাব ও নূতন নূতন ভালবাসার সঙ্গিনী পাইয়া এক অননুভূত আনন্দ পাইতে লাগিল। সুশীলা ও সুবালার ভালবাসা এতই বাড়িয়া উঠিল যে একজন অপরজনকে ক্ষণকাল না দেখিয়া থাকিতে পারে না। সাংসারিক কাৰ্য্য দুজনেই উৎসাহের সহিত করিতে লাগিল। উভয়েই সুশিক্ষিতা সুতরাং বহু সময়সাধ্য কাৰ্য্যগুলি অতি অল্পসময়ে সমাধা করিয়া দিবসে অনেক সময় পাইতে লাগিল। সাংসারিক কাৰ্য্য যেন কাৰ্য্যই নয়, দেখিতে দেখিতে সমাধা হইয়া যায়। কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। কর্ত্তব্যবোধে দুজনেই উৎসাহিত চিত্তে সংসারের যাবতীয় কাৰ্য্য সুসম্পন্ন করিয়া অনেক সময় গুরুজনের সেবা সৎ আলোচনা ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং প্রতিদিন একটু একটু নূতন নূতন শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। শিক্ষাদাতা প্রবোধ আহারান্তে বিশ্রামের সময় ভগিনী ও সহধর্ম্মিণীকে আপনার নিকটে বসাইয়া যথাযোগ্য সৎশিক্ষা দিতে লাগিলেন। অশিক্ষিতা রমণীগণ সামান্য কাৰ্য্যেতেই ঢিলাম করিয়া দিন কাটায়। সৎশিক্ষা বা সাধন ভজনের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখে না সর্ব্বদা অপরিতৃপ্ত হৃদয়ে সংসারের কাৰ্য্য করিয়া হৃদয়েতে একপ্রকার দুঃখময় অন্ধকারই সঞ্চয় করে। কেহ সৎশিক্ষার কথা বলিলে অমনি বলিয়া উঠে, যে সংসারের কাৰ্য্য করিয়া একটুও সময় পাই না কখন কি করিব ? নিত্য কর্ত্তব্য কাৰ্য্যগুলি শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিলেই যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় শিক্ষার ও সদুপদেষ্টার অভাবে তাহা একবারও ভাবে না। সুশীলা ও সুবালার সুমিলন, সুশীলার পতিভক্তি, সুশীলার সতত শাশুড়ীর প্রতি আন্তরিক ও বাহ্যিক সদ্ব্যবহার অতি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের নরনারীর কর্ণ ও চক্ষুর্গোচর হইয়া দেশের সংসারাশ্রমীদের বিশেষ উপকার করিতে লাগিল। সুশীলার ব্যবহারই যেন দেশের স্ত্রীগণের সৎশিক্ষা দাতা হইল। এবং প্রবোধের সংসার যেন শিক্ষা লাভের বিদ্যালয় স্থানীয় হইয়া উঠিল, একবার যে নরনারী ইহাদের সংসারের ভাব নয়নগোচর করিয়াছে সে আর

ভুলিতে পারে না। এমন কি নিজ নিজ অসৎ ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইয়া সৎ হইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

দীনবন্ধু শর্ম্মা।

পুষ্পাঞ্জলী।

—ঃ·ঃ—

(নব বর্ষের উপহার।)

(১)

প্রভু হে—

এই বার করিয়াছি মনে
মাসন উদ্যানে পশি,
ভাবের প্রসূন রাশি,
তুলে মালা গাঁথিব যতনে॥

(২)

সেই মালা ল'য়ে করে,
রাঙ্গা পাদু'খানি পরে,
হরষেতে দিব পরাইয়ে।
ভক্ত জন মনোলোভা,
কি অপূর্ব্ব হবে শোভা,
সংসার ভুলিব সুধা পিয়ে।

(৩)

তব ভাব ময় দেহ;
আমার এশূন্য গেহ,
ভাবে পূর্ণ কর হিয়া গার।
মাখায়ে ভক্তি চন্দনে,
প্রীতি পুষ্প অরপণে,
পুরাই মনের বাঞ্ছা সার॥

(৪)

বিনা তব কৃপা কণা,
কেমনে হবে অর্চ্চনা?
তাই বলি, হে করুণাময়!
করুণার বারি দিয়ে,
অনুর্ব্বর এহৃদয়ে,
ফুটাও সুগন্ধি ফুলচয়॥

(৫)

শ্রীনাম রূপ স্মরণে,
নব নব ভাব প্রাণে,
সঞ্চারিত হউক্ আমার।
সেই ভাব ফুল ল'য়ে,
দিব আমি সাজাইয়ে,
শ্রীযুগল চরণ তোমার॥

(৬)

ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কারী,
হে দয়াল গৌর হরি!
পূর্ণ কর মনের বাসনা।

নিতু নব ভাব দানে,
কৃতার্থ কর এদীনে,
(করি) গঙ্গোদকে গঙ্গার অর্চ্চনা ॥

(৭)

প্রথম এ পুষ্পাঞ্জলি,
লও শ্রীচরণে তুলি,
হে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কৃপানেত্রে দৃষ্টিপাত,
কর ওহে প্রাণ নাথ!
রসিক কল্মষকালিহর ॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

শ্রীনন্দ-দুলাল।

—ঃ০ঃ—

(ভক্তের ভগবান।)

জয় নন্দ মহারাজ! ধন্য হে তোমায়
গোকুলে তোমার মত কেবা ভাগ্যবান?
কি মহান্ কর্ম্মফলে, কোন্ তপস্যায়
বিরাজেন কুটীরেতে স্বয়ং ভগবান॥
যোগী, যাঁরে মহা যোগে দীর্ঘ কাল ধরি,
ধ্যান করি ক্ষণ তরে পান দরশন।
জ্ঞানী যাঁর পান মাত্র জ্যোতির মাধুরী,
তাহাতেই চরিতার্থ, তৃপ্ত তাঁর মন।
তুমি কোন্ পুণ্য বলে, বল কি সাধনে,
নর রূপে,? পুত্র ভাবে লভিলে হে তাঁরে
বল, হরি বাঁধা পড়ি তব কোন গুণে
আনন্দে, অবাধে বাধা বহিলেন শিরে?
ভকতের প্রতি হরি পরম দয়াল।
তাই কি নন্দের গৃহে শ্রীনন্দ দুলাল?

(২)

শ্রীনন্দ দুলাল নাম বড় মধুময় ;—
পশিয়াছে বহুবার শ্রবণ বিবরে।
কিন্তু আজ শুনে, নব ভাবের উদয়—
হইল, নাচিছে প্রাণ পুলকের ভরে।
ভক্তের শ্রীমুখ হতে উঠিল এ ধ্বনি ;
তাই কি ছুটিল প্রাণে, নবীন উচ্ছ্বাস?
তাই, শতধারে বহে প্রীতি নির্ঝরিণী ;
আঁধার হৃদয়ে নব আলোক প্রকাশ।
নাম শুনে, কমনীয় মূর্ত্তি আসে মনে,
নাম শুনে সাধ হয়, যাই শ্রীগোকুলে,
ইচ্ছা হয়, বিকাইয়ে যাই শ্রীচরণে,
কভু বা বাসনা হয় লই কোলে তুলে।
আনন্দের নিকেতন হে নন্দ দুলাল?
অনুর্ব্বর হিয়া মোর কর হে রসাল॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

সৎপ্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—:০:—

চ। শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপীত্ব সম্বন্ধে তুমি পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছ, তাঁহার চৈতন্য জ্যোতিঃ যে ক্ষিত্যাদি সর্ব্বব্যাপী পঞ্চ ভূতের প্রাণ স্বরূপে অবস্থিত, তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু তিনি যে গীতায় বলিয়াছেন " আমার চক্ষু কর্ণাদি সর্ব্বস্থানেই আছে, " ইহার ভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

র। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা যে দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য হয় প্রথমে তাহার মূল কি তাহা হৃদয়ঙ্গম কর, মৃত্যুর পরে চক্ষু কর্ণাদি অবয়ব বর্ত্তমান থাকিতেও যখন কেহ দেখিতে বা শুনিতে পায়না তখন ইহা নিশ্চয় যে, কেবল চক্ষু কর্ণ ই দর্শন শ্রবণাদির কর্ত্তা নহে, ইহারা দ্বার স্বরূপে উপলক্ষ্য মাত্র। ঘরের ভিতরকার মানুষ দ্বার খুলিয়া বাহিরের বস্তু দর্শন বা শ্রবণ করে, কিন্তু সেই মানুষ যখন ঘরের বাহিরে যায়, তখন কেবল দ্বারের যেমন দর্শন বা শ্রবণ শক্তি থাকেনা, সেইরূপ সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্য বস্তু যাহা জীবদেহে অণু রূপে বিরাজমান আছেন, যাঁহার শক্তি মন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিতেছে, যিনি দর্শন শ্রবণাদি সকল শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ, যে অনোরণীয়ান্ চৈতন্যের মহান্ জ্যোতিঃ প্রাণাদির চালক রূপে দেহভাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত, তিনিই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে মহতো মহীয়ান্ রূপে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের প্রাণ স্বরূপে বিরাজমান আছেন জানিও। অতএব অণুতে যে শক্তি নিহিত আছে, অণুর সমষ্টি স্বরূপ বিরাটে তাহা অনন্ত ভাবে থাকিবেই, সূক্ষ্ম জ্ঞান দৃষ্টির অভাবে যদিও আমরা সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য সত্ত্বাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিনা, কিন্তু সময় বিশেষে সংসার সাগরের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া যখন মোহ জনিত অহঙ্কারের অসারতা বোধ হয়, চিন্তাস্রোত যখন নশ্বর জগতের অতীত স্থানে চলিয়া যায়, তখন কার্য্য দৃষ্টে কারণের ভাব উপলব্ধি হয় মাত্র, ফলতঃ সাধনার দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টির উন্মেষ না হইলে পেচকের সূর্য্যালোক দর্শনের ন্যায় চৈতন্য জ্যোতিঃকে প্রত্যক্ষ্য করিতে পারা যায় না, যুক্তির দ্বারা পরোক্ষ বোধ হয় বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে তিনি যে সর্ব্বদ্রষ্টা,

তাঁহার অপরোক্ষ বোধ হইতে পারেনা, পরোক্ষ বোধ আচ্ছন্ন হইতে পারে কিন্তু অপরোক্ষ বোধে সে ভয় নাই।

শ্রবণাদির দ্বারা যে পরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছ, সাধনের দ্বারা উহাকে অস্থিমজ্জাগত করিয়া যদি অপরোক্ষ জ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পরিণত করিতে পার, তবে চৈতন্য বিভূতির রসাস্বাদ করিতে সক্ষম হইবে ও ক্রমে এই রস পান করিবার লালসা যত বর্দ্ধিত হইবে, ভাব স্রোতে হৃদয় ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, পরে ভাবের পূর্ণতা হইলে সেই রসের উৎস স্বরূপ শ্রীভগবানকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে।

চ। শেষ কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

র। ভাই! লবণের সত্ত্বা সমুদ্র বারির সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত, যে কোন স্থান হইতে জল লইয়া জিহ্বায় দিলে আস্বাদ পাওয়া যায় ও এই আস্বাদ পাওয়াকে অনুভব প্রত্যক্ষ বলে, কিন্তু সেই লবণকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে যেমন তাপাদির আবশ্যক হয়, সেই রূপ পঞ্চভূতের প্রতিঅণুতে যে চৈতন্যসত্ত্বা বিদ্যমান আছে, অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বশক্তি মত্ত্বার প্রত্যক্ষ্যানুভব হয়, সাধক এই সময়ে রসলোলুপ হইয়া ভাবাশ্রয় করিলে ঐ ভাবের তাপে চিৎ পরমাণু সকল ঘনীভূত হইয়া সাধকের বাসনানুযায়ি আকার ধারণ পূর্ব্বক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হন।

চ। ভগবান মানবের ন্যায় সাকার রূপ ধারণ করিয়া সীমাবিশিষ্ট হইলে তাঁহার অনন্ত ভাব বজায় থাকে কিরূপে?

র। তুমি মূর্খের ন্যায় কথা বলিতেছ, অনন্ত হইতে কি বিযুক্ত হওয়া যায়? হিমাধিক্য বশতঃ অনন্ত সমুদ্রের কোন স্থান যদি জমাট বাঁধিয়া বরফে পরিণত হয়, তাহা হইলে কি উহা সমুদ্রের সহিত বিযুক্ত হয়? ফলতঃ আধারগত জীব অনন্তের ধারণা করিতে পারে না, এক পাত্র জলে যাহার তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়, সমুদ্র বারির পরিমাণ করিতে বৃথা প্রয়াস করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এজন্য মহা-কাশের মধ্যে গৃহাকাশের ন্যায় শ্রীভগবান সাধকের ভাব ও ধারণানুযায়ি আকার ধারণ করেন জানিও, পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে তোমাকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অপর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকেত বল।

চ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ সকলের প্রকৃত তত্ত্ব কি? ইহা কি ভগবানের সৃষ্ট না মানবের কল্পনা প্রসূত! মানুষ ত সকলেই, তবে এই উচ্চনীচ ভেদের কারণ কি?

র। ভাই! মানবের কর্ম্মানুযায়ী গুণ ভেদে এই বর্ণ ভেদ শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়াছে, ঋষিগণের মধ্য দিয়া তিনিই জীবের ও সমাজের কল্যানের জন্য এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যতদিন হিন্দুর রাজত্ব ছিল এবং সমাজের উপর রাজার ও রাজার উপর সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণের কর্ত্তৃত্ব ছিল, ততদিন এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সমাজ দেহের প্রকৃত পুষ্টি সাধন করিতেছিল। আপন আপন অধিকারানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সকলেই ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে ছিল, ঋষিগণ জ্ঞান যোগে শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত থাকায় প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন, মানবের বাহ্য অবয়ব দৃষ্টে তাহার অন্তর্নিহিত গুণ সকলের পরিমাণ করিয়া রাজ শক্তির সাহায্যে তাহাকে উচ্চ বা নীচ বর্ণে উন্নীত বা অবনত করিতেন, কষ্ঠি পাথরের সংস্পর্শে যেমন স্বর্ণ আপনার প্রকৃত গুণ লুকাইতে পারেনা সেইরূপ ঋষিগণের জ্ঞান দৃষ্টির নিকট সাধারণের গুণানুযায়ি বর্ণ প্রকাশিত হইয়া পড়িত, তাঁহারা শ্রীভগবানের আদেশ জন সাধারণের নিকট প্রচার করিবার মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু হায়! এখন আর সে দিন নাই, রাজসিক মালিন্যের আধিক্য বশতঃ হিন্দু রাজগণ অধার্ম্মিক হইয়া ঋষিগণের মধ্যবর্ত্তিতা অগ্রাহ্য করায় হিন্দু ধর্ম্মের এই অধঃপতন! মোহ বশে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধান অবহেলা করিবার ফলে হিন্দু গণ আজ শক্তিহীন, এদিকে কলির প্রাধান্যে সনাতন ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া প্রকৃত ঋষিগণ অনধিকারীর নিকট গুপ্ত হইয়া সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, ফলে শাসনঅভাবে অজ্ঞানমত্ত জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে আপনাদের মঙ্গল ঘট পদদলিত করিতেছে, সুতরাং প্রকৃত বর্ণ নির্ণয় করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিবার জ্ঞানাভাব বশত সমাজ এ ক্ষণে বর্ণ শঙ্করে প্লাবিত!! এই জন্যই সাধুগণ সমাজের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখেন না, গুণগত বর্ণ জ্ঞান থাকায় তাঁহারা জন্মগত বর্ণের বিশুদ্ধতাস্বীকার করেন না, হয়ত জন্মগত শূদ্র বর্ণের মধ্যে গুণগত ব্রাহ্মণত্ব দেখিয়া তাহার সঙ্গ করেন, আবার জন্মগত ব্রাহ্মণের মধ্যে চণ্ডালত্ব দেখিয়া তাহার ছায়া স্পর্শ করেন না।

ভাই! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়াতেই হিন্দু ধর্ম্মের মহান্ ভাব মেঘাচ্ছন্ন তপনের ন্যায় তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে, কেননা বর্ণজ্ঞান না থাকিলে সঙ্গ নির্ব্বাচিত হয় না, সুতরাং অসৎ সঙ্গের সংযোগে হৃদয়ে মলিন ভাব সঞ্চারিত হইয়া মনকে অবনত করে, ফলে মন মূঢ় ভাবাপন্ন ও ভ্রান্ত হইয়া রোগ, শোকাদি অশান্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া সংসার চক্রে ঘুর্ণিত হয়।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ

অর্থাৎ গুণ জনিত কর্ম্মের বিভাগ পূর্ব্বক আমি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব ইহা নিশ্চয় যে বর্ণভেদ ঐশ্বরিক বিধান, এবং তাঁহার বিধানানুসারে সংসার পথে চলাই ধর্ম্ম, কিন্তু হায়! জীব ভ্রমজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকায় তাঁহার মঙ্গলময় বিধানের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে না, মধু জিহ্বায় না দিয়া কর্ণে ঢালিলে যেমন কষ্টের কারণ হয়, সেইরূপ তাহারা বর্ণের প্রকৃত তত্ত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায় বিপরীত ফল লাভ করে মাত্র।

এইখানে একটি গল্প মনে পড়িল, জনৈক কবিরাজের এক ভৃত্য ছিল, সে একদিন শুনিল যে কবিরাজ তাঁহার ছাত্রগণকে বলিতেছেন "ঘৃতাদষ্ট গুণং তৈলং" অর্থাৎ ঘৃত অপেক্ষা তৈলের গুণ অষ্টগুণ অধিক, সে এই কথা শ্রবণ করিয়া কার্য্যান্তরে গেল ও মনে করিল যে তবে বৃথা অধিক ব্যয় করিয়া ঘৃত ভোজনের আবশ্যক কি! ফলতঃ সেই দিন হইতে সে অন্নাদির সহিত অধিক পরিমাণে তৈল ভোজন করায় কিছু দিনের মধ্যে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল, কবিরাজ তাহার এই দুর্দশা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল মহাশয়! আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি অন্নাদির সহিত অধিক পরিমাণে তৈল ভক্ষণ করিতেছি, এবং তাহাই সম্ভবত আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ, তখন কবিরাজ সমস্ত বুঝিয়া বলিল, মূঢ়! তুই শ্লোকের অপরার্দ্ধ শ্রবণ করিস্ নাই কেন? তৈল ব্যবহারের ফল ঘৃতের অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক বটে, কিন্তু "মর্দ্দনাৎ ন তু ভক্ষণাৎ" অর্থাৎ দেহে মর্দ্দন করিলে এই ফল হয়, ভক্ষণ করিলে নহে।

ভাই! আমাদেরও এক্ষণে এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, ভগবদ্বাক্যের "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" অংশটি আমরা স্বীকার করিলেও উহার অপরার্দ্ধ "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" অংশটি বাদ দেওয়াতেই ব্যবহার দোষে ভাবের বিশুদ্ধতা হারাইয়াছি ও তাহার ফলে আমাদের আধ্যাত্মিক দেহের স্বাস্থ ভঙ্গ হইয়াছে এবং ঐ গ্লানি স্থূল দেহ মনে সঞ্চারিত হইতেছে।

প্রকৃতির তিন গুণ, সত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণের মধ্যে যাহার যে গুণ প্রবল তাহার সেই কর্ম্ম ও সেই গুণানুযায়ি কৃত হয়, এবং এই গুণের ন্যূনাধিক্যই ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদের মূল কারণ, শুদ্ধরজোমিশ্রিত শুদ্ধসত্বগুণের আধিক্যে ব্রাহ্মণ, মলিনসত্ব মিশ্রিত শুদ্ধরজোগুণের আধিক্যে ক্ষত্রিয়, তমোমিশ্র রজোগুণাধিক্যে বৈশ্য ও রজোমিশ্র তমোগুণাধিক্যে শূদ্র, এই চারি বর্ণ লইয়া হিন্দু সমাজ গঠিত, ব্রাহ্মণ এই সমাজ দেহের মস্তক, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উদর ও শূদ্র পদ স্বরূপ, জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহার কার্য্য কারণের সম্বন্ধ বোধ হইয়াছে, তিনি সহজেই কর্ম্মদৃষ্টে গুণের আভাস পাইয়া বর্ণের নির্ণয় করিতে পারেন, অথচ আত্মোন্নতির পিপাসায় অকপট হৃদয়ে যিনি জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হন, শ্রীভগবান তাঁহার বাসনা অপূর্ণ রাখেন না, কিন্তু হায়! সুখ শান্তির নিদান ও ভগবল্লাভের সোপান স্বরূপ যে জ্ঞান, তাহার দিকে কি কাহারও লক্ষ্য আছে? শ্রীভগবানের কৃপায় যদি কখন ব্রাহ্মণত্বের বিস্তার হয়, জ্ঞানের দ্বারা যদি কখন গুরু পুরোহিতগণের হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ হয় এবং জন সাধারণের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ গন্ধ হীন প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবেই হিন্দুর হিন্দুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা সমাজ দেহের পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে, আপন আপন অধিকারানুযায়ি কর্ম্ম করিয়া সকলেই ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে, নতুবা হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি সুদূর পরাহত জানিও।

ভাই! ব্রাহ্মণত্ব লাভ ভিন্ন আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ও ত্রিতাপের বেগ প্রশমিত হয় না। যদি জন্ম মৃত্যুর করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে চাও, তবে ব্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্টা কর, সকলেরই ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার আছে, যখন বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সকল এই ব্রাহ্মণত্ব লাভের উদ্দেশেই ব্রাহ্মণের সহিত সমুচ্চয় করিবার জন্য

লালায়িত হইত, ব্রাহ্মণের সেবা ও সঙ্গ করিবার ফলে সত্ব স্রোতের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে যখন হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইত, তখন তাহারা ব্রাহ্মণত্বের মধ্য দিয়াই মুক্তি লাভ করিত, অতএব ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইবার উপযোগী জ্ঞান লাভ করিতে যত্ন কর, চেষ্টা আন্তরিক হইলে শ্রীভগবান সৎসঙ্গের সংযোগ করিয়া দিবেন, মনকে একবার সৎসঙ্গের রসাস্বাদ করাইতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অধোগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে, পরে আস্বাদের মাত্রা যত বাড়িবে হৃদয়ে ততই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া তোমাকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিবে, ফলে আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুলতা রূপ উর্ব্বর জমিতে সৎসঙ্গের বীজ বপিত হইলে যে জ্ঞান বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি সেই বৃক্ষেরই অপার্থিব ফল মাত্র জানিও, এবং এই ফল সমূহ ভগবৎ চরণে অর্পিত হইলেই মানব আনন্দময় শিবত্বে উন্নীত হইয়া অনন্ত কালের তরে কৃতার্থ হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কর্ম্ম ও ভক্তি।

—:০:—

কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥

শাস্ত্রে বলে, আমরা ও বলি, "ধর্ম্ম কর্ম্ম" ইহার ব্যাখ্যা ধর্ম্মের কর্ম্ম বা সাধন, ইহাও যেমন হয়, আবার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এরূপ সমাস বিগ্রহ দ্বারাও অর্থ নিষ্পত্তি করা যায়। "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" অর্থাৎ ধর্ম্ম ও তৎসাধন এই দুইটির পৃথগ্বোধ জন্মায়। এই ভাবে আমরা ধর্ম্ম ও কর্ম্মের ভেদ উপলব্ধি করিতে পারি। যাহা কর্ত্তব্য তাহা ধর্ম্ম; সুতরাং করণীয় বিষয়টি ধর্ম্ম, কিন্তু তৎসাধন প্রয়াসের নাম কর্ম্ম। কর্ত্তব্য ভিন্ন অকর্ত্তব্য বিষয়েও আমাদের প্রয়াস জন্মে, সুতরাং উহাও কর্ম্ম।

অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রয়াসকে কর্ম্ম বলা যায়। কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিচারে কর্ম্ম "শুভা.শুভ" দ্বিবিধ। যেমন পরের অপকার করা অশুভ কর্ম্ম, আবার উপকার করা শুভ কর্ম্ম, ইহা শুভা শুভের স্থূল ব্যাখ্যা মাত্র, বস্তুতঃ শুভা শুভের ভেদতাৎপর্য্য এরূপ নহে। "যত শুভা শুভ কর্ম্ম" এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্ম মাত্রই শুভ অশুভ, অর্থাৎ যে কোন কর্ম্মই হউক, তাহা কেবল শুভও নয়, কেবল অশুভও নয়; উহা শুভ ও অশুভ দুইই। কর্ম্মের একটা ধর্ম্মা ধর্ম্ম আছে, উহা নিত্য শুভ; পৃথিবী সতত আলো কালো মাখা। কর্ম্মের শুভা শুভ নিত্যত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপন করি ঐ যে মাঠ শষ্প রাজী সমাচ্ছন্ন, কৃষক ঘাস ভাঙ্গিয়া চাষ মই দিয়া ধান্য বা গম শস্য জন্মাইল, ইহা অবশ্যই শুভ কর্ম্ম, যৎকালীন বহুমানবের জীবিকা সংস্থান হইল, কিন্তু পক্ষান্তরে গোমহিষাদি জাতির আহার বিলুপ্ত হইল। আপনি যোগাড় করিয়া একটী চাকরী পাইলেন, অন্য একজন বঞ্চিত হইল। জমি কাটিয়া পুকুর খনন করিলেন, ভাল জল পাইলেন, কিন্তু জমির ব্যাঘাত ঘটায় উৎপন্নের হানি হইল। আপনি একটী ভোজ দিলেন, কাঙ্গাল গরীবকে ও অন্ন দিলেন, কিন্তু কত মৎস্য ছাগলের মুণ্ড গেল ইত্যাদি।

"যত শুভা শুভ কর্ম্ম" এই উক্তির ঠিক উহাই তাৎপর্য্য নয়। শুভ ও অশুভ এই দ্বিবিধ কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। কারণ "যত" শব্দের প্রয়োগে কর্ম্মের একত্বের হানি ঘটাইয়াছে। প্রত্যেক কর্ম্মই যদি শুভ ও অশুভ বলা উদ্দিষ্ট হইত, তবে "যত" শব্দের পুর্ব্ব স্থাপনা দ্বারা অর্থ বিরোধ ঘটাইবার প্রয়োজন থাকিত না। এখন অশুভ ও শুভ কর্ম্মের ভেদ, শ্রেণী বিভাগ ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ আবশ্যক। মায়িক ভুক্তির অনুকূল কর্ম্ম মাত্রই অশুভ অর্থাৎ অশন বসন ভোগৈশ্বর্য্য সাধনে আমাদের যে প্রয়াস তাহা অশুভ কর্ম্ম এবং মুক্ত্যনু সন্ধানে যে যে প্রয়াস সে সব শুভ কর্ম্ম।

মায়ার স্থূল পথে হাটিতে হাটিতে স্থূল জল সন্ধি ভব নদীর পারে আগমন পর্য্যন্ত অর্থাৎ তটস্থ হওয়া পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্ম সব অশুভ, অতঃপর পারি দিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ মুক্তি পর্য্যন্ত জীবেরকর্ম্ম সব শুভ। তুমি তুলসী স্থাপন কর, শ্রীমন্দির মার্জ্জন কর, শ্রীমূর্ত্তির দর্শন প্রণাম কর, তীর্থ পর্য্যটন কর, দান ধ্যান কর, জপতপ মন্ত্র গায়ত্রী স্তব স্তোত্র পাঠ কর, এসব শুভ কর্ম্ম।

তটস্থ হইয়া ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করা পর্য্যন্ত, ভগবৎসাধন ভজন সমস্ত শুভ কর্ম্ম। শুভ কর্ম্ম দ্বারা ভগবদুপাসনার অঙ্গনিচয় দ্যোতিত হয়। ভগবদ্ গন্ধহীন কর্ম্মই অশুভ; ভগবৎ সম্বন্ধি কর্ম্মই শুভ। এই হইল "যত শুভা শুভ কর্ম্ম।" চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ শুভ কর্ম্ম, কারণ উহাতে চিত্ত শুদ্ধি হয় এবং যত বন্ধন, সব ঘুচে। ভক্তি লেশহীন পরোপকার দয়া দানাদি মহদনুষ্ঠান সব অশুভ। এতদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে বিধি মার্গের প্রতিষ্ঠিত সাধন ভজন শুভ কর্ম্ম; উহাও কর্ম্ম, কিন্তু শুভ কর্ম্ম মাত্রই শুভ বা অশুভ; সুতরাং—

"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।"

কর্ম্ম মাত্রই কৃষ্ণভক্তির বাধক। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এই অতি সার গর্ভ সূক্তিতে "ভক্তি" প্রযুক্ত না হইয়া কৃষ্ণ ভক্তি পদ প্রযুক্ত হইল কেন, ইহার তাৎপর্য্য অবশ্য অতি গম্ভীর। ভক্তি চেয়ে কৃষ্ণ ভক্তি অনেক উচ্চ। কৃষ্ণভক্তি শুভা শুভ কর্ম্মাতীত বটে, কিন্তু সাধারণী ভক্তি শুভ কর্ম্ম মূলা অথচ অশুভ কর্ম্ম নির্মুক্তা। অশুভ কর্ম্মের অতীত হইলেন ভক্তি, শুভ কর্ম্ম তদ্ভিত্তি। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি শুভ কর্ম্মেরও উপরে, এই দুইয়ের অতীত। কর্ম্ম মৃণালে জ্ঞান পদ্মের উৎপত্তি হয়, কর্ম্ম চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; কিন্তু উহা কণ্টকাবৃত এই জ্ঞানপদ্মের মকরন্দ ভক্তি। এই ভক্তি মধু জ্ঞান পদ্ম পরাগরেণু মাখা, কিন্তু মধুকর বিরচিত চক্র মধু বিশুদ্ধ সুনির্ম্মল। কর্ম্মীতো দূরে, জ্ঞানীও মধুচক্রমধুর রসাস্বাদে অধিকারী নহেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন ঃ—

কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত তাহে না হইবে রত
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।

এই দিব্য সূক্তির প্রথম এই অর্থ করা যাউক্, যথা ঃ—কর্ম্মী ও জ্ঞানী মিছা ভক্ত, অর্থাৎ তাহারা যথার্থ ভক্ত নহে; তাহাদের ভক্তিলেশ থাকিলেও তাহারা ভক্ত গণ্য হইতে পারেনা। কারণ তাহারা বিশুদ্ধ ভক্তিতে বঞ্চিত এইরূপ ব্যাখ্যা বর্জ্জন করিয়া তদূর্দ্ধ আরও সুন্দর ব্যাখ্যা স্থাপন করা যাউক; কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত এতিন মিছা। তাহে রত হইবে না, কর্ম্মে জ্ঞানে ও এই নাম মাত্র ভক্তিতে রত হইবে না বা এ তিনের পদবী অনুসরণ করা সঙ্গত নয়। মৃণাল, পদ্ম ও পদ্ম মধুর অতীত বিশোধিত চক্র মধুর শুদ্ধ ভক্তির পরিচর্য্যায় রত হও।

"শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।" ভজনের মূল কি? কাম, সুতরাং নিষ্কাম ভক্তিই শুদ্ধ। "কৃষ্ণভক্তি" শব্দ দ্বারা শুদ্ধ রাগের ভক্তি দ্যোতিত হয়। উহা শুভা শুভ কর্ম্মের উপরে। শুভা শুভ কর্ম্ম করিতে আত্ম সেবার হিল্লোল খেলে; শুদ্ধ রাগের ভজনে তাহা নাই কিন্তু উহাও কর্ম্মময় স্বীকার করিতে হইবে। সে কর্ম্ম শুভা শুভাতীত চিদাত্মক। তাহা কি? ভগবৎ সেবা। শুদ্ধ ভক্তি রাগের ভজন সেবাত্মিকা। কৃষ্ণ সেবা ভিন্ন জপ তপ মন্ত্রাদি শুভ হইলেও নিতান্ত নীরস। পাঠক ভক্ত ঠাকুরগণ, আপনারা গোরাচাঁদের করুণা সূত্রে কখনও ভাব গদ্‌গদ হইয়াছেন, তখন এটিও তৎসঙ্গে বেশ অনুভব করিয়াছেন যে তখন আর মন্ত্র তন্ত্র সন্ধ্যাহ্নিক কিছুই চিত্তে লয় না, ভাল লাগে না। তখন ওসব অসার, নীরস নিরর্থক, বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং এবিষয়ে এ অধম আর অধিক লিখিয়া কি হৃদ্বোধ করাইবে? তাই অপার্পিব শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত দুগ্ধের আওটা শ্রীচরিতামৃত এই অমৃত ঢালিয়াছেন,

"কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভা শুভ কর্ম্ম।" এখন প্রশ্ন "কৃষ্ণ ভক্তি" বলিতে শুদ্ধ ভক্তি সূচিত বলিয়া মানি কেন? "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" "রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।" স্থানান্তরে শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। "হ্লাদিনী" বিশেষণ যোগে খণ্ড শক্তির বোধ জন্মায়। অথচ স্থানান্তরে পূর্ণ শক্তির আরোপ থাকিল, এই বিরোধের মীমাংসা হওয়া চাহি। ক্ষীরোদ মন্থনে সুধাসার উত্থিত হইয়া ছিল। দুগ্ধের সার যেমন মাখন, মাখনের সার ঘৃত, তদ্রূপ সমষ্টি শক্তি বা পূর্ণশক্তি সিন্ধুর সারসুধা এই হ্লাদিনী। সুতরাং সর্ব্বশক্তি বীজ সার রূপে হ্লাদিনীতে বিরাজমানা। "যৎযেন যুজ্যতে" হ্লাদিনী যেমন ছাকা শক্তি, শক্তি মান কৃষ্ণও তেমন ছাকা ঈশ্বর বা "ঈশ্বরঃ পরমঃ"। হ্লাদিনী যেমন ঐশ্বর্য্য পরিশূন্যা শক্তি, কৃষ্ণও তেমন ঐশ্বর্য্য লেশহীন ঈশ্বর (মানুষ); ভক্তের ভাব যতই নির্ম্মল হয়, ঈশ্বর ততই নির্ম্মল (ঐশ্বর্য্যহীন) ও ঘন হইয়া দুগ্ধের ঘৃতবৎ ভাবুকের তৃপ্তি সম্পাদন করেন। লীলাপক্ষে দেখুন, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে বারি, বারি হইতে ক্ষিতি এই ভাবে ক্ষিতি আকাশের ঘন পরিণাম ও রস প্রধান (কারণ ইহার পঞ্চগুণ)। আকাশে ও বায়ুতে চিনি, গুড়, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, আম্র.

পনস, আনারস ফলে না; কিন্তু উহাদের পরিণাম ক্ষিতি এ সব ফলায়। তদ্রূপ কৃষ্ণ ক্ষিতি অবতার "পরমঃ ঈশ্বরঃ" পর পর উৎকর্ষতায় "পরমঃ" পঞ্চ রসাত্মক। অথচ এই উৎকৃষ্ট সার বস্তুই আদি বীজ। আকাশে, বায়ুতে ও তেজে ভগবানের অবতার প্রকুটিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারিনা, মনীষীগণ শাস্ত্র দ্বারা প্রকট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেও পারেন। কারণ শাস্ত্রের গর্ভ অতল জলে স্থলে ঈশ্বরের প্রকটতা পাই; যথাঃ—জলে মৎস্য কূর্ম্ম, জলে স্থলে বরাহ ইত্যাদি। জল সৃষ্টির পূর্ব্বের কোনও অবতারের নাম নাই। স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই তিন শ্রেণীর জীব জলে স্থলেই বাস করে; অণ্ডজ বিহগকুল আকাশে বিচরণ করিলেও তাহাদের জীবিকা জলে স্থলে। জলস্থলের জীব আমাদের চর্ম্মচক্ষুর গোচর। যত্র যত্র জীব, তত্র তত্র অবতার, কিংবা কুত্রাপি বিভূতি সম্ভবে। এসব অংশাবতারের কথা বলিতেছি। অবতার ও জীবে ভেদ অল্প ও অধিক কারণ 'অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত।"

'অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥''

সুতরাং জীব ও অবতার সবই শ্রীভগবানের অংশ, কিন্তু তবু ভেদ আকাশ পাতাল অসামান্য।" "মায়াকার্য্য নহে চিদানন্দময়" অবতার অংশ, চিদানন্দময়। জীব অংশ মায়ারচিত দেহে বিম্বিত। জীব অতি ক্ষুদ্রাংশ; যথাঃ—

বালাগ্রশতশোভাগঃ কল্পিতো যঃ সহস্রধা।
তস্যাপি শতশোভাগো জীব ইত্যভি ধীয়তে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচনম্।

মহাবিষ্ণুর্জগৎ কর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।

কৃষ্ণ এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অতীত পুরুষ। ব্রহ্ম সৃষ্টিতে ব্রহ্মার সৃষ্টির পূর্ব্বে গুণাবতার প্রকাশ পান। সৃষ্ট্যাদি লীলা ঐশ্বর্য্যান্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণ এ লীলার অতীত। সে সব মহাবিষ্ণুর কার্য্য। আম্রআঁটি হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষের পরিণতিতে আম্র ফল জন্মে; তন্মধ্যে অবিকল সেই আঁটি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ সৃষ্টি লীলার মূল কৃষ্ণ, সৃষ্টির পরিণতিতে সৃষ্টি বৃক্ষে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" যাহার ভাব পূর্ণ ও পরিপক্ক তাহার ঈশ্বরও পূর্ণ সুতরাং কৃষ্ণ এ বৃক্ষের মাত্র একটী প্রেমফলের আঁটি, উনি প্রেমরাধার আবরণে আছেন। এই গেল এক কথা।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ মদনমোহন, অপ্রাকৃত নবীন মদন। জীবচিত্তের উপজাত যে মদন-বা কাম অর্থাৎ ভোগৈশ্বর্য্য বাসনা তাহাকে যিনি মোহিত বা নিরস্ত করেন তিনি মদন মোহন। যিনি চিত্তের অন্য বাসনা দূরীভূত করিয়া নিজ পানে কেবল আকর্ষণ করেন তিনি মদন মোহন কৃষ্ণ, তিনি অপ্রাকৃত নবীন মদন, তিনি প্রাকৃত মদন নহেন; প্রাকৃত বা ইতর মদন বিষয় ভোগের দিকে টানে, কৃষ্ণ অপ্রকৃতি মদন, তিনি জীবকে নিজপানে টানিয়া বিষয় মুক্ত করিয়া প্রেমামৃত পিয়ায়েন। কৃষ্ণ নবীন মদন, অর্থাৎ কিশোর মদন যুবক মদন, নহেন। প্রাকৃত যুবক মদন সন্তানোৎপত্তির হেতু হইয়া জীবকে পতিত করে; কিশোর মদন ব্রহ্মচর্য্য দিয়া জীবকে উর্দ্ধে তুলে (উর্দ্ধরেতা করে)। যে মদনের জ্বালায় জীব সতত আলু তালু দগ্ধ হইতেছে, বিষয় বিষ পান করিয়া "হা হতোহস্মি" করিতেছে, সেই মদনের দারুণ জ্বালা যিনি শীতল করেন, মদনের প্রভাব যিনি সমূলে বিনষ্ট করেন, তিনি মদন মোহন কৃষ্ণ। বিষয়ের অতি খর তরঙ্গিত প্রবাহে আমরা ভাসিয়া যাইতেছি; এমন প্রবাহের ধারা হইতে আমাদিগকে উজান বহাইয়া নিতে এমন শক্তি আরো কীদৃশী প্রবলা তাহা ভাবুন। বিষয় সম্ভোগ বড়ই আপাত মধুর সে মধুর লোভ ছাড়াইয়া নেওয়া কি সামান্য শক্তির কার্য্য? মদন হাবভাব-ময় অতি সুন্দর একটী যুবক পুরুষ; তাহার ধনু ফুল, শরফুল, মদন এমনই সুন্দর সুকোমল; তাহার রূপে ব্রহ্মাও ভুলিয়াছেন। দেবগণ সতত তাহার রূপ-মুগ্ধ শরপীড়িত। এমন সুন্দর পুরুষের রতি সাজিয়াছি। এমন পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়াছি! এখন ভাবুন, এমন পুরুষের লোভ ছাড়িতে পারি; পিরিতে তিলাঞ্জলি দিতে পারি, অমন পুরুষের পিরিতকেও ছার মনে করিতে পারি, এমন আবহমান কালের পীরিত ও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, এমন পুরুষকে ধিক্কার ন্যাক্কার দিয়া চলিয়া যাইতে পারি, আবার কেমন পুরুষের দর্শন পাইলে।

পাঠক, ভাবুন যে পুরুষের মূর্ত্তি মাধুরী দর্শনে সেই মদন বিহ্বল হয়। "নবীন মদন" অভিখ্যায় অতি সুন্দর সুঠাম একটী পুরুষ রতন অভিব্যক্ত

হইতেছেন। এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে 'কৃষ্ণ মূর্ত্তির উপরে মূর্ত্তি নাই; এমন "নারী মনোহারী" আর নাই। ঈশ্বরের অনন্ত মূর্ত্তি, কিন্তু সর্ব্বমূর্ত্তির রাজা শিরোমণি কৃষ্ণমূর্ত্তি, উহা স্বরূপ মূর্ত্তি। সুতরাং পূর্ণসুন্দর, পূর্ণমধুর, পূর্ণরস, পূর্ণানন্দ, পূর্ণসুখ! এমন "আত্মরুচি তনুকমল" মানসে অই একটি ফুটে! নবমেঘের তুল্য প্রাণ স্নিগ্ধকর নয়নানন্দ বস্তু গগনে চন্দ্র ও নয়। চিত্তাকাশের সেই মেঘমূর্ত্তি, অহো বলিহরি! মেঘমূর্ত্তির কচি অঙ্কে কোমল বিজলী ঝলা! এই অঙ্কে, এই অঙ্গে মাখা! মদনের মদনমূর্ত্তি! যাহার মানস গগনে সেই শীতল মেঘমূর্ত্তিময় নীলকমল প্রস্ফুটিত হইয়াছেন, তিনি জানেন, সে শ্রীমূর্ত্তির কেমন আকর্ষণ কেমন মধুময়, কেমন প্রাণ মাতান। পূর্ণ সৌন্দর্য্য-সিন্ধুর মথিত সুধাচারু কৃষ্ণচন্দ্র! ক্রমশঃ।

শ্রীকালীহর দাস।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ!

মানুষ নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোক্তা, বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ড নিয়মের একটুকও অন্যথা করিবার ক্ষমতা নাই। সেই বিধাতার বিধিমতে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর সময় হইতে আমি অসুস্থ রহিয়াছি শ্রীপত্রিকার সময় অতিক্রম হইয়া যায় বলিয়া ভক্তগণের হৃদয়ানন্দ দায়ক "লীলা রহস্য" এবারে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, পরের মাসে প্রকাশ করিব আশাছিল। লীলা রসাস্বাদন কারী ভক্তগণ আমায় ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন "লীলা রহস্য" আলোচনা করিয়া ধন্য হইতে পারি।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা,
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

১ম সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌ ॥

প্রার্থনা।

সংসারেঽস্মিন্‌ যোগমায়ারচিতে প্রকৃতেঃ পর।
মা মাং প্রলোভিতং কৃত্বা পরীক্ষাং কুরু মাধব ॥

হে মায়াতীত! হে নিত্যনিরঞ্জন! তোমারই ইচ্ছা শক্তি স্বরূপিণী যোগমায়া দেবীর বিরচিত এই বিচিত্র সংসারে একমাত্র তোমার দয়া ব্যতীত কেহই আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হয়না। নিরন্তর, প্রলোভনের সামগ্রী আশেপাশে বিরাজমান, কার সাধ্য স্থির থাকে? হে দীন-দয়াল! সহজেই দুর্ব্বল এই দীনহীনকে আর কত খেলায় ফেলিবে; ধন, জন, মান ও নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদানে প্রলোভিত করিয়া আর কেন পরীক্ষা করিতেছ? অন্তর্য্যামিন্‌! তুমি কি জাননা যে, তোমার শক্তি ভিন্ন আর কোন ক্ষমতা নাই! তুমি কি জাননা যে, তোমার কৌশল, তোমার মায়ার নিপুনতা ভেদ করিয়া, ভাব বুঝিয়া ভাবরক্ষা করিতে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য? আর তুমি কি জাননা যে, তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও তোমার

প্রদত্ত শক্তি সাপেক্ষ ? পরীক্ষা করিও না, খেলিতে ইচ্ছা হয় খেল, খেলায় মজাইয়া রাখ; তোমাময় হইয়া আপনা ভুলিয়া জগন্ময় তোমার খেলা অনুভব করি। কর্ম্ম করাইতে ইচ্ছাহয় কর্ম্ম দাও দিবানিশি তোমার কর্ম্ম সাধনে জীবন উৎসর্গ করি। আর যদি বার বার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছাহয়, তবে একাগ্রতা, দৃঢ় বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণ প্রদানে পরীক্ষার যোগ্য করিয়া পরীক্ষা কর। নতুবা অযোগ্যকে পরীক্ষা করিলে সর্ব্বান্তর্য্যামী ও দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে। হে ভাবনিধি! যাহা ইচ্ছাহয় কর কেবল ইহাই প্রার্থনা ভাব ছাড়া করিও না, যখন যে ভাবে রাখ তাহাতেই যেন তোমার শক্তি, তোমার ভাব ও তোমার ঈশ্বরত্ব অনুভব করিতে পারি। অভাবে, দুঃখে, রোগে, শোকেও যেন তোমার ভাব ও ভালবাসা ভুলিয়া না যাই। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ যাহা কিছু করাইবে তাহাতেই যেন তোমার ভাবে প্রফুল্ল থাকিতে পারি; অভিমান কাড়িয়া লও দীনের ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা।

তাঁরে ডাকো।

(গীতিকা।)

তাঁরে ডাকো, তাঁরে ডাকো!
প্রাণ-মণ এক হ'য়ে ভাই,—
ব্যাকুল হয় ডাকো॥
নাম-নামীতে না আছে ভেদ,
এই ভাব হৃদে রাখো।
ভুলে যেও না রে,
সংসার মায়ায় ভুলে যেও না রে,
স্বভাবেতে স্থির থেকে ভাই,
আপন ঘরে থাকো।
তাঁরে ডাকো, তাঁরে ডাকো॥
দেখিতে পাবে রে,—
সেই অপরূপ রূপ হেরে,
হিয়া জুড়াবে রে,—
অন্তরের ধন অন্তরেতে;
ডুব্ দিয়ে তাঁরে দেখো।
তাঁরে ডাকো, তাঁরে ডাকো॥
হতাস হ'ও না রে,
আশা ছেড়ো না রে,
বিশ্বাসের আলো হাতে ল'য়ে,
ধীরে চলতে থাকো।
ডাকৃতে ডাকৃতে পাবে সাড়া,
ভয়ত রবে না কো।
তাঁরে ডাকো, তাঁরে ডাকো॥

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

পিপাসিত।

আছি যে চেয়ে।

(গীতিকা।)

—:০:—

আমি আছি যে চেয়ে।
তুমি আসিবে বলিয়ে, হে প্রাণ বল্লভ!
আছি হৃদাসন বিছাইয়ে॥

কবে হবে তব শুভ আগমন?
পরাণের সাধ হইবে পূরণ;
প্রেমানন্দে পূর্ণ হবে তনুমন,—
রাঙ্গা পা দু'খানির পরশ পেয়ে॥

আশা পথ চেয়ে কত দিন,
এ ভাবেতে রব হইয়ে মলিন?
মম অভিলাষ, ওহে পীতবাস!
মিটাইবে দেখা দিয়ে॥

তুমি অন্তর্য্যামী, সকলিত জান,
প্রবল পিয়াসে রেখেছি পরাণ,
না কর হে যদি করুনা প্রদান,
কণ্ঠ যাবে শুকাইয়ে॥

বামে রাধা ল'য়ে হে বংশী বাদন,
হৃদয় মাঝে বারেক দাও দরশন;
যুগল মাধুরী করি আস্বাদন—
(যাই) আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে॥

প্রেমের অঞ্জলি লয়ে দুটী করে,
সখীর অনুগা থাকিয়ে অদূরে,
করি সমর্পণ যুগল চরণে,—
ধন্য হই সেবা লইয়ে॥

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

—————

পাদোদ্ভবা।

—:০:—

ওমা গঙ্গে! তুমি সর্ব্ব কলুষ নাশিনী,
জগতের শুভতরে জনম তোমার।
ভাগীরথী মর্ত্ত্যে আর স্বর্গে মন্দাকিনী;
পাতালেতে ভোগবতী নামেতে প্রচার॥

কেহ বলে সুরধুনী, কেহ বা ত্রিস্রোতা;
কেহ বা জাহ্নবী নামে, করে গো আহ্বান;
ত্রিপথগা নামে কারো কাছে বা আখ্যাতা;
কেহ বা স্বর্ণদী বলি জুড়ায় পরাণ।
যার যাহে অভিরুচি বলুক সে নাম;
সকলি তোমার যোগ্য না আছে সংশয়।
আমি ভাল বাসি আর বলি অভিরাম,
পাদোদ্ভবা, পাদোদ্ভবা কিবা মধুময়॥
রাঙ্গা পা দু'খানি-চির-আরাধ্য আমার।
তাই, ভাল লাগে "পাদোদ্ভবা" নাম সুধাধার॥

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

মনের প্রতি উপদেশ।

—:o:—

(১)

অনিত্য সুখের আশে অনিত্য ভুবনে,
কামনার দাস হ'য়ে রে অবোধ মন!
র'বে আর কতকাল মায়া আবরণে,
ব্যাধকৃত পাশ-বদ্ধ কুরঙ্গ যেমন॥

(২)

ভেবেছ কি সুনিশ্চিত ওরে ভ্রান্ত মন,
এ সংসারে চির-বাস হইবে তোমার।
বিবেকাস্ত্রে মায়াপাশ করিয়া ছেদন,
ভাব দেখি একবার ভবের ব্যাপার॥

(৩)

যে জীবন, রক্ষা তরে এতই ভাবনা,
কালপূর্ণ হ'লে তাহা কে রাখিতে পারে?
মুমূর্ষু দশায় কত ভুগিবে যাতনা,
জীবনের শেষ গতি হবে প্রেতপুরে॥

(৪)

কিবা সুখী কিবা দুঃখী ধনী কি নির্ধন,
সমগতি সকলের ভিন্ন কিছু নয়।
সাগর সঙ্গমে যথা স্রোতস্বতীগণ,
পার্থক্যের কিছু মাত্র চিহ্ন নাহি রয়॥

(৫)

কোন্ আশে ভব-বাসে হইয়েরে ভ্রান্ত,
"আমার" "আমার" কর সদা সর্ব্বক্ষণ?
"আমার" ফুরা'বে যবে হইবে প্রাণান্ত,
কিছু নাহি যাবে সঙ্গে ধন পরিজন॥

(৬)

তাই বলি ওরে মন না হও পাগল,
অনিত্যেরে নিত্য ভাবি সুখের পিয়াসে।
সুদুর্লভ "নরতনু ভজনের মূল;"
ক'রো নারে জর্জ্জরিত কু-ভাবনা বশে॥

(৭)

নির্ব্বাত স্থানেতে যথা প্রদীপের শিখা-
স্থিরভাব, সেইরূপ হইয়েরে শান্ত।
ধ্যানযোগে হৃদাসনে আনি বাঁকা সখা,
পাদপদ্মে লক্ষ্য রাখ না হইও ভ্রান্ত॥

(৮)

আছেরে মধুর রস চরণ কমলে,
যাহা পান করিবারে ব্রজাঙ্গনা যত।

লোকধর্ম্ম, লজ্জা, ভয় ত্যাজিয়া সকলে,
আসিত কালিন্দী তীরে উম্মাদিনী মত ॥

(৯)

নিত্যানন্দ রসাধার শোভার আকর,
শ্যামসুন্দরের দুটী রক্তিম চরণ।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন পরম সুন্দর,
সোনার নূপুর তাহেমধুর গুঞ্জন ॥

(১০)

সবিনয়ে বলি মন রাখ মোর বাণী,
সহস্র কর্ণিকা-দলে হৃদি সিংহাসনে।
স্থাপিত করিয়া রাঙ্গা চরণ দু'খানি,
পূজা কর ভক্তি ফুলে প্রীতির চন্দনে ॥

অপার আনন্দনীরে হইবে মগন।
শোক তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

বিভু-গীতি।

—:০:—

(১)

কেমনে পাইব, সে অনন্ত ধন!
দেহ ক্ষীণ আয়ুহীন, বাঁচি আর কত দিন,
ঘুম-ঘোরে সংজ্ঞাহীন, ভুঞ্জিব নরক যাতন ॥

দীননাথ এতদিনে, ক্ষমিয়াছ ক্ষমাগুণে,
তবুত অবোধ মন ছাড়েনা কুপথ গমন ॥

(২)

হরি হে এই মিনতি করি,—
দয়া করে দীন হীনে দেহ চরণ তরি।

ভব-অকুল-পাথার, ইথে নাহি পারাবার,
কৃপা করি যদি তার তবেই গো তরি॥

এ সংসারে তোমাবিনে, নাহি দেখি হেন জনে,
তরিতে অধম জনে হইয়ে কাণ্ডারী॥

আমি অতি অকিঞ্চন, নাহিক সঙ্গতি হেন,
যাহাতে তোমার প্রীতি জন্মাইতে পরি॥

(৩)

আশাকরে ডাকি হরি আজি তোমা বারে বারে।
পদাশ্রয় পাই যেন আশীর্ব্বাদ কর মোরে॥

ডাকিতেছি অনুক্ষণ, তৃষিতা চাতকী হেন,
জ্ঞান বারি কণা দানকর অজ্ঞ তনয়ারে॥

ওহে অগতির গতি, তোমা বিনা নাহি গতি,
হর মোর এ দুর্গতি ক্ষমা করি এই বারে॥

তব প্রতি ভক্তি দানে, তুষিও অজ্ঞান জনে,
চেতন হউক অচেতনে তব করুণায়॥

কিকরিব যাব কোথা, কারে কব দুঃখ কথা,
এ সঙ্কটে তোমাবিনা হরিহে ডাকিব কারে॥

(৪)

হে হরি! দীন বল্লভ! দেখাদাও আজ আমায়!
বিপাকে পড়িয়ে প্রভো! ডাকি তোমা বার বার।

তাপিত মম পরাণ, মোহাচ্ছন্ন কম্পবান,
হেরি দশ দিক শূণ্য, বিনে ঐ চরণ তোমার।

করি যত প্রাণপণ, ততই হই পতন,
ভাবিয়া আকুল মন, হে দীন রঞ্জন মোর।

(৫)

(মন) মায়া নিদ্রাত্যজি হও সচেতন।
হরি নামামৃত, পিও অবিরত,
অন্ধকূপে আর হবিনে পতন॥
রবেনা রবেনা, কলুষ যাতনা
নিত্য মুক্তি পদে হও নিমগন॥

শ্রীশ্রীগুরুপদে॥

—০:—

প্রণমামি গুরুপদ, যেপদেতে মোক্ষপদ,
সে পদ সরোজ বিনে আর কিবা আছেরে।
ওরে মন মধুব্রত, পিয় মধু অবিরত,
কেতকী কণ্টক বনে কেনযাও ভুলেরে॥
বিষয় কেতকী বটে, তাতেত বিপদ ঘটে,
আয় ব্যয় সঞ্চয়েতে নানা কষ্ট আছেরে।
অক্ষয় অব্যয় পদ, যেই পদ নিরাপদ,
সেপদ ছাড়িয়ে কেন অন্য পদ চাওরে॥
তোরে বলি ওরে মন, গুরুকি সামান্য ধন?
গুরু কে কি চিনেছ! সে সামন্যত-নয়রে।
গুরু রূপে অনাকার, সাকার মানবাকার,
তাঁরে কি মানবাকার গণনায় গণেরে॥
গুরু কে না মান নর, গুরু সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
গুরুব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু মহেশ্বর হয় রে।

পর ব্রহ্ম হন গুরু, গুরু বাঞ্ছা কল্প তরু,

বাঞ্ছা পুরাইতে জীবের গুরু রূপ ধরেরে ॥

আহা! কি গুরুর দয়া, হরি নাম দীক্ষাদিয়া,

অবহেলে তরাইছে যত জীব চয়ে।

দুস্তর সাগর মধ্যে, স্থান দিয়া হৃদি মধ্যে,

তরি যথা পুত্র সম সিন্ধুপার করেরে ॥

যে গুরু চরণ বই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই,

সে গুরু চরণ বই আর কিবা আছেরে।

পিতামাতা হেতেগুরু, গুরু বটে গুরু গুরু,

গুরুত্ব পাইবে গুরু লঘু হ'য়া ভজরে ॥

এমনি গুরুর কর্ম্ম, বুঝ মন তাঁর মর্ম্ম,

যেমন ভ্রমর কীট অন্য কীটে ধ'রে রে।

কীট দেহ করি হত, করায় আপন মত,

গুরু সেই রূপ শিষ্যে নিজরূপ করে রে ॥

পিতামাতা দেয় জন্ম, ভোগ মাত্র নিজ কর্ম্ম,

নাহি বুঝে ধর্ম্ম যারযে সে ভুগেরে

তাঁরাসে জন্মায়পিণ্ড, শূন্য সব জ্ঞান কাণ্ড,

বার বার যোনি দণ্ড মর্ত্ত্যে এসে হয় রে ॥

গুরু দিলে জ্ঞান শিক্ষা, তবেসে জীবের রক্ষা,

অবহেলে পেয়ে দীক্ষা অনায়াসে তরে রে।

এই যে জীবের দেহ, জল ভাণ্ড সম এহ,

জাতি স্পর্শে শুদ্ধ হয় অজাতিতে নয়রে ॥

গুরু হীন দেহ ধারী, যথা স্বামীহীনা নারী,

জীবন মরণ সম সেই দেহ হয় রে।

যেই দেহ গুরু ত্যাগী, সেই দেহ সর্ব্বত্যাগী,

মৃত সম সেই দেহ গণনায় গণে রে ॥

অতএব বুঝ মন, সেব গুরু শ্রীচরণ,
সে চরণ বিনা আর এভবে কি আছেরে।
ধর তাঁরে দৃঢ় করি, যে ভবে দেখায় হরি,
ভজ ভজ তাঁরে মন বড় লাভ হবে রে॥

যেগুরু চরণ দ্বন্দে, অর্চ্চে পুষ্পে চর্চ্চে গন্ধে,
পদ রেণু মকরন্দে ভক্তি করি খায় রে।
সে নাসে সংসারবৃত্রে, গুরু গুরু বলি বক্তে,
অনায়াসে ছয় বৃত্রে জয় করে সেই রে॥

পেলে গুরু উপদেশ, অশেষ দোষের শেষ,
নাথাকে পাপের লেশ হরি হরি ব'লেরে।
ভ্রম তম বিনাশিয়া, অচেতনে চেতনিয়া,
যে গুরু প্রসাদ জোরে দিব্য জ্ঞান পাই রে॥

সে গুরু চরণে মন, কর সদা আকিঞ্চন,
অনর্থে সদর্থ জ্ঞান যেন নাহি হয় রে।
কাচেরে কাঞ্চন ভেবে, বৃথা মুগ্ধ হয়ে ভবে,
শ্রীগুরু চরণ মন হারায়োনা হেলায়রে॥

এই ভব পারাবার, গুরুদেব কর্ণধার,
সেই বিনে তরাবার আর কেহ নাইরে।
ওরে মন কেন ভুল, প'লে দুঃখে নাহি কুল,
অতুল বিপদে প'ড়ে এ জনম যাবেরে॥

যে দেখি তরঙ্গ রঙ্গ, শোষে কণ্ঠ কাঁপে অঙ্গ,
ভয়ঙ্কর স্রোত ভঙ্গ ঘুরাপাকে ঘুরেরে।
চাই এতে মাঝি শক্ত, তবে সে হইবে মুক্ত,
না হইলে এক পাকে পাকে ডুবে যাবেরে॥

এই ভব দুস্তরেতে, চাও যদি নিস্তারিতে,
মুঢ় মন গুরু পদে রতি মতি সঁপরে।

নাশিবে বিপদ যত, জনমিবে ভক্তি যত,
এ সংসার সার যেই সেই পদ পাবিরে॥
রাখ গুরুপদে ভক্তি, তাতে যেন হ'ত ভক্তি,
কভু নাহি হয় মন সজাগেতে থেকোরে।
ভ্রম ঘুমে ঘুমায়োনা, এ জনম হারায়োনা,
গুরু রুষ্ট হৈলে সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হবেরে॥
গুরু যদি রন তুষ্ট, কৃষ্ণ যদি হন রুষ্ট,
তাতে নাই তত কষ্ট গুরু উদ্ধারিবেরে।
গুরু যদি হন রুষ্ট, তাতে নহে কৃষ্ণ তুষ্ট,
দুইকুল হবে নষ্ট শেষে ফাঁকী পাবিরে॥
দরিদ্রেরে ধন রুষ্ট, তাত মন জান স্পষ্ট,
তথাপি ধনীর কাছে চেয়ে কিছু পায়রে।
রোষ যদি করে ধনী, রোষে ধন রোষে ধনী,
রোষ কৈলে ধনী ধন আর কেবা দেয়রে॥
তাই বলি ওরে মন, সেব গুরু শ্রীচরণ,
সুন্দর রতন মণি তোর হাতে দিবেরে।
নাশিবে দরিদ্র দশা, ঘুচিবে ভব পিপাসা,
অব্যয় অচ্যুত পদ অনায়াসে পাবিরে॥

দীন—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য।

গীত।

—:•:—

কীর্ত্তন—একতালা।

ওহে শান্তি ময়! আমার, অশান্তি অনলে দহিছে জীবন।
ওহে ত্রিতাপ হারী! দিয়ে কৃপা বারি অশান্তি অনল কর নির্ব্বাণ॥

শান্তির আশায় মজিলাম বিষয়ে, তাহে দিবানিশি দগ্ধ হয় হিয়ে,
বারেক ভুলিয়ে তোমা না ডাকিয়ে, (নরক গামী হ'তে হলো ;—
আমার পাপে দেহ হয়েছে ভারি) ভীষণ করাল ব্যাধিতে ঘিরেছে হে ;—
ওহে নরক নিবারী, দিয়ে চরণ তরি, ভবার্ণবে পার করো নারায়ণ ॥
সংসার অসার ওহে সারাৎসার, তুমি কেবল সার বিশ্ব মূলাধার,
এ পুত্র পরিবার, নহে আপনার, (সুখের ভাগী সকলি হরি ;—
আমার পাপের ভাগী কেউ হবেনা) কামিনী কাঞ্চনে আশক্ত রেখনা,
করহে করুণা, হরহে যাতনা, অভয় পদে আজি নিলাম হে স্মরণ ॥
দূর কর হরি দেহের অভিমান, সঙ্গে সঙ্গে যাক্ আমার আমার জ্ঞান,
ওহে দয়াল ভগবান করো পরিত্রাণ. (আর যে জ্বালা সইতে নারি,
সংসার জ্বালায় জ্বলে ম'লাম্) প্রাণের যন্ত্রনা সকলি জান হে ;—
তুমি হওহে সদয়, ওহে দয়াময়, দয়া করো দীনে দীন শরণ ॥

(২)

কেমনে বুঝিব তব লীলা ওহে রাধা রমণ।
তুমি কারে দাও রাজত্ব, কারে দাও দাসত্ব কারো হর তুমি রাজ্য ধন ॥
বলি ক'রে তোমায় সর্ব্বস্ব প্রদান, নাগ পাশে বন্ধন এ কেমন বিধান,
(আবার) হিরণ্য কশিপু পাইল পরিত্রাণ ; (সেতো দ্বেষ ক'রেছিলো,
শ্রীঅঙ্গে কত আঘাত করেছে) দৈত্যারি দুখ হারী দয়ার সাগর ;—
এ কেমন বিচার, ওহে সারাৎসার, কোলে ক'রে তারে দিলে মুক্তি ধন ॥
শুনেছি যে হরি তোমার কৃপায়, মথুরা নগরে অন্ধে চক্ষু পায়,
ব্রজ ধামে নন্দ কাঁদে সর্ব্বদায়, (নন্দ অন্ধ হয়েছিলো—
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে) ওহে অন্ধের নয়ন খঞ্জের যষ্ঠী ;—
ওহে প্রাণ গোবিন্দ, জগদানন্দ, বুঝাইয়া দাও এখেলা কেমন ॥
বিষ পুরা মুখে কালীয় ক্রুর মতি, অনায়াসে চরণ পেল যদুপতি,
কি হবে হে গতি অগতির গতি. (আমার সর্ব্বাঙ্গে বিষপুরা হরি
মুখে গরল অন্তরে গরল) ওহে কালীয় গঞ্জন দীন দয়াময়,—
সেই কালীয়ের মত, ওহে মন্মথ, দয়াক'রে দাসে দাওহে চরণ ॥

শ্রীবৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য।

সাধনার প্রথমস্তর।

—:o:—

"সাধনা" বলিলে আমরা বুঝি পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে অথবা নির্জ্জন পর্ব্বত গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক কামক্রোধাদি রিপুগণকে বশীভূত করিয়া ভগবানে মনের একাগ্রতা সম্পাদন। সাধনার ফল ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা। তাহা আর্ত্ত জগতে ও বহির্জগতে উভয় জগতেই হইতে পারে। পুরাণ পাঠে আমরা অবগত হই ধ্রুব প্রহ্লাদাদি বহির্জগতে ভগবানের সাকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া ছিলেন। আজকাল ও অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা বহির্জগতে না দেখুন অন্তর্জগতে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিবিকাশ দেখিয়া প্রেমে পুলকিত হয়েন। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে কি হয়, সাধক ভগবানকে দেখিয়া কি করেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের অনুভব করা অত্যন্ত কঠিন। পার্থিব সুখের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। তবে অনুমান করিয়া যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বলা চলে যে, সে সুখ স্বর্গের মন্দাকিনী ধারা, চন্দ্রের অমিয়মধুর হাসি জড়ান একটা কিম্ভূত কিমাকার অচিন্ত্য অব্যক্ত পদার্থ আছে। যাহা অনুভব না করিলে বুঝা যায় না তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব। উহা প্রকাশ করিতে যাওয়া আর বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়া একই বস্তু আমার নিকট অনুমিত হয়।

ইদানীং আমার বক্তব্য এই-উক্তরূপ সাধক ব্যতীত কি ভগবানের করুণ কণা লাভ করা যায় না? আমার বিশ্বাস পূর্ণরূপে সাধকত্ব প্রাপ্ত না হইলেও ভাগ্য-বশতঃ দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য ভগবদনুভূতি লাভ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—আমরা কোন বস্তু ক্রয় করিতে গেলে তাহার নমুনা দেখি, কেননা সেই বস্তু প্রথমতঃ আমাদের অপ্রীতিকর হইতে পারে, কিন্তু যদি কেহ সেই বিষয় সম্বন্ধে আমাকে বলিতে থাকে তখন আমি তাহার কথায় বিরক্তি বোধ করিয়াও কিঞ্চিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম এখন যদি ঐ জিনিষটা প্রকৃত পক্ষে খাঁটি হয় তবে ঐ জিনিষটী আমিও পছন্দ না করিয়া থাকিতে পারিব না। আমার পছন্দ হইলে ক্রমে

আমি ঐ বিষয়ে আশক্ত হইয়া পড়িব তখন ঐ বস্তুতেই আমার সম্পূর্ণ একাগ্রতা প্রধাবিত হইবে। হরিনাম সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা। শুনিতে শুনিতে বলিতে বলিতে আমাদের মত্ততা জন্মিবে। নামে মত্ততা জন্মিলে নাম মহাত্ম্যে ক্রমে ক্রমে অসার পদার্থ বিদূরিত হইবে। কাম ক্রোধাদি অসার পদার্থ বিদূরিত হইলে অশান্তির কালিমা বিদূরিত হইয়া মত্ততার পাপ নেশা পরিত্যক্ত হইয়া বিমল ভক্তি আসিয়া উদয় হইবে। আমরা ভক্ত হইয়া যাইবে।

"সাধক না হইলে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায় না" এইকথা কঠোর শাসন, অনেক সময়ে অনেকের পারমার্থিক জীবন একবারে বিষময় করিয়া দেয়। সাধক বড় উচ্চদরের কথা? সাধক? বাপরে? সাধক হইতেও পারিব না ভগবদনুগ্রহও পাইবনা। এই ভীতিব্যঞ্জক ভাবে অনেকের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। এই নৈরাশ্য নিরাকরনার্থে আমার বক্তব্য এই :—লোকে পাপ করিতেছে পাপের স্রোতে অহরহ অবগাহন করিতেছে কিন্তু তাহাদের কি গতি নাই? তাহাদের কি কোন উপায় নাই? যাহাতে তাহাদের কামকলুষিত প্রাণ প্রেম পুলকিত হইয়া উঠে?

কথা এই আমরা পাপী আমরা অধম কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নিরুপায় নাই। আমাদের উপায়ের পন্থা নিশ্চয়ই আছে।

ভগবানের সৃষ্টির অন্তরালে দুটী বস্তু নিত্য বিদ্যমান। যেখানে জন্ম সেখানে মৃত্যু, যেখানে বিকাশ সেখানে বিলয়, যেখানে আসক্তি, সেখানে মুক্তি। যদি প্রতিনিয়তই সৃষ্টির রাজ্যে দুই বস্তুর পারম্পর্য্য রক্ষিত হইতেছে; যদি ভগবান্ প্রকৃতি পুরুষদ্যোতক রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের দ্বারা জগতে দ্বৈতত্ত্বের স্পষ্ট মীমাংসা করিতেছেন; তখন দুই বস্তুর সত্তা অসম্ভব নহে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যেখানে আসক্তি সেইখানেই মুক্তি। আসক্তি না থাকিলে মুক্তির মাহাত্ম্য কোথায়? আধার বিনা আলোকের অনুধাবন অসম্ভব। সুতরাং দেখিতে হইবে সৃষ্টির রাজ্যে আসক্তিও যাহার সৃষ্টি মুক্তিও আবার তাহারই সৃষ্টি। আসক্ত মুক্ত হইবেই নহিলে আর কাহারা হইবে।

এখন দেখা যাউক এই অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমরা কি? আমরা স্রষ্টার সৃষ্টি পুতুল। আমরা অস্বাধীন আমাদের কিছু মাত্র স্বাধীনতা নাই ভগবানের

কলযুক্ত পুতুল ভগবানের প্রদত্ত শক্তি অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ :—কাজের সুবিধা অনুসারে আমরা লৌহ হাতুড়ী নির্ম্মাণ করি। হাতুড়ী প্রস্তবণ আমাদের হাতে। হাতুরীর কোন স্বাধীনতা নাই। যখন কোন কাজ করিতে হয় তখন আমরা তাহাতে নিয়মিত বল প্রয়োগ করিয়া কাজ করি। ইঁহাতে হাতুরীর গর্ব্ব করিবার কিছু নাই। মানুষ ভগবানের হাতুরী সুতরাং তাহার গর্ব্ব করিবার কি আছে? ইহা হইতেও দেখা গেল মানুষ অস্বাধীন, তাহার ক্রিয়া কলাপও তাহার ইচ্ছাধীন নহে। আমাদের বক্তব্য পাপপুণ্য ভগবানে সমর্পণ করা। যদি, "পাপভাগী আমি নহি" "পুণ্যভাগী আমি" ইত্যাদি দ্বৈতভাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হই তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে আমাদের হৃদয় আঁধারময়।

এখন আমাদের করিতে হইবে এই :—

আমাদের পুত্র পরিবার ত্যাগ করিতে আমরা পারিব না। পার্থিব লোভও আমরা সম্বরণ করিতে পারিব না। যাহারা সেই সকল উচ্চ কর্ম্ম করিতে পারিবে তাহাদের কথা আমি বলিতেছি না। ইহা সত্ত্বেও আমরা এক মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। এই মহা পাপকাকলী মুখরিত কলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সময়ে হরিনামের গভীর ঝঙ্কারে দিগন্ত মুখরিত করিয়া পাপ তাপ সব দূর করিয়া দিতে হইবে। আমরা কিছুই জানিনা। কেবল "নাম" আর "নামে পাব মোক্ষধাম" এই সার। প্রশ্ন হইতে পারে নাম করিলে কি হইবে? কীর্ত্তন করিলে কি হইবে? সঙ্গীত মিশ্রত হরিনামে আমাদের কি হইবে? তদুত্তরে এই বলা চলে যদি কিছু হইবার থাকে, যদি মনের বিষয়াশক্তি কিছুক্ষণের জন্য বিরত থাকে, যদি হরি নামে এক মুহূর্তের তরে প্রাণ নাচিয়া উঠে তবে আর কিছু হউক বা না হউক মন "আর একবার" হরিনামের জন্য আকুল হইবে। পরে "আর একবার" হরিনামের জন্য "পাগল" হইবে। ক্রমে হরিনামের মোহন সুরে তাহাকে পাগল করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয় কন্দরে নাম সুধার ধারা ঢালিয়া দিবে। সে নামে মত্ত হইয়া যাইবে। তখন হরিনাম গানই তাহার জীবনের প্রধানতম কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আপত্তি উঠিতে পারে ইহাতে কি হইবে? হয়ত ৫০।৬০ বৎসর হরিনাম করিয়া

তাহাতে একটু মত্ততা আসিল। আমি বলি তাহাতেই হইল। সেই হইতেই সে উন্নত জীবনে পদার্পণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার "সাধনার" প্রথমস্তর আরম্ভ হইল।

কথাটা বড়ই দুরূহ। সহজে বুঝা যায় না। তাই আর একটু সরল করিতেছি।

আমরা হিন্দু। জন্মান্তর বিশ্বাস করি। এক জন্মের সংস্কার অন্য জন্মেবর্ত্তে ইহাও বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি এ জন্মে যতটুকু কাজ করিলাম তাহার পর হইতে আবার পরজন্মে আরম্ভ করিব। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই আমাদের সাম্প্রতিক জন্ম হইতে মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত যতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে তাহাকে এক মহাজীবন অথবা "মহাসাধনা" বলেলেও অত্যুক্তি হয় না। যে জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি তাহা সাধনা বই আর কি হইতে পারে? যে মুহুর্ত্তে আমরা উন্নত জীবনে প্রবেশ করিলাম তাহার পর হইতেই যে আমাদের উন্নতি ক্রমোন্নতি, তাহা সাধনার স্তর অথবা সোপান। আমরা জন্মে জন্মে সেই উন্নতি সোপান উত্তীর্ণ হইয়া ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিব। সেই মহাজীবনের বা সাধনার প্রথম ভাগকেই আমি প্রথম স্তর বলিয়াছি। যাহাতে আমরা প্রথম স্তরে উঠিতে পারি তাহারই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নতুবা অন্ধকারাবৃত রজনীতে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় লক্ষ্য শূন্য জীবন লইয়া আমাদিগকে জন্মে জন্মে কেবল আঁধারে আঁধারে ঘুরিতে হইবে। আমরা আর আলো দেখিব না।

অপরদিকে আমরা যখন নাম মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিব, যখন নামে কত মধু আছে তাহা রসনাতে রাখিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব তখন হইতেই আমাদের নব জীবনের সূত্রপাত হইবে। আমরা নূতন জগতে নূতনভাবে প্রমোদিত হইয়া নূতন বিষয়ে মত্ত হইব। এই সময় হইতেই আমাদের সাধন আরম্ভ হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কিরূপে আমাদের "সাধনা" আরম্ভ হইল! প্রত্যেকদিন অথবা সপ্তাহান্তে চারি দণ্ডকাল হরিনাম করিলেই কি উহা সাধনা বলিয়া পরিগণিত হইল? আমি বলি, "হাঁ" উহাই সাধনার প্রথমিক ব্যঞ্জনা। সাধনার চরম লক্ষ্য ভগবানে অবিভক্ত একাগ্রতা প্রত্যর্পণ।

তাহা ঘরে বসিয়াই হউক আর অরণ্যে গিয়াই হউক এক প্রকার হইলেই হইল। নতুবা জনক গৃহী হইয়া ভগবানের নৈকট্য লাভে সমর্থ হইল কি প্রকারে? তবে কথা এই—প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া একাগ্রতা সম্পাদন যত কঠিন, লোক সমাগম শূন্য স্থানে তাহা অপেক্ষা সহজ সাধ্য। তবে আরও কথা হইতে পারে যে, কত শত যোগীঋষি যুগযুগান্ত ধরিয়া ধ্যানস্তিমিত নেত্রে নিবিড় অরণ্যে ভগবানের আরাধনা করিতেছে কেন? তাহাদের কি স্বার্থ? আমি বলি তাহাতে তাহাদের স্বার্থ আছে। আমরা হরিনাম করিয়া একজীবনে যতদূর অগ্রসর হইতে পারিব, আমাদের যতটুকুক চিত্তশুদ্ধি জন্মিবে তাহা হইতে তাহাদের সহস্র গুণে অধিক। তাহারা এক জন্ম অথবা দুই জন্ম সাধনার পর মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু আমরা তাহা পারি না। ক্রমে ক্রমে আমাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার এবং সহজ হয়। প্রক্রিয়া এক প্রকার। বৃক্ষ চূড়ে উঠিতে হইলে সমধিক পটু ব্যক্তি যেমন অনভ্যস্ত বালক হইতে সকালে উঠিতে পারে সেইরূপ যোগীঋষি সাধারণ মানুষ হইতে সকালে এবং সহজে ইষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন। যোগীঋষি এবং সাধারণ মানব উভয়কেই সমান পথ ধরিতে হইবে। গাছে উঠিতে হইলে যেমন প্রত্যেককেই গোড়া হইতে উঠিতে হইবে সেইরূপ মহাপুরুষদিগকেও সাধনার স্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। তাঁহারা সেই স্তর যতশীঘ্র অতিক্রম করিতে পারেন, আমরা তত শীঘ্র পারি না। পারি না বলিয়াই আমাদের মুক্তি অতি দূরে অবস্থিত। যাহা হউক এমন বুঝাগেল লব্ধজ্ঞান জীবন হইতে মুক্ত জীবন পর্য্যন্ত সময় আমাদের এক মহাসাধনা। এই সময়ের মধ্যে কত জন্ম, কত যুগ অতীত হইয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই। প্রত্যেক জন্মেই আমাদের সাধনার নূতন স্তর আরম্ভ হইবে। এই সকল স্তর অতিক্রম করিলে তবে আমাদের মুক্তি।

এখন দেখা গেল আমরা সকলেই মুক্ত হইব। কেহ আজ কেহ কাল, এই তফাৎ। আমাদিগের সাধনার ফল অনুসারে যে যত শীঘ্র নামে মজিবে সে তত শীঘ্র মুক্ত হইবে। যে যত বিলম্ব করিবে তাহার তত দেরি হইবে। কিন্তু প্রত্যেককেই নামে প্রেম উপলব্ধি করিতে হইবে! গাছের গোড়ায় আসিতে হইবে!! সাধনার প্রথম স্তরে পদার্পণ করিতে হইবে!!!

অতএব আসুন আমরা এই শুভলগ্নে দিবা বিভাবরীর শুভসম্মিলন ক্ষণে মধুর হরিনামে দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলি। আমাদের হরিনাম ধ্বনি লোকের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিউক্। আমাদের 'নামে' মতিগতি হউক। নামে প্রেম উথলিয়া উঠুক। আমরা পাপী তাপী সব উদ্ধার হইয়া যাই। আসুন সকলে মিলিয়া আজ এই সান্ধ্য সম্মিলনে আমরা মনের সাধে হরি হরি বলে ডাকি। আমাদের মহাজীবনের, মহাসাধনার প্রথম স্তর আরম্ভ হউক। আসুন আজ এই মহাসন্ধ্যায় মহাসংকীর্ত্তনে দিক-পালগণকে প্রকম্পিত করিয়া হরিনামের মহামন্ত্রে এই মহাদেশ অনুপ্রাণিত—পরিপ্লাবিত করিয়া দেই আমাদের জীবনে পুষ্পবৃষ্টি হউক।

শ্রীহেমকুমার মজুমদার।

কর্ম্ম ও ভক্তি।

—০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রূপনিধি গুণনিধি না হইলে প্রাণ টানে কি? কৃষ্ণ জীবের প্রাণ, আগে টানেন নিজ নাম দিয়া, নামে ভাবস্ফূর্ত্তি পায়; শেষে টানেন ভাব দিয়া। কৃষ্ণ কলিতে নাম দিয়া, ভাব দিয়া, জীব মাতাইয়াছেন। ভাবতুল্য আকর্ষণী শক্তি আর নাই। পূর্ণ ভাব শক্তি শ্রীরাধা! এই ভাব সিন্ধুতে ডুবিয়া কৃষ্ণ ভাব জলে ঘোতলানী (toss) দিয়াছেন, উৎক্ষিপ্ত তচ্ছীকর কণারাজী জীবের গাত্র স্পর্শ করিয়াছে, আর অমনি জীবকে ভূতে পাইয়াছে, জীব কৃষ্ণ প্রেমে মাতিয়াছে। তাই জপ তপ যোগ ধ্যান কর, পূজা হোম কর, এসব ভক্তি বা শুদ্ধ কর্ম্ম। কিন্তু ভাবযোগে যে কৃষ্ণ সম্বন্ধ, তাহাই কৃষ্ণ ভক্তি বা ভাব ভক্তি। উহা শুদ্ধ কর্ম্ম চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ উদ্দেশে পূজা করা যায়, কিন্তু ঠাকুর চিত্তে ঠেকে না, চিত্ত চিন্ময় বিভোর না হইলে, চিত্ত তটস্থই থাকিয়া যায়। প্রাণের আকুলতা উৎকণ্ঠা জন্মান চাহি, তাহা কৃষ্ণমূর্ত্তির ঝলক না

লাগিলে জন্মে না। কারণ কৃষ্ণ ভিন্ন, ওরূপ মনভুলানো মূর্ত্তির মাধুরী ভিন্ন, চিত্ত আকৃষ্ট ও বিবশ হইতে পারে না, সংসার হইতে উজান টানিতে পারে না। কৃষ্ণ মূর্ত্তিতো অনেক দূরে! অনেক উচ্চে!! কৃষ্ণ মহিমা বিদগ্ধ মাধবে কিরূপ বর্ণিত আছে, দেখুন—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং।
সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরা মুপনয়ত্যস্য বংশীকলঃ॥
এষ স্নিগ্ধ ঘনদ্যুতির্মনসিমেলগ্নঃপটে বীক্ষণাৎ।
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিভূম্মন্থে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

কিবা কৃষ্ণনাম মহিমা, কিবা তার মূরলীকলনাদ শক্তি, কিবা তার পটাঙ্কিত মূর্ত্তির অদ্ভুত গুণরাজি! সাক্ষান্মূর্ত্তিতো দূরের কথা!

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। শ্রীগীতার "সর্ব্বধর্ম্ম," শ্রীচরিতামৃতের "শুভাশুভ কর্ম্ম" একার্থক বটে। সর্ব্বধর্ম্মময় বিচিত্র মদনরাজ্য পরিত্যাগ করিবার একমাত্র উপায় কৃষ্ণরূপের মনোময় মাধুরীচ্ছটা। কারণ কৃষ্ণ হইয়াছেন—

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্‌বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতম্।

আবার উনি হইয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥

সুন্দর বস্তু, মধুর বস্তু, সকলেই ভালবাসে, সকলেরই মন উহাতে মুগ্ধ হয়। কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, অথচ পরম সুন্দর। তাহার দর্শন এত সুন্দর যে অন্য কিছু দেখিতে আর বাসনা থাকে না। উহা তাঁহার দর্শনেরই মহিমা। সুন্দর পুরুষে ভুলিয়া গেলাম, আত্ম সমর্পণ করিলাম, অথচ আবার উনিই পরমেশ্বর, সুতরাং কামদিয়া ভগবৎ প্রাপ্তি হইল। যে ভক্ত এই কামাগ্নি দ্বারা জর্জ্জরিত হন, তিনি কৃষ্ণ ভক্ত তিনি শুভাশুভ কর্ম্মের অতীত। শ্রীরাধার ভাব রসায়ন না হইলে, কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তির কোন স্ফূর্ত্তি অনুভূত হয় না। তৎ প্রমাণ যথাঃ—

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন মোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহো হপি স্বয়ং মদন মোহিতঃ॥

জ্যামিতির দুটি বিপরীত প্রতিজ্ঞা যেমন ত্রিভুজ সমবাহুক হইলে সমান কোণিক হয়, সমান কোণিক হইলে সমবাহুক হয়। এস্থলে বস্তুতত্ত্বে কোন ভেদ নাই এক অবস্থারই দুইটী নির্দ্দেশ মাত্র। যেমন কোন ও বংশদণ্ডের এই প্রান্ত হইতে মাপিয়া যাও যত, অপর প্রান্ত হইতে মাপ আরম্ভ কর তত, পরিমানে ও সেই, বস্তুও সেই। ঐস্থলে এক ত্রিভুজেরই দুইটা উপাধি মাত্র; সমবাহুকত্ব ও সমান কোণিকত্ব নিত্যসম্বন্ধিনী নিত্যাবস্থা। উহারা পরস্পর কারণ ও নয়, পরিণাম ও নয়, সমবাহুক হইবার পরে ত্রিভুজ সমান কোণিক হয় না। উভয়ই সমকালীন, অবচ্ছিন্ন। "কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।" "শুভাশুভ কর্ম্ম কৃষ্ণ ভক্তির বাধক" এও যা, "কৃষ্ণভক্তি শুভাশুভ কর্ম্মের বাধক বা নাশক" এও তা, তৎপ্রমাণ যথা ঃ—

মধুক্লীবঙ্গ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্ম শুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মাণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনং॥

পরিণামা শুভং কর্ম্মভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি সূদনং যোহি স এব মধুসূদনং॥

কৃষ্ণ ভিন্ন কে আর শুভাশুভ কর্ম্মনাশ করিতে সক্ষম্? এজন্য কৃষ্ণের নামান্তর মধুসূদন।

শ্রীযুগল বিগ্রহ পূর্ণানন্দরসোংস। "কৃষ্ণ ভক্তি" দ্বারা যুগল সেবাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যত্র যুগল সেবা বা দুইয়ের সেবা তত্র অন্যসেবা বা আত্মসেবা বা স্বার্থ থাকিলে তিনের সেবা হয়। শুভাশুভ কর্ম্ম ঘুচাইবার উপায়ীভূতবাক্য এই "মামেকং শরণং ব্রজ।" (এক মাত্র আমাকে) অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগল আশ্রয় কর। কারণ যুগলাশ্রয় ব্যতীত সর্ব্বধর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ঘুচে না। "একং" পদদ্বারা কেমন করিয়া যুগল প্রতিপন্ন করা যায়? আপাততঃ ইহা অসাধ্য বলিয়াই উপমিত কিন্তু দেখুন, "অখণ্ডং পূর্ণং," পূর্ণব্রহ্ম হইলেন রাধাকৃষ্ণ আধা আধা এক। "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, ইনি যুগাবতার অংশ।

অংশ ভগবানের শরণাপন্ন হইতে তিনি এত দার্ঢ্যের সহিত উপদেশ দিবেন কেন? এত মাথার কিরে দিবেন কেন? ইহার ভিতর অবশ্যই রহস্য আছে।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥

কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ যদুসম্ভূত অংশ; শ্রীবৃন্দাবন লীলাকরী কৃষ্ণ পূর্ণ। উনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান না; সুতরাং কুরুক্ষেত্রে উনি যান নাই। অতএব "মামেকং শরণং ব্রজ" উক্তির মর্ম্ম এই :—

"আমি ইহা করি, উহা করি না" ইহাই বন্ধন-মোক্ষের হেতু, পাপ পুণ্যের হেতু। "আমি করি" এরূপ ধারণা হইতেই কর্ম্মফলের দারুণ বিপাকে সম্পতিত হইতে হয় কিন্তু হৃদিস্থিত হৃষিকেশ যা করান তা আমি করি, আমি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহি ঈদৃশ বিশ্বাসরূপ উপাধানের যদি আশ্রয় লওয়া যায়, তাহা হইলে অকর্ম্ম বিকর্ম্ম ঘটিত পাপ আসিয়া আমাদিগকে কবলিত করিতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর বলিয়াছেন "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো রক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" ইহার সহজগম্য তাৎপর্য্য এই যে, ওরূপ নির্ভরে পাপ আসিতে পারে না। সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না। যে হেতু সর্ব্ব ধর্ম্মে বা কর্ম্মে ঈশ্বর নির্ভরতা প্রযুক্ত কর্ত্তৃত্ব বোধ বিলুপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্য গণ্ডীতে এই পর্য্যন্তই উক্ত সমাচারের অর্থ গতি; কারণ উহা মোক্ষযোগ সংবাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা যায় শ্রীরাধার প্রেরিতা দূতী দাসখত লইয়া মথুরায় গেলেন। দূতী মুখে উচ্চারিত রাধানাম শুনিতেই পূর্ব্বস্মৃতির জাগরণে প্রেম বিহ্বল হইয়া ব্রজধামে যাইয়া শ্রীমতীকে দর্শন দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কৃষ্ণ একবার উদ্ধবকে ও শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া ছিলেন। প্রভাস যজ্ঞে ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়াছিল। এ সব লীলা দ্বারা সুন্দর প্রমাণিত হয় যে, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ভিন্ন হইলেও সময় সময় দেবকী নন্দনে শ্রীনন্দনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং কুরুক্ষেত্রে তদনুসারে লীলা ঘটনা ও অসম্ভব হয় নাই। শ্রীনন্দনন্দন আবির্ভূত হইয়াই বলিয়াছেন "মামেকং শরণং ব্রজ।" সুতরা- এই শরণ লওয়া গাম্ভীর্য্য ও তাৎপর্য্য অনেক বেশী। যুগল

সেবাই উহার চরম নিষ্পত্তি। "কৃষ্ণ দুই" এক কথার সার রতিভেদ ব্যতীত অপর কিছু নয়। "কৃষ্ণ তিনি এ কথা বলিলেও অসঙ্গত হয় না, যথা ঃ—কৃষ্ণ পূর্ণ! কৃষ্ণ পূর্ণতর!! কৃষ্ণ পূর্ণতম!!! "কৃষ্ণ দুই" এ সত্য ভজননিষ্ঠার চক্ষে, কিন্তু লীলার চক্ষে নয়।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজঃ।

কৃষ্ণভক্তি এত গুহ্যাতি গুহ্য অনধিগম্য হইলেও চলিবে না। শুভাশুভ কর্ম্ম করা কৃষ্ণভক্তির বাধক নয় কিন্তু শুভাশুভ কর্ম্মে ফলাসঙ্গ কৃষ্ণভক্তির বাধক। তুমি পুত্র প্রতিপালন কর, আত্মীয় বান্ধবগণের ভরণ পোষণ কর, পরোপকার কর, দান কর, কিন্তু কৃষ্ণ জ্ঞানে কর। ঘটে ঘটে কৃষ্ণ। দিদি! তুমি পতি সেবা কর, কর বেশ, কৃষ্ণজ্ঞানে কর। তুমি অন্ধকে দুটী পয়সা দিলে নাম কামের জন্য দিওনা, শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে দান কর। কর্ম্ম উপস্থিত হইলে সম্পাদন কর, কিন্তু সংকল্প করিয়া কর্ম্মবন্ধন বাড়াইও না।

সর্ব্বারম্ভর "পরিত্যাগী" যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। গীতা। "আমি একটা মহোৎসব করিব" ইত্যাকার অহঙ্কারমিশ্রিত কর্ম্ম করিতে যাইও না যদি কখন তোমার দ্বারা এমন একটী কর্ম্ম করান হয়, হইবে। নাম যশ গৌরবের জন্য লালায়িত হইয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইও না। যে সব কর্ম্ম তোমার নামে খাতায় জমা আছে, সে সব ক্রমে হইয়া যাউক, খরচ বাদ দাও, কিন্তু জমার ঘর আর বৃদ্ধি করিও না। আমরা "আমি ভাবে প্রমত্ত হইয়া কর্ম্মের খাতায় জমার ঘর বাড়াইয়া ফেলি। চিত্ত দৈন্য সলিলে প্লাবিত হইলে ওরূপ সংকল্পের কৃষিফসল জন্মে না। সাধারণ লোক কিছু মুস্কিল দেখিলেই হরির লুট (মুস্কিল আসানের সিন্নি) মানস করেন এবং দেন। ভক্ত সে সব মুস্কিলের বেলা ও অটল থাকেন, হরির অমৃত হস্তেরই আঙ্গুল নাড়া দেখেন, তিনি মানস করিয়া হরির লুট দেন না, চিত্ত প্রসাদই হরির লুট। হরির লুট দিতে হইলে পয়সা চাহি, পয়সার দিকে নজর পড়ে, বাজারে যাইতে হয়, বাতাসা কিনিতে হয়, অনেক যোগাড় যন্ত্র করিতে হয়, একটা কারখানা করিতে হয়, মনের মত কিছু না হইলে আবার চিত্ত ক্ষোভ উপজাত হয়। এক কর্ম্মের দশ কর্ম্ম শাখা

মেলে। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যেমন বংশ বিলুপ্ত হয়, কর্ম্মত্যাগে ও কর্ম্ম প্রবাহ স্তম্ভিত হয়। 'অশান্ত অবস্থা ভক্তির প্রতিকূল। শান্ত অপর চারিটি রসের ভিত্তিমূল। সংকল্পাত্মক কর্ম্মে লোককে এই ভাবে চঞ্চল করিয়া তুলে, ধীর হইতে দেয় না। ক্ষীরোদ সিন্ধু সুধা দেবগণ পাইয়াছিল। আমরা কি পাই না? ঐ দেখুন, ক্ষীরোদ সিন্ধূদ্ভব সুধাধর, আমাদের জন্য ভাণ্ডার ও ভাণ্ড লইয়া বসিয়া আছেন। কর্ম্ম হইতে অবসর লইলে রাত্রিকালে তিনি আমাদিগকে সুধা বিলায়েন। কৃষ্ণ ভক্তি ব্রজের যুগলসেবা গোপীজনের অধিকারে বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে জীবসেবা দ্বারা আমাদের কৃষ্ণ সেবা হয়। নিস্বার্থভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতি মাত্র উদ্দেশ্য রাখিয়া জীবসেবা করিলেই কৃষ্ণসেবা হয়! নিশ্চয় হয়!! উহাই কৃষ্ণভক্তির অকৃপণ সুধাবরিষণ।

কৃষ্ণ রূপ দিয়া ভক্ত প্রাণ আকর্ষণ করেন, এও সত্য, আবার ভক্ত ভক্তি গুণে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, এও সত্য। তদাদর্শ দেখুন—

শ্যাম-শুকপাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ান ফান্দে।
হৃদয় পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনোহি শিকলে বেন্ধে॥

চণ্ডী দাস।

কৃষ্ণ বাঁধিতে হইলে রাধার নয়নে নয়ন ভাবিত হওয়া চাহি, রাধার হৃদয়ে হৃদয় ভাবিত হওয়া চাহি। যাহার হৃদয় রাধার ভাবে বিভাবিত অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে ভগবৎ প্রাপ্তির দারুণ লালসা জন্মিয়াছে, তিনি ভক্ত। শ্রীরাধার ভাব কণাসূত্রে তিনি কৃষ্ণকে বাঁধিতে পারেন; শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যথা:—

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান।

অর্থাৎ

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

ঈশ্বর স্বরূপ বিগ্রহ, ভক্ততার শ্রীমন্দির। ভক্তের হৃদয়ে তিনি সতত বিশ্রাম করেন অর্থাৎ গতাগতি করেন না কেবল বিরাজ করেন।

প্রকারান্তরে কর্ম্ম বিচার করা যাউক ঃ—কর্ম্ম তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম সমস্তই ভক্তি প্রতি কূল। কেবল সাত্ত্বিক কর্ম্ম, তাহাও স্বার্থগন্ধহীন হইলে, ভক্ত্যানুকূল হয়। কর্ম্মই জীবের অস্তিত্ব, সুতরাং কর্ম্ম বর্জ্জন অসম্ভব। যে অবস্থায় যে থাকে, যে অবস্থায় প্রভু যাহাকে রাখেন, তাহা আর কিছু নয় কেবল কর্ম্ম ভোগ। কর্ম্ম ভোগটুকুই জীবত্ব; কর্ম্মভোগ-মুক্ত হইলে কেহ সংসারের জীব থাকে না, ধামের জীব হয়; কারণ তখন তাহার ভগবদ্দাস্য সংলব্ধ হইয়াছে। দাস্য সম্বল বিনা ধামে প্রবেশ করা যায় না। ধাম জড়াতীত জ্যোতির্ম্ময় স্থল বা অবস্থা। জড়ীয় সম্বন্ধের নাম সংসার। তোমার কর্ম্ম তামসিক হউক্, রাজসিক হউক্ বা সাত্ত্বিক হউক্, সকল অবস্থায়ই ভগবৎ কৃপা অবতীর্ণ হইতে পারেন। ভগবৎ কৃপার সহিত বর্ত্তমান কর্ম্মের সাপেক্ষতা নাই। কোন্ কালের, কোন জন্মের কোন্ সুকৃতি ফলে কখন আবার কোন্ জন্ম ভগবৎ কৃপা সম্পাত হয়, তাহা জীব বুদ্ধির আয়ত্ত নয়। রত্নাকরের কার্য্যাবলী আমূল তমোময় ছিল। হিংসা, দস্যুতা, নৃশংসতা তাঁহার প্রথম জীবনের নিত্য কর্ম্ম ছিল। তবু কিন্তু কেন, কে বলিবে, সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিল এবং তৎফলে তিনি সাধু হইলেন, জন্মার্জ্জিত সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইলেন—তিনি রাম গুণগাথা গাহিয়া হইলেন কবিগুরু বাল্মীকি। ইদানীং শ্রীনবদ্বীপে মদ্যপ দুর্বৃত্ত দস্যু জগাই মাধাই তমো গুণের চরম সীমায় উঠিয়াও নিতাই গৌরাঙ্গ কৃপামৃত প্রবাহে স্নান করিয়া মহাবৈষ্ণব হইলেন। তমোময় কৃষ্ণ বৃক্ষেরই যখন ঈদৃশ অমৃত ফলের উদ্গম হয়, তখন সাত্ত্বিক-কর্ম্ম ফল যে আরো কত মধুর হইতে সুমধুর হইতে পারে, কে অস্বীকার করিবে? কারণ শ্রীভগবৎ কৃপা বর্ত্তমান কর্ম্মনিরপেক্ষ। এক কালীন কর্ম্মনিরপেক্ষ কিনা বলা যায় না। কৃপানুসারে কর্ম্ম বটে, কি কর্ম্মানুসারিণী কৃপা, এই অনাদি তত্ত্ব কেহই যুক্তি দ্বারা স্থির করিতে পারেনা।

"হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যা করান্ তাই করি।"

এরূপ ভাবনা দ্বারা কর্ম্ম কুসুম বীজ বিনষ্ট হয়। রক্তবীজের রক্ত মাটীতে পড়িতে দিতে নাই। ভগবৎ প্রসন্নতা হইতে কর্ম্ম রূপ পানা সকল সরিয়া যায়; তখন কেবল ভগবৎ কৃপারূপ নির্ম্মল বারির টলমলি তরঙ্গ দৃষ্ট হয়, সুতরাং কর্ম্ম

নশ্বর, কৃপা নিত্য বস্তু ও কর্ম্মের মৌলিক হেতু। সুতরাং সর্ব্বত্র প্রায় কর্ম্মই দৃষ্ট হয় কেবল কুসুমের ফাঁকে ফাঁকে সময় সময় কৃপা ও লক্ষিত হয়। কর্ম্ম কুসুম শুকাইয়া ঝরিলে শুদ্ধ কৃপা সূত্রটী থাকিয়া যায়। তাই বাল্মীকির ভীষণ কর্ম্মের ভিতর দিয়া ও কৃপাসূত্র ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং কৃপাই কর্ম্মের অনাদি হেতু; তুমি আমি আমাদের অবস্থা গড়াই নাই। তাই কৃপার উপর নির্ভর করিতে গীতার আদেশ উপদেশ। ভাল, তুমি আমি গড়াই নাই, তবে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, সুস্থ রুগ্ন, বড় ছোট ভেদ কেন দেখি? তোমার চক্ষু আছে, নাক আছে, কাণ আছে, হাত পা আছে ইত্যাদি।

এদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট? কাণ বলিতে পারে "আমি দেখিব," চক্ষু বলিতে পারে "আমি শুনিব।" আমাদের জীবনে এরূপ খেদ ক্ষোভ। কিন্তু সব ভ্রান্তি মাত্র, কারণ প্রত্যেক জীব শ্রীভগবানের একটী অঙ্গ, যে অঙ্গের যে কর্ম্ম তাহাই হইতেছে। সুতরাং সবই কৃপা।

তামসিক কর্ম্মের ভিতর দিয়াও ভক্তি কমল সুন্দর ফুটে; লোকে বলে যেমন গোবরে পদ্ম ফুল। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। তিনি পুত্র দ্বারা শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। ভগবৎ কৃপার উপর কোন আইন কানন নাই। ভগবৎ কৃপামূলে ভক্তি সঞ্চার হয়, নিতান্ত মরুভূমিতেও মন্দাকিনী প্রবাহিতা হন। সুতরাং কর্ম্ম দেখিয়া কাহারো ভাগ্য পরিণাম নির্ণয় করা যায় না। ভক্তি কর্ম্মে এরূপ উদাসীনা হইলেন, হউন, কিন্তু কর্ম্ম ভক্তির মেরুদণ্ড স্বরূপ। কারণ উত্তমা ভক্তি কৃষ্ণ সেবা এক শ্রেণীর কর্ম্ম, যাহা অজড় অমর।

শুভা শুভ কর্ম্মে সংকল্পাভাব হইলে, উহারা নিন্দনীয় নয়। অদ্য রজনীতে চন্দ্রগ্রহণ, দানে মহা পুণ্য, দান করা যাউক। অদ্য অর্দ্ধোদয় যোগ, গঙ্গাস্নানে শতাশ্বমেধ ফললাভ, স্নান করা যাউক। এসব শুভ কর্ম্ম, সংকল্পদুষ্ট। কৃষ্ণে লোভ বা তৎপ্রাপ্তি সংকল্প কভু নিন্দিত হইতে পারেনা। যেহেতু কৃষ্ণ প্রাপ্তি সংকল্প ভগবৎ কৃপারই তরঙ্গ। সুতরাং সাধন ভজন প্রবৃত্তিকে আমরা শুভ কর্ম্মারম্ভ বোধে উপেক্ষা করিতে পারিনা।　　　ক্রমশঃ

কালীহর বসু।

সৎপ্রসঙ্গ।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চ। একটী কথা মনে পড়িয়া গেল, কয়দিন হইতে তাহা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াও অন্য প্রশ্নের অবতারণা হওয়ায় ভুলিয়া যাই। সে দিন শ্রাদ্ধ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি প্রথমে বলিলেন "এ সকল বিষয় বড় জটিল, অথচ জানিয়াও বিশেষ কোন ফল নাই, শাস্ত্রানুযায়ি কার্য্য করা হইলেই হইল," তাহারপর আমি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি যাহা বলিলেন তাহা যুক্তি সঙ্গত না হওয়ায় মনের তৃপ্তি হইল না, এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে শ্রাদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য কি ও উহা কিরূপে নিষ্পন্ন হইলে ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

র। ভাই! গুরু পুরোহিতের দোষেই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের মহান্ তত্ত্ব সকল ক্রমশঃ আবরিত হইয়া পড়িতেছে, ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই, কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য একটু পড়িয়া বা গোটাকতক শ্লোক মুখস্থ করিয়াই তাঁহারা পণ্ডিত হইয়া পড়েন, কিন্তু প্রথমতঃ নিজের মঙ্গল না করিলে অর্থাৎ নিজে শক্তিমান ও তত্ত্বজ্ঞ না হইলে যে অপরের মঙ্গল সাধন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা বিড়ম্বনার কারণ হয়, অর্থলালসার মোহে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না। গুরু ও পুরোহিতের দায়িত্ব প্রায় একই প্রকার, গুরু আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার শক্তিসঞ্চার করেন ও পুরোহিত অগ্রগামী হইয়া সেই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন, গুরুশব্দের অর্থ যিনি অজ্ঞানান্ধকার পূর্ণ হৃদয়ে জ্ঞানালোক জ্বালিয়া দেন ও পুরোহিত শব্দের অর্থ যিনি ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া অগ্রে গমন করেন, অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক দৃষ্টির উন্মেষ না হইলে যিনি অপরের হৃদয়ে জ্ঞানালোক সঞ্চার বা নিজে অগ্রসর হইয়া অপরকে চালনা করিবার অভিমান করেন তিনি আধ্যাত্মিক প্রবঞ্চক

মাত্র, সদ্ভাবের দ্বারা সদ্ভাবের উন্মেষ হয়, যিনি তুচ্ছ স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা যজমান বা শিষ্যের সদ্ভাবকে বিকৃত করিয়া দেন, তিনি ঐহিক সুখলাভ করিতে ত পারেনই না অধিকন্তু পরকালে নরকের পথ সুগম করেন মাত্র।

অতএব নিশ্চয় জানিও যে অজ্ঞানে কোন কার্য্যই ফলপ্রদ হয় না, যাহাই কর না কেন, কি করিতেছ, কেন করিতেছ ও কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইলে প্রকৃত ফল প্রসব করিবে ইত্যাদি কর্ম্মের স্বরূপ, কারণ ও কৌশল যুক্তি বিচারের সাহায্যে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে ফলের আশা করা বাতুলতা মাত্র। পুরোহিত মহাশয় যে শাস্ত্রানুযায়ি কার্য্য করিতে বলিলেন, কিন্তু শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিলে তদনুযায়ি কর্ম্ম করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সেদিন ডাকপিয়ন একখানি পত্র দিয়া বলিল, বাবু! পত্রখানি বেয়ারিং হইয়াছে, আমি বলিলাম টিকিট দেওয়া পত্র বেয়ারিং হইল কিরূপে? তাহাতে সে বলিল "সব ঠিক হইয়াছে বটে কিন্তু যে লিখিয়াছে সে টিকিটের উপর কালীর দাগ পড়িলে যে বেয়ারিং হয় তাহা জানেনা," আমি তখনই ভাবিলাম যে, হায়! এই রূপে কর্ম্ম করিয়াও মূর্খ মানব তাহাতে অজ্ঞানতার কালী ফেলিয়া বেয়ারিং করিয়া ফেলে। যদি বল বেয়ারিং হইলেও পত্রখানা তো যাহার উদ্দেশে লেখা তাহার হস্তগত হইল, কিন্তু স্থূল জগতে স্থল বিশেষে তাহা সম্ভব হইলেও কপর্দ্দক হীন ব্যক্তি যেমন ঐ পত্র লইতে পারে না, সেইরূপ সূক্ষ্ম জগতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাব জন্য কর্ম্মের সংস্রব না থাকায় তাহা সম্ভব হইতে পারে না, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই ক্রিয়মান কর্ম্মের স্বরূপ, কারণ ও কৌশল জানা উচিত।

শ্রদ্ধা যুক্ত কর্ম্মের দ্বারা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে তৃপ্তি বা চৈতন্য শক্তির প্রয়োগ করাকে শ্রাদ্ধ বলে, মুখ্য ও গৌণ ভেদে ইহার প্রয়োগ বিধি দ্বিবিধ; গৌণ যাহার জন্য শ্রাদ্ধ করা যায় তাহার সাময়িক তৃপ্তি হয় মাত্র, কিন্তু মুখ্য প্রয়োগে তাহার আতিবাহিক বা যাতনা দেহ হইতে উদ্ধার লাভ হয়; এক্ষণে গৌণ ও মুখ্য প্রয়োগের তত্ত্ব বুঝিবার পূর্ব্বে দেহত্যাগের পর দেহী গণের কিরূপ গতি ও অবস্থা হয় তাহা শ্রবণ কর।

দেহত্যাগের পরে কর্ম্ম ভেদে দেহীর গতি দ্বিবিধ, মনের উর্দ্ধ মুখীন অবস্থায় অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলে শুভ্র বর্ণ জ্যোতির্ম্ময় দেব যানে

ও নিম্নাভিমুখীন অবস্থায় অর্থাৎ অজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলে ধূম্রবর্ণ অন্ধকারময় পিতৃযানে গতি হয়, দেহান্তে সকল ব্যক্তিই কর্ম্মানুযায়ি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন স্তরে ফল ভোগ করে; দেবযানাবলম্বীদিগের শ্রদ্ধাদি না করিলেও চলে, পিতৃযানাবলম্বিদিগের শ্রাদ্ধ না করিলে শ্রাদ্ধাধিকারির অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে কিন্তু দেবযানাবলম্বিদিগের শ্রাদ্ধ না করিলে কোন ক্ষতি হয় না, তবে করিলে শ্রাদ্ধ কর্ত্তার বিশেষ মঙ্গল হয় কেননা ঐ সকল মহাত্মার দেহ বিজ্ঞানময়, এজন্য ঘাতের প্রতিঘাত লাভের অবশ্যম্ভাবি নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধ কর্ত্তা আপন প্রযুক্ত ভাবের বিজ্ঞানময় প্রতিঘাত পাইয়া আনন্দগর্ভ শান্তি লাভ করেন। দেবযানের পথে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি গমন করিতে সক্ষম হন, অজ্ঞান মোহ বিনষ্ট না হইলে এই পথে গমন করিবার অধিকার হয় না সুতরাং অধিকাংশ ব্যক্তি পিতৃযানে গমন করিতে বাধ্য এবং ইহাদের জন্যই শ্রাদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন জানিও।

চ। জ্ঞানীদিগের শ্রাদ্ধ করিলে যেমন বিজ্ঞানময় প্রতিঘাত লাভ হয়, সেইরূপ অজ্ঞানী দিগের শ্রাদ্ধ করিলে ত যাতনাময় প্রতিঘাত পাওয়া যাইতে পারে?

র। ঘাতের ভাবানুসারে প্রতিঘাত লাভ হয়, তুমি যে জাতিয় ভাবের ঘাত প্রয়োগ করিবে, সেই জাতিয় ভাবের প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইবে, তবে স্থল বিশেষে এই প্রতিঘাতের অল্পাধিক্য হইতে পারে মাত্র, আধার অনুসারে প্রতিঘাত হয়; প্রস্তরে আঘাত করিলে যে প্রতিঘাত পাইবে, তুলায় তাহা হইতে অনেক অল্প পাইবে, অথবা বন্ধুতা সূত্রে কোন দরিদ্রকে উপহার দিলে প্রতিদানে তাহা হইতে তোমার প্রদত্ত দ্রব্য অপেক্ষা অল্প পাইবে ও এই হিসাবে সমযোগ্য ব্যক্তি হইতে সমান ও ধনী ব্যক্তি হইতে অধিক পাইবে, এখানে যেমন সঙ্গতি অনুসারে প্রতিদান, সেইরূপ আধার ভেদে স্বজাতিয় ভাবের অল্পাধিক প্রতিঘাত লাভ হয় জানিও, যাহা হউক এক্ষণে যাহা বলিতে ছিলাম তাহা শ্রবণ কর।

ব্রহ্মাণ্ড সপ্তম লোকে * বিভক্ত, আবার প্রত্যেক লোকের সাতটি করিয়া স্তর আছে, এবং স্তর ভেদে এই চৈতন্য শক্তির প্রকাশ ভেদ হয়, পুরাণে যে

* ভু, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য।

উন-পঞ্চাসৎ বায়ু স্তরের কথা লিখিত আছে তাহা সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বিভূতির ভৌতিক আবরণ মাত্র। ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্র স্বরূপ দেহভাণ্ডও অনুরূপ স্তরে বিভক্ত শাস্ত্র এই স্তরকে ভূমি বলে, ইহার মধ্যে তিন ভূমি, অবিদ্যা উপহিত চৈতন্যের, দুই ভূমি বিদ্যা উপহিত চৈতন্যের ও দুই ভূমি অনাবরিত চৈতন্যের অধিকার, আবার এই অনাবরিত চৈতন্য ভূমিদ্বয়ের মধ্যে একভূমি অরূপ* চৈতন্যের ও অপর ভূমি স্বরূপ চৈতন্যের বিহার স্থল।

যাবৎ মন অবিদ্যার অধিকারে থাকে, তাবৎ তিন ভূমি পর্য্যন্ত তাহার গতির সীমা এবং বিদ্যার অধিকারে উন্নীত হইলে এই সীমা পঞ্চম ভূমি পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয়, এই পর্য্যন্তই মায়ার অধিকার, পরে পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত চৈতন্যের অনুভূতি ও ষষ্ঠের পার হইলে প্রত্যক্ষ হয়। দেহ ভাণ্ডের মধ্যে কোনস্তরে মনের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা পূর্ব্বে তোমাকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহা পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

চ। এইখানে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে, সেদিন একজন পণ্ডিতের মুখে শুনিলাম যে শাস্ত্রে আছে মনের লয় অর্থাৎ অস্তিত্ব নষ্ট না হইলে মুক্তি হয় না, কিন্তু তুমি চৈতন্যভূমি পর্য্যন্ত মনের অস্থিত্ব বজায় রাখিতেছ!

র। অধিকাংশ পণ্ডিত কেবল শব্দ লইয়া নাড়া চাড়া করেন, হাতা যেমন রসের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও উহার আস্বাদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ সাধন হীন শাস্ত্র ব্যবসায়িগণ শাস্ত্রের ভাব বুঝিতে পারেন না, মনের অস্তিত্ব নষ্ট হইলে সম্ভোগ করিবে কে? সাধনশ্রম কিসের জন্য? ভোগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, উপভোগ, ভোগ ও সম্ভোগ, মন অজ্ঞানে উপভোগ, জ্ঞানে ভোগ ও চৈতন্যে সম্ভোগ করে, ইহার তত্ত্ব পরে বলিব, ফলে মনের লয় হয় না, মন উপাধির লয় হয় মাত্র, যৌবনে বালকত্ব লয় ও পৌঢ়ে যৌবনত্ব লয় হইলেও যেমন তুমি বজায় আছ, সেইরূপ জীব চৈতন্য অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইলে মন ও বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইলে বুদ্ধি উপাধি ধারণ করে, মন বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি চৈতন্যে লয় হয় অর্থাৎ চৈতন্যময় হইয়া আপন স্বরূপে অবস্থান করে, দিবাভাগে নক্ষত্রগণ সূর্য্যে লীন হইলেও যেমন তাহাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে, সেইরূপ শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ

---

* অ=অনন্ত×রূপ অর্থাৎ সাধকগণের আপন আপন ভাবানুযায়ি বাঞ্ছিত রূপ।

চৈতন্ত ভূমিতে উন্নীত হইলেও জীবাত্মার অস্তিত্ব বজায় থাকে, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় মন জীবাত্মার শক্তি মাত্র, অতএব মনের অস্তিত্ব বজায় কেন না থাকিবে ? যাহা হউক এক্ষণে তোমার মুল প্রশ্নের মীমাংসা করা যাউক।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অধিকারে অবস্থান কালে যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহারা প্রথমতঃ পিতৃযান অবলম্বন পূর্ব্বক ভূব লোকে গমন করে ও আতিবাহিক বা যাতনা দেহ ধারণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মানুরূপ স্তরে দুস্কৃতির ফল ভোগ করে, পরে স্বলোকে সুকৃতির ফল ভোগান্তে পুনরায় ভূলোকে আগমন করিতে বাধ্য হয়, ফল পক্ক হইলে যেমন ভূপতিত হয় ও তাহার বীজ হইতে পুনরায় অন্য ফলের উদ্ভব হয় সেইরূপ ভুব ও স্বলেকের কর্ম্মভোগ শেষ হইলে জীব পুনরায় ভূলোকে পতিত হইয়া কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ পূর্ব্বক পরবর্ত্তী কর্ম্মের ফল ভোগ করে।

চ। এইখানে তোমার কথার মধ্যে আবার একটু বাধা দিতে হইল, কর্ম্মভোগ যদি শেষ হইয়াগেল, তবে আবার কোন কর্ম্মের জন্য ভূলোকে জন্ম গ্রহণ করে ?

র। নদীর অগনিত তরঙ্গের মধ্যে একটি তরঙ্গ বিলীন হইলে যেমন আর একটি তাহার স্থান অধিকার করে, সেইরূপ জীবের হৃদয়াধারে কর্ম্ম সংস্কারের বহুস্তর আছে, একটি স্তরের কর্ম্ম ভোগ শেষ হইলে তাহার স্থান পরবর্ত্তী স্তরের দ্বারা পূর্ণহয় এবং এই কর্ম্ম সংস্কারই জীবকে জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ভূভূ র্বস্বয়ের ঘুর্ণিপাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, ফল নষ্ট হইলেও যেমন তাহার বীজের মধ্যে অগনিত বীজ সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে, আবার সেই সকল বীজ অপর বীজ সকলের জনক হয় সেইরূপ একটি স্তরের কর্ম্মফল জীর্ণ হইবামাত্র তন্মধ্যস্থ কর্ম্ম বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পুনরায় ফল প্রসব করে, সাধনের দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করাই এই সকল বীজ নষ্ট করিবার এক মাত্র উপায়, অতিরিক্ত তাপে যেমন বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির প্রখর তাপে কর্ম্ম সংস্কারের বীজ গুলি ঝলসিত হইলে আর তাহাদিগের জনন শক্তি থাকে না এবং এই জন্যই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" অর্থাৎ অগ্নির দ্বারা যেমন কাষ্ঠ ভস্ম হয় সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কর্ম্ম সংস্কারের বীজ গুলি দগ্ধ হইয়া যায়।

এক্ষণে তোমার মূল প্রশ্নের বিষয় শ্রবণ কর, অজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলে ভূ ভূর্ব স্বয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমাগত জন্ম মৃত্যুর জরা ব্যাধির তাড়না সহ্য করিতে হয়; সুকৃতি ও দুষ্কৃতি জনিত ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে নিস্পেষিত হওয়ায় জীব প্রকৃত শান্তি ও নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পায় না, কিন্তু সাধনবলে যাঁহার অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, যিনি দেবযান অবলম্বন পূর্ব্বক ভূ ভূর্ব স্বয়ের ঘূর্ণিপাক অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ভূমিস্থ ক্রমমুক্তির সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, নিত্য ও অবিছিন্ন চিদানন্দময় চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত হইয়া চিদঘন শ্রীভগবানকে লাভ করিবার আকুল আকাঙ্খায় যাঁহার হৃদয় পূর্ণ, কেবল সেই মহাত্মাই শ্রীভগবানের কৃপায় দ্রুত অগ্রসর হন ও জ্ঞানের স্তরদ্বয় অতিক্রম পূর্ব্বক মহামুক্তি লাভ করিয়া মায়াতীত শিবত্বে অধিষ্ঠিত হন নচেৎ কেবল জ্ঞানই যাঁহার লক্ষ্য, তিনি চতুর্থ বা পঞ্চম স্তরে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, মায়ার নির্ম্মলাংশের অন্তর্গত হওয়ায় যদিও এই স্তরদ্বয়ে দুঃখের হৃদয় শোষক তাপ নাই কিন্তু সুখের জোয়ার ভাটা আছে এবং দ্রুত ও শোচনীয় অধঃপতনের সম্ভাবনা না থাকিলেও কালগর্ভে পতন ভয় নিহিত থাকে, কেননা চরম লক্ষ্যে দৃষ্টি সংযুক্ত না থাকায় কালে জ্ঞানাভিমানের আকর্ষণে দৃষ্টি নিম্নাভিমুখীন হয় ও পুনরায় স্বয়ের স্তরে অবনীত হইয়া ঘূর্ণিপাকের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

এক্ষণে বোধ হয় স্তর সম্বন্ধে কতকটা বুঝিয়াছ, সাধন বলে দেহ ভাণ্ডের যে স্তর পর্য্যন্ত মনকে উন্নত করা যায়, দেহান্তে সাধক ব্রহ্মাণ্ডের সেই স্তরে উপনীত হইয়া তদুপযোগি দেহ ধারণ করেন, জীবের শরীর পঞ্চকোষময়; অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। মনোময় কোষটি মধ্যস্থলে অবস্থিত, মন নিম্নাভিমুখীন হইয়া অন্নময় ও প্রাণময় কোষে সংযুক্ত থাকিলে অজ্ঞান এবং উর্দ্ধমুখীন হইয়া বিজ্ঞানময় কোষে সংযুক্ত হইলে জ্ঞান ও আনন্দময় কোষে সংযুক্ত হইলে চৈতন্যময় হইয়া যায়।

কোন স্তরে মনের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা ১৩১৬ সালের ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্রাদ্ধ অজ্ঞানীদিগের জন্য, এবং সংসারে অধিকাংশ ব্যক্তিই অজ্ঞানের অন্তঃর্গত, কেননা লক্ষ্যের মধ্যে একজন প্রকৃত জ্ঞানী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, অজ্ঞানীরা আপন আপন দুষ্কৃতির পরিমানানুসারে অল্প বা অধিক কাল যাতনাময় আতিবাহিক দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ভুব লোকের নিম্ন বা উর্দ্ধস্তরে পরিভ্রমণ করে; অতএব এই দেহটি নাশ করিয়া তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করাই শ্রাদ্ধের মূল উদ্দেশ্য; মুখ্য শ্রাদ্ধে এই উদ্দেশ্য আশু ফলবতী হয় এবং গৌণ শ্রাদ্ধে সাময়িক তৃপ্তির দ্বারা সামান্য উন্নতি হয় মাত্র। এক্ষণে এই দেহটি কিরূপে প্রস্তুত হয় ও শ্রাদ্ধের দ্বারা কেন তাহার তৃপ্তি বা নাশ হয় তাহা শ্রবণ কর।

পিতৃযান গামিদিগের দেহত্যাগ হইলে তাহার অন্নময় কোষ পঞ্চভূতে ও প্রাণময় কোষ মহাপ্রাণে বিলীন হইয়া যায়, দেহী তখন মনোময় কোষে আবদ্ধ হইয়া সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, এই শরীরের নাম আতিবাহিক দেহ, কর্ম্মভেদে এই দেহের গঠন ভেদ ও গঠন ভেদে যাতনা ভেদ হয়; যাহার মনের মধ্যে সংসারাশক্তি প্রবল, কামাদি রিপু ও কুবৃত্তি জনিত লালসার মালিন্য অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, দেহান্তে তাহার মনোময় কোষস্থিত ঐ সকল মলিনতা উপাদান স্বরূপ হইয়া একটি যাতনাময় দেহ পিঞ্জর গঠনের কারণ হয়, দেহী তখন ঐ পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া প্রতিপলে নরক যন্ত্রনা উপভোগ করে; জীবদ্দশায় জ্ঞান লাভের চেষ্টা না করায় সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়াও তাহার সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণা করিবার শক্তি থাকে না, অথচ স্থূল জড়ীয় ভোগ বাসনার তীব্র আকর্ষণ বশতঃ ঐ সকল কাম্যবস্তু ইচ্ছা মাত্রে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও কর্ম্মেন্দ্রিয় না থাকায় ভোগ করিতে পারে না। দুর্জ্জয় পিপাশা! কিন্তু সম্মুখে শীতল জল বিদ্যমান থাকিতে পান করিতে পারে না, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির! অথচ ইচ্ছা মাত্রে নানাবিধ সুখাদ্য সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও ভোজন করিতে পারে না; কন্দর্প শরে জর্জ্জরিত! অথচ সম্মুখে পরমা সুন্দরী রমণীবৃন্দের আকুল আহ্বান সত্ত্বেও তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং অতৃপ্ত লালসার তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে থাকে; ফলে দেহী আপন দুষ্কৃতি ভেদে নানা প্রকার যাতনার আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অশান্ত প্রাণে ক্রমাগত ছুটাছুটি করে। ভূলোকের সাতটি স্তরে যেমন

মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর সুখ দুঃখের অনুভূতি বিভিন্ন প্রকার, সূক্ষ্ম দেহীগণ আপন আপন দুষ্কৃতি জনিত মালিন্যের পরিমানানুসারে সেইরূপ ভুব লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ ভোগ করে। গৌণ শ্রাদ্ধ চালিত তৃপ্তির দ্বারা এই দুঃখের অপেক্ষাকৃত শান্তি ও মুখ্য শ্রাদ্ধ চালিত চৈতন্য শক্তির দ্বারা দুঃখের আধার স্বরূপ দেহটি বিনষ্ট হওয়ায় দুঃখেরও নিবৃত্তি হয়।

চ। মুখ্য শ্রাদ্ধের দ্বারা ঐ দেহটি বিনষ্ট না হইলে কতদিন দুঃখ ভোগ করিতে হয়?

র। দমের পরিমানানুসারে যেমন ঘড়ি অল্প বা অধিক সময় চলে ও দম শেষ হইলে বন্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দুষ্কৃতির দম যাহার যত অধিক, দেহের স্থায়িত্ব জন্য দুঃখের বেগ তাহাকে তত অধিক কাল ভোগ করিতে হয়; সুবিধার মধ্যে এই যে কর্ম্মেন্দ্রিয় না থাকায় ঐ সময় নূতন কর্ম্মের সঞ্চার হয় না এজন্য সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগ শেষ হইলেই ঐ দেহটি বিনষ্ট হইয়া যায়।

এক্ষণে গৌণ বা সাধারণ শ্রাদ্ধের দ্বারা কিরূপে দেহীর তৃপ্তি লাভ হয় তাহা শ্রবণ কর শ্রাদ্ধ কর্ত্তার দ্বারা এই শ্রাদ্ধ, প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য পিতৃগণ বা সপ্তর্ষি মণ্ডলীর * উদ্দেশ্যে কৃত হয়; কেননা এই সপ্তর্ষিগণ সপ্তমস্তর বিশিষ্ট ভুব লোকের নিয়ামক বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। ডাক বাক্সে পত্র ফেলিলে যেমন পোষ্টমাষ্টার তাহা ঠিকানায় পৌঁছাইয়াদেন, সেইরূপ শ্রদ্ধা পুর্ব্বক ভোজনাদির দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া সেই তৃপ্তি প্রেতাত্মার উদ্দেশে চালনা করেন; ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তির সহিত সপ্তর্ষিগণের তুষ্টির সম্বন্ধ এই যে, ঋষিগণ জ্ঞান শক্তির ঘনীভূত প্রকাশ স্বরূপ, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানী এবং জ্ঞান অখণ্ড; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান শক্তির তৃপ্তিতে সপ্তর্ষিগণও তুষ্ট হন, এবং এই জন্যই এত লোক থাকিতে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার নিয়ম। জ্ঞানী ও সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তি ভিন্ন ভোজানাদির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, †

* সপ্তর্ষি মণ্ডলীকেই পিতৃগণ বলে, শ্রাদ্ধ ইঁহাদিগের উদ্দেশ্যে করিতে হয়, (হরিবংস)।

† শ্রাদ্ধ মন্ত্রে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে দেবতাগণকে আহ্বান করা হয় তাহা এই সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিবার জন্য।

কেননা যাহাদের লালসা অত্যন্ত প্রবল, তাহারা জড় বুদ্ধিতে ভোজন করে ফলে প্রকৃত তৃপ্তির আস্বাদ লাভে বঞ্চিত হয় আকণ্ঠ ভোজন করিয়াও মনে করে যে উদর গহ্বর আর একটু বড় হইলে ভাল হইত, সুতরাং গুরু ভোজনের জন্য আহারান্তে শারিরীক যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করে; তৃপ্তি তাহাদের নিকটেও আসিতে পারে না। অতএব সহস্র ব্যক্তির মধ্যে যদি এক জনও প্রকৃত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে পারা যায় তাহা হইলে প্রেতাত্মার তৃপ্তি লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না, কিন্তু প্রেতাত্মাকে তৃপ্ত করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এই ভোজন আন্তরিক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক করাইতে হয়, কারণ পত্র পাঠাইতে হইলে যেমন তাহাতে টিকিট যুক্ত করিতে হয়; সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা এই তৃপ্তি চালিত হয় কেননা সে দেশে বেয়ারিং তৃপ্তির চলন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই যে অধিকাংশ শ্রাদ্ধই ফাঁকা আওয়াজের ন্যায় নিস্ফল হয়; শ্রদ্ধা ও তৃপ্তির দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না, পুরোহিতের লক্ষ্য অর্থের দিকে ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তার লক্ষ্য বৃথা আড়ম্বরের দ্বারা যাহাতে লোকের কাছে মান বজায় থাকে; সুতরাং পুরোহিত ও যজমান উভয়েই অজ্ঞানরূপ আলেয়ার অনুসরণ করিয়া বিপথগামী হয়, অতএব এরূপ অবস্থায় যখন গৌণ বা সাধারণ শ্রাদ্ধই হইয়া উঠে না, তখন মুখ্য বা অসাধারণ শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করাই বিড়ম্বনা, কিন্তু সুকৃতির আকর্ষণে যখন তুমি জিজ্ঞাসু হইয়াছ তখন শ্রবণ কর।

হরিবংসের অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সপ্তম স্তর বিশিষ্ট ভূব লোকের নিয়ামক স্বরূপ যে সপ্তজন ঋষি আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে চারিজন শরীরী ও তিন জন অশরীরী, সাধারণ শ্রাদ্ধে শরীরী ঋষিগণের ও অসাধারণ শ্রাদ্ধে অশরীরী ঋষিগণের সাহায্য আবশ্যক হয়; ঋষ ধাতুর অর্থ গতি শক্তি বা জ্ঞান, তারযুক্ত টেলিগ্রামে যেমন তারের সাহায্যে শব্দের গতি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে, সেইরূপ স্থূলের সাহায্যে যে শ্রাদ্ধ হয়, শরীরী ঋষি শক্তি বা পরোক্ষ জ্ঞান শক্তি তজ্জনিত তৃপ্তির চালক বা গতি শক্তি স্বরূপ, এবং তারহীন অথবা মানসিক টেলিগ্রামের ন্যায় সূক্ষ্মের সাহায্যে যে চৈতন্যগর্ভ শব্দ বা ভাব শক্তির চালনা হয় অশরীরী ঋষি শক্তি বা অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার গতি শক্তি স্বরূপ, এই ঋষি শক্তি জ্ঞান উপহিত চৈতন্যের স্তর-ভেদে প্রকাশ ভেদ মাত্র, এবং

এই জন্যই সাধকগণের হৃদয়ে এই শক্তির প্রকাশ হইলে তাঁহারা ঋষিত্ব লাভ করেন, ও সাধনের দ্বারা এই শক্তির যত বৃদ্ধি হয়, ততই তাঁহারা জ্ঞান ভূমির উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিয়া ক্রমে চৈতন্য ভূমিতে উপনীত হন।

শ্রাদ্ধের মন্ত্র শব্দ হইতে, শব্দ কম্পন হইতে ও কম্পন বা ভাব শক্তি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং শক্তিই মন্ত্রের মূল, কেবল ছন্দ অনুসারে শুদ্ধ উচ্চারণ করিলে যখন ইহার শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, তখন মন্ত্রের স্বরূপ জানিয়া তাহাতে ভাব যুক্ত করিলে যে তাহা অমোঘ হইবে তদ্বিষয়ে কি সন্দেহ হইতে পারে?

বেদ, বাইবেল প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই শব্দকে ব্রহ্মশক্তির আধার বলিয়া স্বীকার করেন এবং আধুনিক জড় বিজ্ঞানেও শব্দ শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং শব্দ শক্তিগর্ভ এবং চৈতন্যের অধ্যাস ভিন্ন যখন শক্তির প্রকাশ হইতে পারেনা তখন শব্দ চৈতন্য শক্তিময়, আবার শৃঙ্খলা যুক্ত সমষ্টিতে এই শক্তির বেগবৃদ্ধি অর্থাৎ প্রকাশাধিক্য হয় ও তাহার সহিত ভাব যুক্ত হইলে পূর্ণ প্রকাশ হয়, অল্পসংখ্যক শৃঙ্খলাযুক্ত সৈন্য জাতিয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ করিলে যেমন বহুসংখ্যক বিশৃঙ্খল সৈন্যকে পরাজয় করিতে পারে সেইরূপ শৃঙ্খলাযুক্ত শব্দ সমষ্টির ভাবযুক্ত বিন্যাস মহান শক্তির জনক স্বরূপ এবং তাহারই নাম মন্ত্র, অতএব এই মন্ত্রের স্বরূপ ও ক্রিয়া অবগত হইয়া লক্ষ্যে প্রয়োগ করিলে সফলতা অবশ্যম্ভাবী জানিও।

শক্তির দ্বারাই শক্তির ক্রিয়া বা চালনা হয়, ধনু শক্তির সাহায্যে হস্তশক্তি যেমন বাণশক্তিকে লক্ষ্য স্থলে চালনা করে সেইরূপ শ্রদ্ধাশক্তির সাহায্যে ঋষি বা জ্ঞান শক্তি শব্দ ও ভাবময় চৈতন্য শক্তিকে লক্ষ্যস্থলে চালনা করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মনোময় কোষস্থ মলিনতার উপাদানে আতিবাহিক বা যাতনা দেহ গঠিত হয়, ধুম্র মলিন চিমনি মধ্যস্থ স্তিমিত আলোকের ন্যায় অপ্রকাশ ভাবে এই দেহের মধ্যে চৈতন্যাংশ বিদ্যমান থাকে, অতএব চিমনি মধ্যস্থ আলোক অধিক উদ্দীপিত হইলে যেমত ঐ চিমনিটি ফাটিয়া যায় সেইরূপ শ্রাদ্ধ কর্ত্তা জ্ঞান-শক্তির দ্বারা শ্রদ্ধার পথে চৈতন্য শক্তিকে চালনা করিয়া প্রেতাত্মার আতিবাহিক দেহস্থ চৈতন্যাংশের উদ্দীপনা করিয়া দেন ও তাহার ফলে দেহটি নষ্ট হওয়ায় দেহী ঐ ভগ্ন পিঞ্জর হইতে উদ্ধার পাইয়া উর্দ্ধলোকে গমন করে। জ্ঞানী সাধক

ভিন্ন এই মুখ্য বা অসাধারণ শ্রাদ্ধ অপরে করিতে পারেনা, এবং এই জন্যই শাস্ত্র বলেন যে বংসে একজন সুপুত্র জন্মিলে মোদন্তি পিতরো, নৃত্যন্তি দেবতা, সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি।

চ। সকল আত্মাই কি উর্দ্ধলোকে গমন করে?

র। যাহার স্বলোকের উপযোগী কর্ম্মফল সঞ্চিত থাকে, সে স্বলোকে গমন করে, নতুবা ভূলোকে ভূমিষ্ট হয়।

চ। শুনিয়াছি গয়ায় পিণ্ড দিলে প্রেতাত্মার উদ্ধার হয়, ইহা গৌণ বা মুখ্য কোন শ্রাদ্ধের অন্তঃর্গত?

র। ইহা মুখ্য শ্রাদ্ধের অন্তঃর্গত, অপরোক্ষ জ্ঞান শক্তির অভাবে যাহারা এই শ্রাদ্ধের প্রয়োগ তত্ত্ব জানেনা তাহারা স্থির বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রেতাত্মার যাতনা দেহ বিনাসের জন্য শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে, শ্রীভগবানকে আমমোক্তার নামা দেওয়ায় তাঁহার কৃপায় ঐ কার্য্য সাধিত হয়, তাঁহার শ্রীচরণ সংস্পর্শে পিণ্ড সকল চৈতন্যময় হইয়া প্রেতাত্মার যাতনা দেহ বিনষ্ট করিয়া দেয়, তবে স্থল বিশেষে গয়ায় পিণ্ড দান সত্ত্বেও যে প্রেতাত্মার উদ্ধার হয় না, পিণ্ডদাতার নির্ভরহীন সংযমই তাহার কারণ মাত্র জানিও।

চ। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেমন আপন কর্ম্মানুযায়ি ভূব লোকের বিভিন্ন স্তরে যাতনার নুন্যাধিক্য ভোগ করে, জ্ঞানীগণের কি সেরূপ ফলভেদ হয় না?

র। অবশ্যই হয়, জ্ঞানীগণ আপন জ্ঞানের পরিমানানুসারে জন ও মহ লোকের বিভিন্ন স্তরে সুখ শান্তিরনুন্যাধিক্য ভোগ করেন, আবার যাঁহাদের চৈতন্যানুভূতি হইয়াছে, তাঁহারা সেই অনুভূতির পরিমানানুসারে চৈতন্যভূমির বিভিন্ন স্তরে আনন্দের নুন্যাধিক্য সম্ভোগ করেন, তবে চৈতন্যভূমির প্রথম স্তরে উন্নীত হইলে বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা দ্রুতবেগে চরম লক্ষ্যে উপনীত হন।

ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

মাতৃ-স্মৃতি।

তিনি কোথায়?

(উচ্ছ্বাস।)

বহুদিন পরে প্রাণের মধ্যে, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা কথা জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিয়া হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঘাত করিতে লাগিল। মন চমকিত হইয়া ভাবিতে লাগিল "তিনি কোথায়?" ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইলাম; ভাবিলাম যাহা, তাহা বলিবার নহে, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। ভাবের উপর ভাব চলিয়া গেলে, লহরীর উপর লহরী অব্যবহিত রূপে হইতে থাকিলে তাহার সংখ্যা করা যেমন দুরূহ হইয়া উঠে, আমার পক্ষেও তদ্রূপ হইল। আমি মানস চক্ষে দেখিলাম, কিছু বুঝিলাম না। মহাভাবে বিভোর রহিলাম, কিন্তু সে ভাব ভাষার আকারে আনিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে কেবল স্মৃতি চিহ্ন থাকিয়া গেল "তিনি কোথায়?"

তিনি কোথায়! ইহার উত্তর আমি খুঁজিয়া পাই নাই। হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনি উঠিতেছে "তিনি কোথায়?" তিনি আর রমণীয় রমণীকলেবরে ইহ জগতে নাই, মানব দেহে তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাই না, দেখিবার বুঝি সম্ভাবনাও নাই। সমস্ত মন ব্যাপিয়া, সমস্ত প্রাণ জুড়িয়া, সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তিখানির কি এক আব্ছায়া ভাব অঙ্কিত রহিয়াছে, ইহাই কেবল দেখিতেছি। আর কিছু দেখিতে বা দেখাইতে পারি না। এতদ্ব্যতীত "তিনি কোথায়?" কথার উত্তর দিতে আমি সমর্থ নহি।

তিনি কে! "তিনি কে?" আর কি বলিব? তিনি হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী; তিনি সুধার অনন্ত ভাণ্ডার, তিনি প্রেমের জীবন্ত উৎস। আর

শুনিতে চাও তিনি কে? তিনি উৎফুল্ল-বিমল-শ্বেত-শতদলের ন্যায় করুণার প্রীতি-ময়ী পবিত্র ছবি। আর কি বলিব, তিনি কে? দেহের প্রতি শোণিত কণা যাঁহার নিকট ঋণী হইয়া রহিয়াছি, জীবনের প্রতি রেণু, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাঁহার নিকট একান্ত বাধ্য, যাঁহার স্নেহ ভালবাসার তুলনা এ বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর সহিত হয় না, তিনি কে? একথার উত্তর সংক্ষেপে সরলভাবে কি দিব বল!!

যিনি, এক কথায়, এই "তিনি" র উত্তর দিয়াছেন, তিনি আমার নমস্য। কি মধুর কথা তাহা! তাহা কি? একটী স্বর ও একটী ব্যঞ্জন বর্ণে, তাহা গঠিত। ননীর পুতুল অপেক্ষা যেন উহা সুন্দর ও কোমল, শীতল চন্দ্র অপেক্ষাও যেন উহা স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ সরোবরের সুশোভিত রক্তপদ্মের সুষমা অপেক্ষা যেন তাহার সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোরম। উহা কি? উহা আর কিছুই নহে, কেবল "মা"! বল দেখি, ভাই, কি মধুর কথা 'মা'!! শব্দ ভাণ্ডারের কি সুন্দর শব্দ "মা"!!!

সেই "মা" আমার কোথায়? "তিনি কোথায়"? চক্ষু থাকিতে মানুষ চক্ষুর মর্ম্ম বুঝে না, কোহিনুর হস্তে পাইয়াও তাহা চিনে না, কি দুঃখ! বানরের গলদেশে স্বর্ণ-হার দিলে, তাহা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, অথবা যজ্ঞের চরু অপকৃষ্ট জীবের হস্তে পড়িলে তাহার ঘোর দূরবস্থা হয়; ভাই মা যখন স্ব শরীরে ইহ জগতে ছিলেন, তখন আমার ন্যায় অধম সন্তানের নিকট তাঁহার যথোচিত আদর হইতে পারে নাই; তখন আমি তাহার স্নেহের মধুরতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই, চক্ষু থাকিতে চক্ষুর মর্ম্ম বুঝি নাই, কোহিনুর হস্তে পাইয়াও যত্ন সহকারে তাহা রক্ষা করি নাই। এক্ষণে মাতৃ স্নেহের যথার্থ স্বর্গীয় ভাব স্মরণ করিলে কি হইবে? এক্ষণে সুধার ভাণ্ডার শুকাইয়া গিয়াছে, কালের কুটিল আবর্ত্তে ভালবাসার সজীব তরু উৎপাটিত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! আজ স্নেহের কাঙ্গাল হইলে চলিবে কেন?

কিন্তু কি বলিতেছিলাম—তিনি কোথায়? চক্ষে একবিন্দু জল দেখিলে, যিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। কথায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইলে যিনি "বাবা" "বাবা" বলিয়া আমার হৃদয় স্নেহে আপ্লুত করিয়া তুলিতেন, মনের মধ্যে মালিন্যের

ক্ষীণ ছায়া নয়ন প্রান্তে প্রতিফলিত হইতে দেখিলে, যিনি আশু কারণ জ্ঞাত হইয়া, তাহার নিরাকরণে সচেষ্ট থাকিতেন, আজ বহুদিন পরে জিজ্ঞাসা করিতেছি "তিনি কোথায়" ?

জিনিসের অভাব না ঘটিলে তাহার মর্য্যাদা ও আদর বুঝা যায় না। কবি তাই বলিয়াছেন, "বিরহে ভালবাসার মিষ্টতা যেরূপ উপলব্ধি হয়, অবিচ্ছিন্ন মিলনে তাহা কদাপি নহে।" কবির কথা অভ্রান্ত সত্য।

যিনি প্রকৃত মাতৃভক্ত, তিনি—"তিনি কোথায়" এ কথার উত্তরে প্রাণের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিবেন "মা আমার স্বর্গেও নহেন, মা আমার অন্য দেহে অধিষ্ঠিতাও নহেন—মা আমার মনোমন্দিরে, আমার মনোমন্দিরের নিভৃত কক্ষে বিরাজিত। দেখিতে চাও যদি, জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন কর; দেখিতে পাইবে সেই জীবন্ত প্রেমোজ্জ্বল মূর্ত্তি।

আর আমার সম্বন্ধে! আমি যে মাতৃদ্রোহী সন্তান; "মা কোথায়" "তিনি কোথায়" একথার উত্তর দিতে আমি বাস্তবিক সমর্থ নহি!

শ্রীরসিকলাল দে।

কৃষ্ণদাস।

—:০:—

কল্পনাপ্রিয় ভারতে ইতিহাস, জীবনচরিত অতি দুর্ল্লভ বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্য সমুদ্র মন্থন করিলে, একখানিও প্রকৃত ইতিহাস অথবা বিশুদ্ধ জীবন চরিত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সর্ব্বত্রই অত্যুক্তি কল্পনা ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, প্রাচীন কালে ইতিহাস ও জীবন চরিত লেখার প্রথাও প্রচলিত ছিল না। সুতরাং ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিক, ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্তান্ত যে অতীতের উদার কন্দরে নিহিত থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বৈষ্ণব সাহিত্যেরও প্রায় এই দশা; তবে

অপেক্ষাকৃত অভিনব সময়ের বলিয়াই হউক অথবা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্ব্বত্র চিরাগত প্রথার অনুসরণ না করার জন্যই হউক তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সাহিত্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিকতত্ত্ব অক্ষুণ্ণ পাওয়া যায়। নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা পূজ্যপাদ ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের একটী ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ জীবনী পাঠক বর্গকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া উপবিভাগের সামিল ঝামট্‌পুর নামে একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রামখানি অজয় নদীর উত্তর এবং ভাগিরথীর তীর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিতি। এইগ্রামে কৃষ্ণদাস বৈদ্যজাতীয় কোন ভদ্র গৃহস্থের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, যে ১৫৩৭ শকের জৈষ্ঠমাসে (১৬১৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে) চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা শেষ হইয়াছিল ; * এবং সেই সময়ে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ ও জরা গ্রস্থ হইয়াছিলেন।

আমি জরা গ্রস্থ জানি নিকট মরণ।
অন্তের কোন কোন লীলা করিয়াছি বর্ণন॥ চৈঃ চরিতামৃত। (১)

এদিকে ১৪৫৫ শকে চৈতন্যদেব লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, শকাব্দার চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগের প্রথমাংশে অর্থাৎ চৈতন্যান্তর্দ্ধানের অল্পকাল পরেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বর্ত্তমান ঝামট্‌পুরে তদীয় বংশের কোন শাখা সম্পর্ক দেখা যায় না। কেবল একটী বৈষ্ণবাশ্রয় আছে ; তাহাকে আশ্রয় বাসীগণ ৺কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

---

* শাকে সিন্ধাগ্নি বাণেন্দৌ জৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে সূর্য্যাহেহসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাংগতঃ॥

(১) বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগ গ্রস্থ চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি॥

প্রথম বয়সে কৃষ্ণদাস জাতীয় ব্যবসায় শিক্ষার জন্য সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং দেশের তৎকালের প্রথা অনুসারে মৌলবীর মক্তব খানায় কিছু পারসী ভাষাও শিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থপাঠে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ও ভুরিভুরিশাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে একজন ধীশক্তি সম্পন্ন ও অলোকিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শৈশব সময় হইতেই তিনি অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; এবং শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন। যে সময়ে সাধারণ লোকে যৌবন সুলভ উচ্ছৃঙ্খলতায় উন্মত্ত হইয়া অশেষ প্রকারে জীবন কলঙ্কিত করিতে থাকে, তিনি সে কালেও সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন ও সর্ব্বদা সাধু সঙ্গে কাল যাপন করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই শ্রীচৈতন্যের মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম পথে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের এক ভ্রাতা ছিলেন তিনিই গৃহস্থের সমস্তকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। কৃষ্ণদাস কেবল সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহাদের বাটীতে বিগ্রহ সেবা ছিল এবং গুণার্ণব মিশ্র নামে ঐ বিগ্রহের একজন পূজারি ছিলেন। (২) কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা ও গুণার্ণব মিশ্র শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার স্বীকার করিয়াও নিত্যানন্দকে তদ্রূপে অঙ্গীকার করিতেন না। এইজন্য সময়ে সময়ে তৎসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিত।

(৩) একদিন উৎসব উপলক্ষে মীনকেতন রামদাস নামে নিত্যানন্দের একজন সঙ্গী ও শিষ্য তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে

---

(২) গুণার্ণব মিশ্র নামে বিপ্র এক আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহোকরে সেবা কার্য্য॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহাদেখি ক্রুদ্ধ হইয়া বলে রামদাস॥ ইত্যাদি

(৩) আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইল তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মীন কেতন রামদাস তার নাম।

গুণার্ণব মিশ্রের সহিত রামদাসের নিত্যানন্দের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বহু তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। (৪) এবং কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতা ও গুণার্ণবের পক্ষ হইয়া রামদাসের

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম ॥
মহা প্রেমময় আসি রহিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহাকে চাপড়ে ॥
যে নয়নে দেখিতে অশ্রু মন হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প ॥
নিত্যানন্দ বলে সবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥ ইত্যাদি

(৪) মোর ভ্রাতার সহিত কিছু হইল বিবাদ।
উৎসবান্তে চলিলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ ॥
চৈতন্য গোসাঞিতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস আভাস ॥
ইহা জানি রাম দাসের দুঃখ হৈল মনে!
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥
দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দে না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥
একেত বিশ্বাস তুমি না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় তোমার ব্যবহার ॥
কিম্বা দোঁহা না মানি হয়ত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড ॥
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ইত্যাদি

সহিত বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। মীনকেতন রামদাস ও উভয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আপন হস্তস্থিত বংশী ভাঙ্গিয়া ও অভিশাপ দিয়া প্রস্থান করিলেন। ভ্রাতার ঈদৃশ ঔদ্ধত্যাচরণে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিলেন এবং নিত্যানন্দের অলৌকিক গুণ রাশি বর্ণনা করিয়া তদীয় ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। কথিত—আছে যে সাধু ভক্তের ক্রোধোদ্রেক হেতু তাঁহার ভ্রাতার তৎকালেই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। (৫) এবং সেই রাত্রে নিত্যানন্দ স্বপ্নযোগে

(৫) এতই কহিল তার সেবক প্রভাব।
আর এক শুন তাঁর দয়ার স্বভাব॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুই লৈয়া এইগুণ।
সেই মাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন॥
নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাহা স্বপ্নে দেখা দিলেন নিত্যানন্দ রাম॥
দণ্ডবৎ হইয়া আমি পড়িনু পদেতে।
নিজ পাদপদ্ম দিলেন আমার মাথাতে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥
শ্যামল চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর॥
সুবলিত হস্ত পদ কমল নয়ন।
পট্ট বস্ত্র শিরে পট্ট বস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদা বালা।
পায়েতে নূপুর রাজ গলে পুষ্প মালা॥
চন্দনে লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্ত গজ অতি যিনি মন্থর পয়ান॥
কোটি চন্দ্র সম দেখি উজ্জ্বল বদন॥

কৃষ্ণদাসকে দেখা দিয়া বৃন্দাবনে যাইবার আদেশ দিয়া ছিলন। বিশ্বাসী কৃষ্ণদাস পরদিন প্রত্যুষেই জন্মের মত গৃহ সংসার পরিত্যাগ করতঃ স্বপ্নাদেশ ক্রমে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। তৎকালে রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ গোস্বামী জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন, এবং রঘুনাথ দাসের নিকট দীক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট জীবনপ্রেমভক্তি শিক্ষা শাস্ত্রালোচনা মহাপ্রভুর চরিত্রানুশীলন ও সাধন ভজনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। (৬) রঘুনাথ গোস্বামী পূর্ব্বে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অবস্থিতি করিতেন এবং স্বরূপ দামোদরের সহিত একযোগে মহাপ্রভুর মহাভাবের অবস্থায় শরীর রক্ষা ও গুপ্ত সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন।(৭) স্বরূপ মহাপ্রভুর গুপ্ত ভাব সমস্ত অবগত ছিলেন তিনি তৎসমস্ত রঘুনাথের নিকট প্রকাশ করিয়া ছিলেন। কৃষ্ণদাস নিজ অভীষ্ট দেব রঘুনাথের নিকট সে সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে উত্তর কালে চৈতন্য চরিতামৃত রচনা বিষয়ে সেই সব বৃত্তান্তই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল ॥

দাড়িম বীজ সম দন্ত তাম্বুল চর্ব্বণ ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল্ বলে॥ ইত্যাদি

(৬) হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমারই উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিক্ষ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইহো তত জানে॥ ইত্যাদি

(৭) পুনঃ সমর্পিল তারে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥
পরিষদগণ সবে দেখি গোপ বেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সবে প্রেমেতে আবেশ ॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহো কেহো নাচে গায়।
সেবকে যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায় ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব ॥

আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে বলিলেন বাণি॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না কর তুমি ভয়।
বৃন্দাবন যাই তাহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লইয়া॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল দেখোঁ হৈয়াছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হইল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেই ক্ষণে বৃন্দাবন করিনু গমন।
প্রভুর কৃপা পায়া সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে আইনু বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হইতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হইতে রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হইতে পাইনু মুঞি শ্রীরূপ আশ্রয়॥
সনাতন কৃত পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃত পাইনু ভক্তির রস প্রান্ত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীরাধা গোবিন্দ॥
জগাই মাধাই হইতে মুঞিত পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নামশুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥

এমন নির্ঘৃণ্য কেবা মোরে কৃপা করে
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত ভিতরে॥

উত্তম অধম কিছু না করে বিচার। যে আগে পড়য়ে তারে করেন উদ্ধার॥
অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার। প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার॥

মো পাপিষ্ঠে যে আনিল বৃন্দাবন। মোহেন অধমে দিল শ্রীরূপ চরণ॥
শ্রীমদন গোপাল গোবিন্দ দরশন। কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন॥

বৃন্দাবন পুরন্দর মদন গোপাল। রাস বিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র কুমার
শ্রীরাধা ললিতাদি সঙ্গে রাস বিলাস। মন্মথরূপ যাঁহার প্রকাশ॥

দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন। স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ॥
নিত্যানন্দ কৃপা মোরে তাঁরে দেখাইল। শ্রীরাধা মদন মোহনে প্রভু করি দিল॥

মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন। কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন॥
বৃন্দাবনে যোগ পীঠে কল্পতরু বনে। রত্ন মণ্ডপ তাহে রত্ন সিংহাসনে॥

শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন বজেন্দ্র নন্দন। মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগত মোহন॥
বাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে। রাসাদি লীলা করেন প্রভু নানা রঙ্গে॥

যাঁহার ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন॥
চতুর্দ্দশ ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান। বৈকুণ্ঠাদি পুরে যাঁর করে লীলাগান॥

যাঁহার মাধুরী করে লক্ষ্মী আকর্ষণ। শ্রীরূপ গোসাঞি করিয়াছেন সেরূপ বর্ণন।
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন। যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান।

সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার। ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর॥
এ হেন গোবিন্দ পদ পাইনু যাঁহা হৈতে। তাঁহার চরণ কৃপা কি পারি বর্ণিতে॥

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল। শ্রীকৃষ্ণ নাম পরায়ণ পরম মঙ্গল॥
যাঁর প্রাণ ধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য। রাধা কৃষ্ণ ভক্তি বিনে নাহি জানি অন্য॥

সে বৈষ্ণবের পদরেণু তাঁর পদ ছায়া। মোহেন অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া।
তাহা সব লভ্য হয় প্রভুর বচন। সেই সূত্র এই তার করিল বিবরণ॥

এ সব পাইব আমি বৃন্দাবন আয়। এই সব লভ্য হয় প্রভুর অভিপ্রায়॥
আপনায় কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া। নিত্যানন্দ গুণে মোর উন্মত্ত করিয়া॥

চৈতন্যচরিতামৃত ব্যতীত কৃষ্ণদাস আরও কয়েকখানি ভক্তি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন সেবা বিষয়ক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গোবিন্দ লীলামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবব্যাখা বিষয়ক ভাগবত শাস্ত্র গূঢ়ার্থ রহস্য নামক গ্রন্থই প্রধান। এই উভয় গ্রন্থই চরিতামৃতের অনেক পূর্ব্বে রচিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃত রচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্যের মধ্যে কেবল শ্রীজীব গোস্বামী ও শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর গ্রন্থ সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত জীবত ছিলেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল।

বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রতিদিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন বিরচিত চৈতন্য মঙ্গল নামক গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শেষ-লীলা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত না থাকায় তাঁহাদের আশা পরিতৃপ্ত হইত না। সেজন্য গোবিন্দ মন্দিরের সেবাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস পণ্ডিত প্রমুখ বৈষ্ণব-গণ কৃষ্ণদাসকে তদ্বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণদাস যদিও জরাগ্রস্থ কিন্তু বৈষ্ণবাজ্ঞাবলে নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই গুরুতর কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন। এবং সেই দিনেই মদন মোহনের মন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহের নিকট আজ্ঞাপ্রার্থনা করিলেন। কথিত আছে যে ঐ সময়ে দেবতার কণ্ঠদেশ হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়াছিল তাহাতে মদনমোহনের আজ্ঞানুমতি হইয়াছে বুঝিয়া সকলে আনন্দে হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং (৮) গ্রন্থকার সেই খানেই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক

নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ মহিমা অপার। সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় যার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস॥

চৈতন্য চরিতামৃত

আদি ৫ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীগ্রন্থের উৎপত্তি কারণ। (৮)

বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল। তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার। বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥

বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন। সূত্র ধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে বড়ই হৈল আবেশ। চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ। বৃন্দাবন বাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন। মহা যোগ পীঠ তাঁহা রত্ন সিংহাসন ॥
তাতে বসি আছেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥
রাজ সেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার। দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ। সহস্র বদনে সেবা না হয় বর্ণন ॥
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস। যাঁর যশোগুণ সব জগতে প্রকাশ ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর। মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতিধীর ॥
সবার সম্মান কর্ত্তা সবের করে হিত। কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে যাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ। সেই সব ইহার শরীরে প্রকাশ ॥
পণ্ডিত গোসাঞি শিষ্য অনন্ত আচার্য্য। কৃষ্ণ প্রেম ময় তনু উদার সর্ব্ব আর্য্য ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কেকরে প্রকাশ। তাঁর প্রিয় এই পণ্ডিত হরিদাস ॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস। চৈতন্য চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥
বৈষ্ণবের গুণ গ্রাহী নাহি দেখেন দোষ। কায় মনো বাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥
নিরন্তর তিঁহ শুণে চৈতন্য মঙ্গল। তাঁহার প্রসাদে শুনে বৈষ্ণব সকল ॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যৈছে পূর্ণচন্দ্র। নিজ গুণামৃতে বাড়ান বৈষ্ণব আনন্দ।
তিঁহো অতি কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে। গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে।

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সমনাঞি ॥

শ্রীযাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী। চৈতন্য চরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌর কথা বিনে তাঁর মুখে অন্য কথা নাই ॥

তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস। মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥

আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
অহর্নিশি ভাবে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ ॥

রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সদাকরে পান। মদন মোহন বিনা নাহি জানে আন॥
আর যত বৃন্দাবন বাসি ভক্তগণ। শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া। তাসবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে। মদন গোপালে গেল আজ্ঞা মাগি করে॥
দরশন করি কৈল চরণ বন্দন। গোসাঞিদাস পূজারি করেন চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল। প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ হরি ধ্বনি কৈল।
গোসাঞিদাস আনি মোরে আজ্ঞা মালা দিল॥

আজ্ঞা মালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাঁহাই করিনু তবে গ্রন্থের আরম্ভ॥

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন।
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন॥

সেই লিখি মদন গোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুতলি যৈছে কুহকে নাচায়॥

কুলাধি দেবতা মোর মদন মোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণব আজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এইবল।
যাঁর স্মৃতিতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

রচনা করিলেন এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হইতে কতদিন লাগিয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে গ্রন্থখানির আয়তন ও বিবিধ শাস্ত্রোধৃত শ্লোকাবলী দৃষ্টে অনুমান হয় যে দীর্ঘ সময় ব্যতীত ইহা সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিলনা।

রাধাকুণ্ডতীরে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইলে ইহা প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণদাস অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তৎকালের নিয়মানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে [illegible] প্রধান প্রধান মান্য ব্যক্তির অনুমতি লইতে হইত। তাঁহারা পাঠ [illegible] প্রকাশ যোগ্য বিবেচনা করিতেন তবে গ্রন্থশেষে নিজ নিজ নাম [illegible] করিয়া দিতেন। তখন সে গ্রন্থ সাধারণে লিখিয়া লইতে পারিত। তৎকালে জীব গোস্বামীই বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব সমাজের অভিনেতা ছিলেন; [illegible] করিবাজ গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া জীবগোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে ও প্রকাশের অনুমতি দিতে অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী ইহার অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা অবলীলাক্রমে সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবে; অথচ রূপ সনাতন ও তাঁহার স্বচরিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অপ্রচারিত থাকিবে; কেহ আর সে সকলের আদর করিবেনা। এই আশঙ্কা করিয়া জীবগোস্বামী কোপাবিষ্ট হইয়া যমুনার জল স্রোতে ঐগ্রন্থ নিক্ষেপ করিলেন। বর্ণিত আছে যে, গ্রন্থ ভাসিতে ভাসিতে মদন মোহোনের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল, তখন জীব গোস্বামী তাহা তুলিয়া গোস্বামীদিগের অপরাপর গ্রন্থের সামীল একটী কুটরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তৎপরে যখন কুটরী খুলিয়া কোন গ্রন্থ বাহির করেন তখন তিনি দেখেন য চরিতামৃতখানি সকলের উপরিভাগে বসিয়াছেন। সেই জন্য কেহ কেহ বলেন যে সাধারণে গ্রন্থের আশ্চর্য্য মহিমা প্রতিপন্ন করিবার জন্য জীব গোস্বামী এই কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক বৃদ্ধ বয়সের এই বহু যত্নের ধন গ্রন্থের এই দশা দেখিয়া কৃষ্ণদাস মর্ম্মাহত হইয়া শোকাকুল চিত্তে মথুরায় গমন করিলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা এই খেদ করিতে লাগিলেন যে সাধারণে পড়িবে বলিয়া তিনি বহু যত্নে যে গ্রন্থ

রচনা করিলেন তাহা প্রকাশিত হইল না ও শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলা ও অপ্রচারিত রহিয়া গেল।

এই সময়ে মুকুন্দদত্ত নামে কবিরাজের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জানাইলেন যে, যখন চৈতন্য চরিতামৃত রচিত হইতেছিল তাহার এক এক পরিচ্ছেদ পরি সমাপ্ত হইলেই তিনি (মুকুন্দ) উহাচাহিয়া লইলা এক এক গ্রন্থ নকল করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। ইহা শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আনন্দের আর সীমা থাকিল না। তিনি ঐ প্রতিলিপি খানি অদ্যোপান্ত পাঠ কারিয়া সংশোধনান্তে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ইত্যবসরে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর বঙ্গদেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং কৃষ্ণদাসের বাচনিক গ্রন্থ বিবরণ আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া জীব গোস্বামীকে তাহা জানাইলেন এবং ঐ গ্রন্থের টীকা করিয়া তাহা প্রচার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী অগত্যা কবিকর্ণপুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া কুটরী হহতে গ্রন্থ বাহির করিয়া তাহাতে অনুমোদন সাক্ষর করিলেন। এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে চৈতন্য চরিতামৃত পর্য্যন্ত লিখিত ছিল তিনি (জীব) "কহে কৃষ্ণদাস ভনিতা বসাইয়া দিলেন।

তখন বৃন্দাবনবাসী সকলে ঐ গ্রন্থ লিখিয়া লইলেন; এবং ব্রজ ধামে উহা প্রচারিত হইয়া গেল। কিন্তু জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব মুকুন্দ দ্বারা পুর্ব্বলিখিত নকলটী নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি ক্রমে ক্রমে এদেশের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণদাসের স্বহস্তে লিখিত মূল গ্রন্থ অদ্যাবধি বৃন্দাবনে রাধা দামোদরের মন্দিরে দেবতার ন্যায় পুজিত হইয়া আসিতেছে; তাহা এদেশে কখন আইসে নাই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী, মহাপ্রভুর জীবনলীলা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন চৈতন্যের গ্রাহস্থ্যাশ্রমে অবস্থিতি কালে ২৪ বৎসর আদিলীলা; সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে দেশপর্য্যটন ৬ বৎরের ঘটনা মধ্য লীলা ও শেষ অষ্টাদশ বর্ষ লীলাচলে অবস্থিতি অন্তলীলা নামে অভিহিত হইয়াছে। আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে পুর্ণ তন্মধ্যে প্রথম দ্বাদশ

পরিচ্ছেদে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিবিধ তত্ত্ব ও চৈতন্য অবতারের আধ্যাত্মিক কারণ এবং চৈতন্য ভক্তগণের শ্রেণীবিভাগ ও নামোল্লেখ বর্ণিত আছে। এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদকে গ্রন্থের মুখবন্ধ বলা যাইতে পারে; অবশিষ্ট পাঁচ পরিচ্ছেদে চৈতন্যের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্তের স্থূল স্থূল ঘটনা সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যলীলায় চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে দেশ পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন পর্য্যন্তের ঘটনা বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই লীলা বিস্তার ও বৃহৎ এবং নানা ঘটনাপূর্ণ। ইহাতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ আছে। অন্তলীলায় চৈতন্যজীবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষের ঘটনা কথিত হয়াছে। ইহা বিংশতি পরিচ্ছেদে পূর্ণ।

হিন্দুর নিকট যেরূপ বেদ, মুসলমানের নিকট যেরূপ কোরান, এবং খ্রীষ্টীয়ানের যেরূপ বাইবেল, বৈষ্ণবের নিকট চৈতন্য চরিতামৃত সেইরূপ সম্মান ও ভক্তির বস্তু। যদিও ইহা চৈতন্য মঙ্গলের পর বিরচিত হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক রূপে চৈতন্যের ধর্ম্মমত সমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও ঘটনার বৈচিত্রতা প্রদর্শন ও রচনার ওজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে ইহা বৈষ্ণবীয় সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিকও বৈষ্ণব সমাজে ইহা তদ্রূপেই সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারের একটী অমূল্য রত্ন ও প্রেমভক্তির অমৃত প্রস্রবণ। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল গ্রন্থকার পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা তাঁহাদের মধ্যে কোন অংশেই ন্যূন নহেন; কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনি দুর্দ্দশা যে তাঁহারা আপনাদের জ্ঞান ভণ্ডারে কি কি অমূল্য রত্ন আছে তদনুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, ইহাই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

সম্পূর্ণ।

ভুল।

—:০:—

সংসারের চারি ধারে দেখিতেছি কেবল ভুল। মানুষ এই ভুলের চিরন্তন ক্রীড়ণক। সুবুদ্ধি-বিবেক-বান মানব এই ভুল সাগরে অনবরত হাবুডুবু খাইতেছে। কবি বলিয়াছেন—"To Err is human, to forgive is divine" মনুষ্য ভ্রান্ত, দেবতা ক্ষমাশীল; ভুল মনুষ্যের,—ক্ষমা দেবতার সামগ্রী ভুলের হস্ত যিনি এড়াইতে পারেন, তিনিই মানব শরীরে দেবতা। সেই ভুলনির্মুক্ত জীব, সংসার-নরকস্থ প্রত্যেক মানবের অনুকরণীয়।

মানুষ ভুলের বশে কিনা করিতে পারে? শৈশব হইতে মানব এই ভুলের দাস। যে শিশুর জ্ঞান স্ফূরিত হয়নাই, বুদ্ধির বিকাশ হয় নাই, সংসার কি, কি জন্য সংসারে আসিয়াছে, যে শিশু তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, "কর্ত্তব্য" নামে যে একটা দায়িত্ব পূর্ণ গুরুতর পদার্থ আছে, যে শিশু তাহার বিষয় স্বপ্নেও একবার ভাবে না, তাহার ভুল যে প্রতি পদে হইবে, তাহা অসম্ভব নহে।

বালক বালিকার কার্য্য ধূলি খেলা; ভবিষ্যৎ সমাজের উপাদান যে তাহারা, ইহা যাহারা ভাবিতে পারে না, গৃহই যাহাদের চক্ষে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড তাহাদের ভুল পদে পদে হইতে পারে এবং অজ্ঞানতা জন্য সে ভুল মার্জ্জনীয়, কিন্তু সংসারের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও মনুষ্য জন্ম মহাপুণ্যফলের জন্ম বুঝিয়াও, কেন বুদ্ধিমান বিবেকশীল বয়স্থ ও প্রাচীন মানব ভীষণ ভুল জালে জড়িত হইতেছে?

ভুলের বশেই মানুষ আপন পদে কুঠারাঘাত করিতেছে। এই ভুলেই ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ, পিতা পুত্রে অমিল,এই ভুলেই গৃহের শান্তিভঙ্গ, এই ভুলেই সামান্য একটী কথায় প্রাণ প্রতিম বন্ধুর অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব-শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে। সকল অসৎ কর্ম্মের মুল এই ভুল। এমন গর্হিত কার্য্য নাই যাহা মানুষের ভুল বশে না হইতে পারে।

এই ভুলেই মানুষ পরকালের ভাবনা না ভাবিয়া আত্মহত্যা করিয়া ইহকালের যন্ত্রণা এড়াইতে যায়। এই ভুলেই রূপোন্মত্ত যুবক রমণীর ফাঁদে পড়িয়া চির জীবনের শান্তি সুখ উৎসর্গ করিয়া ফেলে। এই ভুলের বশেই প্রবৃত্তির চিরানুগত যুবক তুচ্ছ অসার ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হওয়ার পরিণামে হাহাকার করিতেছে, এবং পাপের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিভীষিকাময় নরকের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়া সীমাহীন সাগরোচ্ছ্বাসে আন্দোলিত ক্ষুদ্র তৃণ খণ্ডের ন্যায় ঘৃণার সন্তাড়ণে প্রপীড়িত হইয়া, কবি-প্রবর মিলটনের শয়তানের ন্যায় তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরেও অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিতেছে—

"Me miserable—which way shall I fly,
Infinite wrath and infinite despair,
Which way I fly is hell-myself am hell."

Paradise Lost.

এই ভুলেই জীবনের শেষ দশায় উপনীত মানবেরও মারীচিকায় বারি ভ্রম হইতেছে। এই ভুলেই মানুষ মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়াও 'আমার পুত্র' আমার স্ত্রী' 'আমার ধনৈশ্বর্য্য' বলিতে বলিতে দেবতার বাঞ্ছনীয় দুর্লভ মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে না পারিয়া পশু পক্ষীর ন্যায় ঘৃণিত ভাবে অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। যিনি জীবনের একমাত্র সাররত্ন তাঁহাকে ভুলিয়া প্রকৃত 'জীবনের'—প্রকৃত চিৎশক্তির পূজা না করিয়া অসার জড়দেহের পূজায় মানব যে উল্লাস ও অহঙ্কারের সহিত আত্মদানে প্রবৃত্ত হইতেছেন—এ অবিমৃষ্যকারিতার জনক এই ভুল।

—"জীবনের পর পারে সুকৃতী মানবের আহ্বানের জন্য দেবদূত অপেক্ষা করিতেছে", মানব ভুলের বিষম ছলনায় এই সত্যভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, পুণ্য কর্ম্মের আয়োজনে বিরত থাকিয়া ইহলোকের ক্ষুদ্র কার্য্যেই মন প্রাণ উৎসর্গ করতঃ স্ফীতবক্ষে ঘোর দাম্ভিকতা সহকারে সংসারের পথে পাদবিক্ষেপ করিতেছে। হায়, ভুলের এই বিঘোর মায়ায় সংসারে কত লোমহর্ষণ ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং নিত্য নিত্য কত অচিন্ত্য বিস্ময়জনক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে কে তাহার সংখ্যা করিবে? তাই বলি ভুলে, ভুলে, এই সংসার পরিপূর্ণ, ভুলের প্রভাব অনন্ত, অপরিসীম এবং অনির্ব্বচনীয়॥

—ভুলের কথা আর কি বলিব? এই ভুলেই না দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত লঙ্কেশ্বর রাবণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, এই ভুলেই দুর্য্যোধনের বিরাট সভায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ হয়। মহারাজ রাবণ, রাজা দুর্য্যোধন, ক্রোধ ও অভিমান রূপ ভুলের বশেই বুঝিতে পারেন নাই যে, ইহাই তাহাদের বংশ ও রাজ্য লোপের মূল।

এই ত ভুল! এ সংসারে ভুলের রাজ্য পূর্ণ ভাবে প্রসারিত!! মানব হৃদয়ে এই ভুল অতুল বিক্রমে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে—মানুষ এমনি অন্ধ দেখিয়াও এ ভুল দেখিতেছে না, বুঝিয়াও এ ভুলের বিষয় বুঝিতেছে না।

মানব-দেহ দেব মন্দির সদৃশ পবিত্র ও নির্ম্মল স্থান। এই পূত দেব মন্দির মধ্যে আত্মারূপিণী মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বা চির সাত্ত্বিক গুণ বিশিষ্টা অপরিবর্ত্তনশীলা আত্মার চতুর্পার্শে মন, বিবেক, বুদ্ধি প্রহরীর ন্যায় সশস্ত্র দণ্ডায়মান্, তবে মানুষের হৃদয় মধ্যে এত ভুলের আবর্জ্জনা আইসে কি করিয়া? কোথা হইতে এ ভুল আইসে? কোথায় ইহার উদ্ভব, কে বলিতে পারে?

ভুল কখনও ক্রোধরূপে আরক্ত লোচনে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে, কখনও কামরূপে কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে করিতে, কখনও লোভ মোহ মাৎসর্য্য রূপ ভীষণ মুর্ত্তিতে, লোক চক্ষুর অজ্ঞাতে বুদ্ধি বিবেক ও মনকে নানা প্রলোভনে পরাজিত করিয়া আত্মার সান্নিধে আসিয়া তাঁহার অনন্ত জ্যোতি ঢাকিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। যাঁহার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ, জ্ঞান অনন্ত, বিবেক নির্ম্মল ও মার্জ্জিত এবং সতেজ অচঞ্চল, তাঁহার নিকট এই ভুল রূপ ঘোর অন্ধকার সুর্য্যকর প্রসারণে কুজ্‌ঝটিকা অপসরণের ন্যায় কোথায় অন্তর্হিত হয়। এই নির্ভুল মানবই মানব শরীরে এবং মনুষ্য নামের সর্ব্বথা যোগ্য। জগতে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক হইলে, সংসার স্বর্গ হয়, এ পার্থিব জগতে ত্রিদিবের শান্তি নির্ঝরিণী খর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

——কিন্তু এইরূপ বুদ্ধি, মন ও বিবেক, এ সংসারে কয়জন লোকের আছে! কয়জন এই নির্ম্মল বিবেক বুদ্ধির অনুগত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে? সকলেই ভুলের চিরদাস।

বাহ্য চাক্‌চিক্যশীল ভুলের আড়ম্বরময় আচরণ দর্শনে অথবা আপনাকে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ জ্ঞান করিয়া মানব এই ভুলকে পরমাত্মীয় বুঝিয়া তাহার একান্ত

অনুগত হইয়া পড়ে। কবিবর মিল্‌টন যথার্থই বলিয়াছেন——

He that has light within his own clear breast,
May sit in the centre and enjoy bright day."

Milton's Comus.

যিনি নির্ম্মল বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজ স্বার্থ পরস্বার্থের সহিত সংযোজিত করিয়া, জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে এই বিবেককেই আপনার চালক বোধ করিয়া, সংসারের দুর্গম কণ্টকাবৃত পথে অগ্রসর হন তিনি হাসিতে হাসিতে ভুলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহার ধর্ম্মোজ্জ্বল অপাপবিদ্ধ হৃদয়ে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে। তিনি এই পার্থিব সংসারে এই মাটির দেহেই স্বর্গের অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

——আর যিনি এই বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান, নির্ম্মল ও মার্জ্জিত না করিয়া ভুলের আপাতমধুর কিন্তু পরিণাম বিরস আনন্দে উন্মত্ত থাকিয়া সংসারের পথে অগ্রসর হইছেন,-তাঁহার হৃদয় অশান্তির পুতিগন্ধময়, নারকীয় স্থান। তাঁহার শান্তি এ জগতে নাই, তাই কবি ভ্রান্ত মানবকে সতর্ক করিবার জন্ত গাইতেছেন।

"But he that has a dark soul and foul thoughts,
Benighted walks under the mid-day sun,
Himself is his own clunge on."

Comus.

যে ভুল এত নিন্দনীয় ও ঘৃণার বস্তু সে ভুলকে আমাদের আত্মার এ অধিষ্টান ভূমিতে আসিতে দেওয়া কদাচই উচিত নহে। এ হেন জঘন্য বস্তুকে আমরা আদরের সহিত স্থান দান করি কেন? "ভুল করিতেছি, ভুল বুঝিতেছি, এই ভুলে কতলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে," জানিয়াও কেন আমরা ভুলকে ডাকিয়া আনি?

ক্রমশঃ

দীন---শ্রীরসিকলাল দে।

শোক-সংবাদ।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! অদ্য আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া একটী হৃদয়-বিদারক শোক-সংবাদ শুনাইতে হইল। শ্রীশ্রীভক্তিপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত-প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয় আর ইহ-জগতে নাই। গত ২৮শে কার্ত্তিক সোমবার দিবা দেড় ঘটিকার সময় ইষ্টনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি সজ্ঞানে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া আপনধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে বৈষ্ণবসম্প্রদায় একটী অমূল্য রত্ন হারাইলেন। কেবল বৈষ্ণবসম্প্রদায় কেন, তিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার উদার ধর্ম্মভাবের জন্য সকল সম্প্রদায়েরই প্রিয় ছিলেন, সুতরাং সকল সম্প্রদায়ই এই অমূল্য রত্ন হারাইলেন বলিতে হইবে, তবে সুখের বিষয় এই যে, তাঁহার নশ্বর দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার সঙ্কলিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৈষ্ণব-দর্পণাদি নানাপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ সকল তাঁহার ধর্ম্মভাব ও প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদানপূর্ব্বক ধর্ম্ম-জগতে চিরকাল তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন এই যে, আপনাদিগের নিরাশ হইবার কোন কারণই নাই। শ্রীভক্তিপত্রিকার প্রচার বিষয়ে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, এক্ষণে ভক্তিপত্রিকা পূর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপেই চলিবে। কেননা অতঃপর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ ইহার পরিদর্শনের ভার লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে-ছেন সুতরাং তাঁহারা এবং শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ ভক্তিবিশারদ ও শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে প্রমুখভক্তগণ নিস্বার্থ কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিবেন। অলমিতি।

নিবেদক—দীনাতিদীন,
প্রকাশক।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

৪র্থ সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

ওহে ও নন্দনন্দন! আমার একটা প্রার্থনা তোমায় [illegible] শুনিবে না কি? দেখ, আমি তোমার কিঙ্কর;—আজ বলিয়া নয়, [illegible] নয়, আমি তোমার চিরদিনের নিত্য-কিঙ্কর। কিন্তু কি জানি [illegible] মন্দ, বহির্মুখ হইয়াই আমি সকল দিক মাটি করিয়া ফেলিয়াছি; [illegible] দাসত্ব ছাড়িয়া দেহ, গেহ, ধন জন কতকির দাসত্ব আরম্ভ করি[illegible] ফলও তেমনই ফলিয়াছে;—তোমাকে ভুলিতে দেখিয়া মায়া-পিশা[illegible] আসিয়া ত্রিগুণরজ্জুতে আমার গলায় বাঁধিয়া ভীষণ "ভবসাগরের [illegible] ফেলিয়া দিয়াছে। হায় হায়, ঠাকুর! তাহার শরীরে একটুও মায়া [illegible]; সে আমায় একবার ডুবায় একবার উঠায়, হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ টুকুও দেয়

না। তখন আর উদ্ধারের উপায় কি আছে দয়াময়? এখন এক যদি তুমি কৃপা কর তবেই। তাহা কি করিবে না কৃপাময়? কেন, কেন, আমিতো তোমার পর নই?—বুদ্ধিদোষে পরের মত হইয়া যাইলেও তো তোমার পর নই? আর বিপথগামী হইলেও তো দাসের কেশে ধরিয়া টানিয়া আনাই প্রভুর কার্য্য; তবে তুমি তোমার এ ভ্রান্ত। ভৃত্যকেই বা উপেক্ষা করিবে কি করিয়া? ভোলাকে ভুলিয়া থাকাটাও তো সজাগ তোমায় ভাল দেখায় না। তাই বলি, নাথ! আর বিলম্ব করিও না, আবার তোমায় ভুলিতে না ভুলিতে আমাকে উদ্ধার কর। তাহার জন্য তোমাকে তো বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না? কেবল কৃপা করিয়া একবার 'মনে করিলেই হইবে,—আমি যেন তোমার ঐ চরণকমলে সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধূলিকণিকা। ইহাতে তো আর তোমার কিছু কষ্ট হইবে না? মাঝে হইতে তোমার ঐ স্মরণের বা চরণের গুণে আমি মায়া-পিশাচীকে ফাঁকি দিয়া ভবের পারে চলিয়া যাইব। এ কৃপাটুকুও কি করিবে না করুণাময়? দাও, দাও প্রভু! তোমার শ্রীপাদ-পদ্মের আশ্রয় দাও, তোমাকে ভোলা তোমার কিঙ্করকে আপনার করিয়া আবার সেবার অধিকার দাও। সে সেবা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাউক।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

(প্রেমময় দাদা ৺দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন
মহাশয়ের পরলোক গমনে)

শোকোচ্ছ্বাস।

—:০:—

(১)

"নাই, নাই, নাই আর,
দাদা দীনবন্ধু তোর,
প্রেমময় দাদা এ জগতে।"
বুকেতে অশনি হানি,'
কে কহে কঠোর বাণী
বড়ই লাগিল মরমেতে॥

(২)

নাই দাদা, দাদা নাই,
নিদারুণ কথা ভাই,
শুনিয়া যে হইনু স্তম্ভিত।
হা কপাল! হা কপাল!
কারে বা কহিব আর,
হয়েছি অবাক বুদ্ধিহত॥

(৩)

কোথা দাদা কার কাছে,
দাঁড়াইব ল'য়ে এই—
সংসারের তাপ-দগ্ধপ্রাণ।
কেবা আর নিবারিবে,
মোদের হৃদয় ক্ষত,
শীতল প্রলেপ করি'দান॥

(৪)

মধু মাখা ভক্তি-কথা,
এমন সরল ভাবে,—
আর বা শুনিব কার মুখে?
কলুষ-কালিমা যত,
যাবে দূরে, অতি দূরে;
শান্তি ধারা বহিবে কি বুকে?

(৫)

সরস হৃদয় জাত,
ভাবের প্রসূন তুলি'
কেবা আর দিবে উপহার?
ভক্তির সাহিত্যোদ্যানে,
এমন করিয়া বল,
কল কণ্ঠে তুলিবে ঝঙ্কার?

(৬)

ভক্তির শ্রীঅঙ্গ খানি,
নানা রত্ন আভরণে,
সাজাইতে প্রাণের প্রয়াস।
আর কার হৃদয়েতে,
জাগিবে জাগিবে বল?
স্মরি, প্রাণ হয়রে হতাশ॥

(৭)

কে আর "লীলারহস্য,"
মাধুর্য্য-রস মাখায়ে,
ললিত রাগেতে শুনাইবে?
হৃদয়ের পূতোচ্ছ্বাস
আকুল প্রার্থনা কথা,
শুনাইয়ে প্রাণ কাড়ি লবে?

(৮)

"দম্পতি দর্পণ" চিত্র,
এমন করিয়া আর,
কে ধরিবে সম্মুখে মোদের?
"ক্ষ্যাপা-প্রেমানন্দ" বাক্যে
কে আর হৃদয় ক্ষেত্রে,
ছুটাইবে বন্যা অমৃতের॥

(৯)

"বৈষ্ণব দর্পণে" মুখ
দেখিতেছিলাম সুখে,
অঙ্গহীন রহিল তা'হায়!
সত্যের প্রচারে দাদা,
ক'রেছিলে প্রাণপণ,
সে উদ্যম রহিল কোথায়?

(১০)

তোমার সাধের ধন
"শ্রীশ্রীমৎ ভাগবত"
ওই দেখ অমর-অক্ষরে।
প্রচার করেছে কীর্ত্তি;
রবে সমুজ্জ্বল উহা,
ভকতির সাহিত্য ভাণ্ডারে॥

(১১)

তুমি দেব এসেছিলে,
মানবের দেহ ধ'রে,
কলুষিত অনিত্য ধরায়।
ক্ষণিক কর্ত্তব্য সাধি
চলিলে হে নিত্যধামে,
মিলিবারে নিত্যের লীলায়॥

(১২)

কলুষ পঙ্কেতে পূর্ণ,
মোদের এ মর্ত্ত্যধাম,
তাই তব না হইল স্থান।
পাপাচ্ছন্ন হেরি ধরা,
ফেলিলে হে অশ্রুধারা,
অভিমানে তাই অন্তঃর্ধান॥

(১৩)

না, না, দাদা করিব না,
শোক আর তব তরে,
করিব না ভাবের বিকার।
শ্রীযুগল সেবা লয়ে,
সখীর অনুগা হ'য়ে
থাক তুমি, প্রেমের আধার॥

(১৪)

ভাব ময় ছিলে সদা,
ভাবের দেশেতে তাই,
হাস্যমুখে গেছ তুমি চলি।
আমরা পড়িয়া আছি,
পশ্চাতে তোমার, প্রিয়!
দাও ভাব দাও পদধূলি॥

(১৫)

তোমার সে শান্ত সৌম্য,
অতি নম্র সুমোহন,
প্রীতি-পূর্ণ মূরতি সুন্দর।
অন্তরের অন্তস্তলে,
বসাইয়ে সযতনে,
জুড়াই এ তাপিত অন্তর॥

স্নেহের শ্রীরসিক লাল দে।

(পণ্ডিতপ্রবর ৺দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়ের পরলোক গমনে)

শোকোচ্ছ্বাস।

—:০:—

(১)

কার্ত্তিকে দ্বাদশী দিনে, শোক উপজিল মনে,
কিজানি কি দুঃখ রাশি ঢালিছে পরাণে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সব শূন্যাকার দেখি,
ভাসিতেছে সব যেন শোক প্রস্রবনে॥

সন্দেহ দুশ্চিন্তা ভয়ে, বিষাদে মলিনা হয়ে,
আছি ব'সে একাম্বরে অবসন্ন মন।
একি শুনি অকস্মাৎ, শিরে যেন বজ্রাঘাত,
গুরুদেব গেল নাকি ত্যজিয়া জীবন॥

হায় কি দারুণ কথা, পরাণে বাজিল ব্যাথা,
অকালেতে কেন দেব ত্যজিলে সংসার।
ওই রবি শশি তারা, তারাও কিরণ হারা,
যেন তারা কেঁদে সারা শোকেতে তোমার॥

ত্রয়োদশ মাস গণি, করিলেন বাস যিনি,
যোগ ধ্যানে ন্যস্ত মন গর্ভেতে মাতার।
পাতকী নিস্তার তরে, জন্মিয়া ধরণী পরে,
সকালেতে কেন গেলে দিয়া শোকভার॥

কাঁপাইয়া নভস্তল, প্রকাশিলে ধর্ম্ম বল,
কত ভক্তে মন্ত্রদানে করিলে উদ্ধার।

দীন দুঃখী অভাজনে, দিয়া অন্ন বস্ত্রদানে,
ঘুষিয়াছ গুরুদেব সুনাম অপার ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম বিচারিলে, সার তত্ত্ব প্রচারিলে,
অধম পাতকী জনে করিতে তারণ।
সাধু গুরুদেব তুমি, ধন্য করি বঙ্গভূমি,
কত শাস্ত্র রচিয়াছ জীবের কারণ ॥
পৃথ্বি হ'তে অন্য ধরা, দেখিলে কি পাপে ভরা,
উদ্ধারিতে তাই দেব করিলে গমন ?
ফেলি শোক সিন্ধু-নীরে দারা সুত সহোদরে,
তনয়া প্রতিমা তব আর ভক্তগণ ॥
কিম্বা অতি শুভক্ষণে, উত্থান দ্বাদশী দিনে,
উঠিলেন শয্যা ছাড়ি শ্রীহরি যখন।
বুঝি কোন প্রয়োজনে, নিয়া যান তোমাধনে,
তাঁহার অভাব কিছু করিতে মোচন ॥
আর না শুনিব মোরা, তব বাক্য জ্ঞান ভরা,
হে গুরো ! গেলা চলি না পুরাইয়া আশ।
চির দিন ভক্তি ভরে, তব মূর্ত্তি পূজা ক'রে,
কাটাইব দিন মোরা স্মরি তব ভাষ ॥
ধন্য তব পুণ্য নাম, অনুপম গুণ গ্রাম,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি আছিলে ধরায়।
যত দিন রবে ধরা, রবি শশি গ্রহ তারা,
ঘুষিবে তোমার যশ তাবৎ সংসার ॥

(২)

বিষাদিত কেন আজি মোসবার প্রাণ,
আজি কেন এ আলয়ে উঠে দুঃখ তান ;

সবার হৃদয় কেন শোকেতে ভাসিছে।
যুবা বৃদ্ধ সব কেন বিষাদে ডুবেছে॥

বলিতে হবেনা আর বুঝেছি কারণ,
গুরুদেব বুঝি আজ মুদেছে নয়ন;
তাই হেন শোক সিন্ধু উঠেছে ভবনে।
তাই দুঃখ স্রোত হেরি সবার নয়নে॥

জ্ঞান হীন লভে জ্ঞান যাঁহার কৃপায়,
ভক্তি হীন লভে ভক্তি যাঁহার দয়ায়;
পাষণ্ড গণের যিনি পরম কারণ,
হেন গুরু অকালেতে ত্যাজিল জীবন॥

প্রশান্ত মধুর ভাব করিয়া ধারণ,
সদা করিতেন যিনি ভক্তের পালন;
অকাতরে দান যিনি করিতেন দীনে।
অন্ন দান বস্ত্র দান কত শত জনে॥

বহুদিন হ'তে ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে,
রচেন আশ্রম এক দীনের কারণে;
পালিবেন যত দুঃখী পিতার সমান।
যতনে তাদের করি অন্ন বস্ত্র দান॥

না পুরিতে সেই ইচ্ছা চির দিন তরে,
ভাষাইয়া ভক্তগণে শোক সিন্ধু-নীরে;
হৃদয়ের তমোরাশি না করি মোচন।
অসময়ে গুরুদেব করিলা গমন॥

সময়ে ক্রমশ আসি ঘটে অসময়,
নিয়তির বাধ্য সব নিয়তই হয়;
জানিয়া তথাপি মোরা কাঁদি নিশিদিন।
শোকেতে আচ্ছন্ন হ'য়ে রিপুর অধীন॥

হৃদয় ভেদিয়া উঠে শোক পারাবার,
গুরুদেব তুমি ছাড়া কে করে উদ্ধার;
কে আর ঘুচাবে বল মোসবার পাপ,
দুনিবার শোকে প'ড়ে পাই মনস্তাপ॥

অল্পকাল গুরুদেব ভূলোকে থাকিয়া,
মায়ার অতীত যোগ বলে সমাধিয়া;
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান করি অবশেষে,
লভিলেন মোক্ষপদ পরম পুরুষে।

পাপ নাশিলেন করি পুণ্য বিতরণ,
কাঁদাইয়া শেষে দেব হ'লে বিস্মরণ;
কপালের দোষে মোরা নারিনু যতনে।
বাঁচাতে অমূল্য নিধি বেদান্তরতনে॥

(৩)

কহগো প্রকৃতি,
কিসের লাগিয়া,
এ শোক বহন করেছ আজ,
সমস্ত জগৎ,
স্পন্দহীন এবে,
সাধিবারে কোন সমাধিকাজ॥

কেনরে বিহগ,
ব্যাকুল কূজনে,
বিঁধিল জগৎ বাসির বুক।
তাইতে পবন,
করি সন্ সন্,
আকুল পরাণে জানায় দুঃখ॥

পৃথিবী ব্যাপিয়া,
নিদারুণ তান,
মগন আজকি শোকের বানে।
চারিদিকে সব,
অশ্রু চক্ষে যেন,
চেয়ে দেখে কেন আমার পানে॥
হেরি তবে কেন,
এ শোক মূরতি,
মম মন কেন চঞ্চল এত ;
বুঝিতে না পারি,
দিয়া বুঝি ফাঁকি,
গুরুদেব ত্যজিল জগত॥
কহ গুরো দেব,
কোন দোষে মম,
অকালেতে কেন করিলে প্রয়াণ।
অভাগিনী আমি,
তা না হ'লে কেন,
এত শীঘ্র তেঁই হ'লে অন্তর্ধান॥
আর না করিবে,
তব বাক্য সুধা,
সতত তৃষিত করিবারে পান।
রবে তৃষাতুর,
বুঝি চির তরে,
পাইবে না আর জ্ঞান সুধাদান॥
এ মায়া সংসার,
তব উপদেশ,
ভরসা ছিঁড়িতে মায়ার বন্ধন।

করিলে গমন,
বল গুরুদেব,
কিরূপে পাইব তব শ্রীচরণ ॥

ওহে দয়াময়,
করুণা সাগর,
চলি গেলা দেব গোলোক ধাম।
শুন গুরুদেব,
সেথা নিবসিতে,
লইতে অভাগিরে না হইও বাম ॥

রাধারাণী।

ভুল।

—ঃ০ঃ—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে ভুল মানবের ভয়াবহ এবং শোচনীয় বস্তু, যে ভুল নরকের একমাত্র দ্বার স্বরূপ, যে ভুল দূর করিবার জন্য মানবের শিক্ষা, বিদ্যা উপার্জ্জন; জ্ঞান ও বিবেককে মার্জ্জিত করিয়া হৃদয়কে শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল কৌমুদীর ন্যায় নির্ম্মল করাই শিক্ষার, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। তবে, শিক্ষার গুণেও মানুষ এত ভুল করিতেছে কেন?

কেন আজকাল আর পূর্ব্বের মত ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, উদার চরিত্র দেবোপম মানুষ প্রায়ই দেখিতে পাই না? তবে কেমন করিয়া বলিব এ শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা! এ শিক্ষা ভুল ভাঙ্গিবার শিক্ষা!!

পাপের অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপে নিমগ্ন নরগণ ভুলে ভুলে আর মত্ত থাকি ও না—ভুল ভাঙ্গিত চেষ্টা কর। আর্য্য মুনীষীগণের বংশধর হইয়া প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়

দাও। মনে কর, তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভুলের উপর কতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিলেন; আর তোমরা হইয়াছ ভুলের হস্তে ক্রীড়ার বস্তু। ভুল তোমাদের বড় যত্নের, বড় আদরের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না, নাস্তিক হইয়াছ, দেব দ্বিজে ভক্তি ভুলিয়াছ, গুরুজনে আর তেমন শ্রদ্ধা নাই, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সেইরূপ এক প্রাণতা নাই, তোমাদের ভুলের বাকি কি? আর না ভাই, ভুল ভাঙ্গিতে এস চেষ্টা করি। সেই জগদাশ্রয় মহাপুরুষের নিকট, এস আমরা ব্যাকুল হৃদয়ে ভুল ভাঙ্গিবার জন্য, প্রার্থনা করি, হৃদয় দেবতা তিনি, আমাদের আকুলতা ও দীনতা দেখিয়া ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজ অমৃত নিকেতনের মাধুর্য্য দ্বারা আমাদের তাপিত হৃদয় মন শীতল করিবেনই, করিবেন।

দীন—রসিক লাল দে,

শিবরাম।

—০ঃ০—

(১)

বনের ফুল বনে ফুটিয়া, বন মধ্যে আপনার সৌরভ বিস্তার করিয়া বনেই বিলীন হইয়া যায়। এই বনফুলের ন্যায়, অনেক গুলি গ্রাম্যকবি নিজ সৌরভ স্বগ্রামের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া নিরবে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে কে বল, তাঁহাদের সংবাদ লয়?

উপরে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, উনিই একজন বঙ্গীয় কবি। কিন্তু তাঁহার স্বগ্রাম ব্যতীত, অন্য কোন গ্রামে বা নগরে তাঁহার সৌরভ ছুটে নাই। কবি মরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাব্য এখনও গ্রামের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। কবির রচিত কবিতা গান ও ছড়া পুরাতন পুঁথির সহিত অবস্থিত থাকিয়া, কীট-দষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। বঙ্গের সাহিত্য সংসারে উক্ত কবির

যৎকিঞ্চিত পরিচয় দিলে অন্যায় হইবে না। ভক্তি সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণ, ইহাতে কিছু আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

কবির নাম শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়। নিবাস বাঁকুড়া জেলার অধীন সোণামুখী গ্রামে। সোণামুখী অঞ্চলে ইনি "শিবুগাঙ্গুলী" বলিয়া বিখ্যাত। আজ ২০।২৫ বৎসর হইল, তিনি সোণামুখী ছাড়িয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন। ৺কাশীধামেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিতে পাই যখন তিনি সোণামুখী পরিত্যাগ করেন, তখন সোণামুখীর শালি নদীর তীর হইতে একটি গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরস্থিত পানাগড় ষ্টেশনে সেই গান শেষ করেন। কবির কি অসাধারণ ক্ষমতা, ইহা তাহার বিশিষ্ট পরিচয়।

শিবরামের একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল, কিছুদিন হইল তাহাদেরও মৃত্যু হইয়াছে। কবি, রামায়ণ গাহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। উপস্থিত বুদ্ধি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। মুখে কবিতার স্রোত ছুটীয়া যাইত, তিনি কথায় কথায় কবিতা ও ছড়া বাঁধিতেন; কবিতার সঙ্গে রসিকতারও সংমিশ্রণ ছিল, তাই সে সরল কবিতা, চুম্বকের লৌহ আকর্ষণের ন্যায় লোকের মনকে টানিয়া ফেলিত। কবিতা অপেক্ষা তাঁহার ছড়া ও গানের অধিক প্রশংসা করিতে হয়। শিবরামের কবিতা ও গানে গ্রাম্য দোষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু যে সময়ে ও যে স্থানে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার দোষ মার্জ্জনীয় হইতে পারে। প্রতিভা উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মার্জ্জিত হইলে, তাহার যেরূপ বিকাশ হয় অন্য অবস্থায় তাহা কদাচ হইতে পারে না। শিবরামের কাব্য, কবিতা, ছড়া ও গান তাঁহার অমার্জ্জিত প্রতিভার ফল।

তাঁহার সমস্ত ছড়া, কবিতা, গান প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে পারিলে সোণামুখীর পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত প্রায় সমস্তই অবগত হইতে পারা যায়। সভ্যতা-আলোকে আলোকিত হইবার ও ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইবার পূর্ব্বে সোণামুখীর অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বিশেষ বিবরণ তাঁহার কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে আমরা তাঁহার রচিত সমস্ত প্রসঙ্গ সংগ্রহ করিতে পারি নাই; তবে যে সামান্য অংশ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে যৎসামান্য উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

সোণামুখীতে অনেক দিন হইতে গণেশ জননীর পূজা হইয়া আসিতেছে। কবি তদুপলক্ষে সন ১২৬৭ সালে যে গানটী গাহিয়াছিলেন, তাহা এই—

"নয়ন দেখরে রূপমাধুরী।
ওরে গিরিন্দ্র নন্দিনী গণেশ জননী,
বসি পদ্মাসনে গণেশ কোলে করি॥
জিনি ভুজঙ্গিনী বেণী শোভা শিরে,
মণি মুকুটেতে কিবা শোভা করে,
বৈজয়ন্তী মালা হৃদয় উপরে,
অঙ্গের বরণ শুকতি বিজোরী॥
মৃদুমন্দ হাসি সুবিধু বদনে,
সূর্য্য নিরমল কুণ্ডল শ্রবণে,
আঁখি দীপ্ত করে ফণি মণিগণে,
অতি নিরানন্দ মুখ চন্দ্র হেরি॥
ভুজে বাজু বন্ধ বলয় কঙ্কন,
কর পদ্ম মায়ের অরুণ গঞ্জন
কটিতটে কিবা অরুণ বসন,
অরুণ চরণ আহা মরি মরি॥
স্তন্য পান করে কোলে গণপতি,
দুই পাশে শোভে লক্ষ্মী সরস্বতী,
যন্ত্র করে গায় বিজয়া প্রভৃতি,
প্রীতি উল্লাসিত কৈলাস নগরী॥
শিব মনোহিনীর রূপ অনুপম,
অনিমিষে হেরি কহে শিবরাম,
করগো মানস হৃদয়ে বিরাম,
আমি হেরি রূপ দিবস শর্ব্বরী॥"

কবির একটী শ্যামা সঙ্গীত এই—

"রণে কেলে মাগী কেরে।

মাগীর সৃষ্টিছাড়া, গলার সাড়া, আবার খাঁড়া ধ'রেছে॥
নাই কো লজ্জা, বিষম সজ্জা, ক'রে এসেছে।
ও কার কুলের দফা, ক'রে রফা, ন্যাংটা হ'য়েছে রে॥
দেখ জোড়া শিশু মড়া কাণে প'রেছে
ওরে মালা গাঁথা গুটেক মাথা গলায় পরেছে রে" ॥

(ক্রমশঃ)

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

যেন ভুলি না।

——:০:——

যেন ভুলি না। দীনবন্ধু, দীনদয়াল, গুরো! যেন তোমার সে প্রেমময় ভাবময় মধুর জ্যোতির বিমল কিরণ, আর্ত্ত সেবকের জীবন পথ আলোকিত করে। আহা, কত লোকে কত ভাবে, তোমায় ভাবিয়াছে, কত লোকে কত সাধে তোমায় সাধিয়াছে, তবু সাধ মেটে নাই, তবু তাহাদের প্রাণের পিপাসা মেটে নাই। শ্বাপদ সঙ্কুল, ঘোর অন্ধকার ময়, পিচ্ছিল পথে বিচরণ করিতে করিতে, যখন বারম্বার পতন বেদনায় অস্থির হইয়া তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, তখন দয়াল গুরো! তুমি দয়া করিয়া তাহাদের নয়নের মলিন আবরণ উন্মোচন করিয়া যে অপূর্ব্ব আলোকময় পথ দেখাইয়া দিয়া ছিলে, আদর্শ গৃহী আদর্শ ব্রাহ্মণ, আদর্শ গুরুরূপে, যে মহান্ আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছিলে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, মুগ্ধ নর নারীকে যে জ্ঞান, যে শিক্ষা, যে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলে, তাহা কি কেহ কখনও ভুলিতে পারে? তাহা কি কখনও ভুলিতে পারা যায়? তাহা ভুলিলে কি মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে ক্ষণেকের তরেও কি, তৃপ্তিদায়িনী শান্তির বিমল ছায়া পতিত হয়? হয় না বলিয়াই তো, তাহাদের আশা মেটে নাই। পাছে তোমায় ভুলিলে, তোমার আদেশ

লঙ্ঘন করিলে, তোমার মধুর সঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত হইলে আবার সংসারের মোহ আবরণে আবরিত হইতে হয়, আবার লক্ষ্য ভ্রষ্ট পথ হারা পথিকের ন্যায়, অন্ধকারে বিচরণ করিতে হয়, সেই জন্য যাহারা তোমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত,' তোমার দর্শন লালসায় ছুটিয়া আসিত, তাহারাই এখন তোমার পার্থিব মূর্ত্তির অদর্শনে, উর্দ্ধমুখে চাহিয়া, দিব্য-লোকস্থিত তোমার দিব্যমূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে বলিতেছে,—

"দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
আঁধার পরাণে বড় ব্যাথা পাই, দেখা দিয়ে জুড়াও অন্তর॥
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,
অন্তরে বাহিরে যেন নিরখি, তবরূপ মনোহর॥"

যেন ভুলি না। যে মধুর মূর্ত্তির আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া, কত নরনারীর প্রাণে মধুর ভাবের উন্মেষ হইত, তাহা কি ভুলিতে পারা যায়? তোমার কৃপায়, যাহার প্রাণে একবারও সে মধুর ভাব জাগিয়া ছিল, সে কি কখনও সে ভাবচ্যুত হইয়া স্থির থাকিতে পারিবে? আবার যে মুহূর্ত্তে তাহাদের প্রাণে সে ভাবের উদয় হইবে, তখনই তো তুমি তোমার জ্যোতির্ম্ময়রূপে তাহাদের হৃদয় আকাশ আলোকিত করিবে। তুমি এখন জড় জগতের স্থূল আবরণে আবৃত নও বলিয়া, তোমার সেবকেরা তাহাদের স্থূল নয়নে তোমায় বাহিরে দেখিতে পায় না। কিন্তু তা বলিয়া তো তুমি তাহাদের মানস চক্ষের বহির্ভূত হও নাই। বরং আগে যাহারা তোমাকে স্থূল ভাবে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইত, এখন তাহারা সেইরূপ ব্যগ্রতা সহকারে তোমায় স্মরণ করিলে, তাহাদের আশে পাশে, সদা সর্ব্বদা তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে পাইবে। আর তখন গদগদ কণ্ঠে বলিতে থাকিবে,—

"নয়ন তোমায় পায়না দেখিতে,
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমায় পায়না জানিতে,
রয়েছ হৃদয়ে গোপনে।

বাসনার বশে মন অবিরত,
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত,
জাগিছ শয়নে স্বপনে ॥

যেন ভুলি না। গুরো! যে ভাবের খেলা খেলিয়া গিয়াছ, যে ভাব তরঙ্গের আন্দোলনে কত শত ভাগ্যবান নর নারীর হৃদয় আন্দোলিত করিয়া দিয়াছ, যে মন মাতানো, প্রাণ জাগানো মধুর স্বরে "রাধে গোবিন্দ গোপীনাথ গোপীজন বল্লভ" বলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে অতি অধমের প্রাণেও ক্ষণেকের তরে পবিত্র ভাবের সমাবেশ করিয়া দিয়াছ, তাহা কি কখনও ভুলিতে পারা যায়? তোমার সে ভাবময় কীর্ত্তনের মধুর স্বর যাহার কর্ণকুহরে একবার প্রবেশ করিয়াছে, সেই ভাবিয়াছে, আহা! এ যে প্রাণের আহ্বান! এ যে অব্যর্থ সন্ধান!! এ যে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল রে, আকুল করিল মোর প্রাণ!!!" যে একবার মাত্র তোমার সে ভাবাবিষ্ট, প্রেম পুলকিত কলেবরে মধুর নৃত্য করিতে দেখিয়াছে, সে যে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে; মন্ত্র মুগ্ধ ফণীর ন্যায়, তাহার হৃদয় যে তখন তোমার প্রতিপদ বিক্ষেপে নাচিয়া উঠিয়াছে। যে সর্ব্বশক্তিময়ের শক্তিকণা তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়াছিল, তাহার শান্তোজ্জ্বল তেজোবিক্ষেপ যাহাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে, তাহারা আজ আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞানে, কৃতাঞ্জলি পুটে, তোমার উদ্দেশে বলিতেছে,—

"তোমার রাগিনী জীবন কুঞ্জে,
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমার আসন হৃদয় পদ্মে,
রাজে যেন সদা রাজে গো!!

যেন ভুলি না। দয়াল গুরো! তুমি যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছ, কলি কলুষলিপ্ত নরনারীকে আহ্বান করিয়া যে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিয়াছ, বিপথগামী, পশু ভাবাপন্ন, মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত, মানব মণ্ডলীকে যে সারগর্ভ উপদেশ

দান করিয়াছ, তাহা কি কখন বিফল হইতে পারে? যখন প্রভাতে প্রথম নয়ন উন্মীলন করি, তখন যেন তোমার শক্তি আসিয়া কাণে কাণে বলিয়া দেয়,—

" বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াম্,
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্ণঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে,
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেহস্তু ভবত্তনূণাম্ ॥"

আবার যখন অধ্যয়ন করিতে বসি, তখন মনে হয়, তুমি যেন প্রভো! নয়নাগ্রে সেই মধুর মূর্ত্তিতে বসিয়া বলিতেছে,—

ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্ন মভীষ্ট দোহং,
তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্থিহং প্রণতপাল ভবাব্ধি পোতং,
বন্দে মহাপুরুষতে চরণারবিন্দম্ ॥

এইরূপে জীবনে যখন যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, যখন যেখানে যাই না কেন, মনে হয় যেন তুমি সর্ব্বত্র বিরাজ মান, মনে হয় যেন তুমি গুরুরূপে, পরিচালক রূপে, শিক্ষকরূপে, নয়নাগ্রে প্রত্যক্ষ রহিয়াছ। যখন পথে চলি, তখন মনে হয় যেন তুমি সহাস্য বদনে সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" যখন সংসর্গ দোষে আপনাকে অবনত করিয়া আনি, তখন মনে হয় যেন তুমি উর্দ্ধলোক হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছ, " উর্দ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানাং অবসাদয়েৎ।" যখন সামান্য মাত্র বাহিক আনন্দে উৎফুল্ল হই, তখন যেন তোমার গম্ভীর স্বর শুনিতে পাই,—" ভাবে থাক ভাব-না ছুটিবে "। আবার যখন সামান্য কারণে ম্রিয়মান হই, তখনও যেন ঐ গম্ভীর স্বর আসিয়া বলিয়া দেয়—ভাবে থাক ভাবনা ছুটিবে।" যখম চিত্ত চঞ্চল হয়, মন অস্থির হয়, সংসারের মধ্যে পড়িয়া চারিদিকে ঘোর অন্ধকার দেখি, তখনই তোমার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া বলিয়া উঠি " দাও অভয় অভয়দাতা, তুমি গুরু তুমি পিতা, তুমি বন্ধু তুমিই সহায়।" আর যখন সৎসঙ্গ ফলে, সদালাপ করিতে করিতে, ক্ষণকের তরেও সদ্ভাবের উদয় হয়, তখন যেন তোমার সেই মধুর ভাব মাখা ঢল ঢল মূর্ত্তি খানি; মানস পথে পতিত হয়, আর শুনিতে

পাই, যেন তুমি সেই চির আদৃত, চির অভিলষিত, চির পরিচিত, ভাবোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে গাহিতেছ,—

ভালবেসে মেটেনা সাধ আর ভালবাসা চাই।
আমায় দাও ভালবাসা, পূর্ণ হোক আশা,
একেবারে ভাবে মেতে যাই॥

চোখে চোখে বুকে মুখে রয়েছ সতত।
তুমি আছ বলে আছি, বাঁচাও বলে বাঁচি,
না থাকিলে অমনি মরে যাই॥

তুমি আমার আমি তোমার হে প্রাণবল্লব।
তুমি চলাও তাই চলি, বলাও তাই বলি,
(তোমায়) ভাবিলে সকলি ভুলে যাই॥

একেবারে তোমার হয়ে আপনা ভুলিব।
ভাবে যেদিকে চাহিব, সেদিকে দেখিব,
সদা যেন তোমার দেখা পাই॥

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

লালে লাল।

—:০:—

[মহার্ণব-নীরে বটপত্রপরে শোভিত শিশুরূপী শ্রীভগবানের চিত্র সন্দর্শনে।]

এ বা কোন্ লীলা! হরি পত্রে হরির শয়ন!
বদন কমলে ওই চরণ কমল।
মরি! মরি! কিসুষমা চিত বিমোহন;
কি এ ভাব সুগভীর, কত নিরমল।

মনি সহ কাঞ্চনের অপূর্ব সংযোগ,
প্রাণ কাড়ি'লয়, মাত্র করিলে দর্শন।
যায় শোক, যায় দুঃখ, ঘুচে দেহ রোগ,
পুলকে পূরিত হয়, হিয়া, তনু, মন।
রাঙ্গা পাদু'খানি বটে কিবা সুধাময়;
কি গৌরব, কি সৌরভ! কি প্রভাব তার!
বুঝাতে জগত-জনে, এ ভাব উদয়;
ধন্য মার্কেণ্ডেয় মুনি শক্তি তপস্যায়।
মহা বিষ্ণু রূপ ধারী, কার এ দুলাল!
জগতে অতুল শোভা হেরি, লালে লাল।

দীন—রসিক লাল দে।

সৎপ্রসঙ্গ।

—:o:—

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

চ। শ্রাদ্ধের যে সময় ও উপকরণ নির্দ্ধারিত আছে, তাহা ভিন্ন অন্য সময়ে ও ইচ্ছামত উপকরণ দ্বারা কি শ্রাদ্ধ হইতে পারে না?

র। কেন হইবে না? তুমি মৃতের তৃপ্তির উদ্দেশে কোন সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক একটি ডাব বা কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইলেও ঐ তৃপ্তি লক্ষ্যস্থলে পৌছিবে, ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া যাঁহারা ইচ্ছাসত্ত্বেও শ্রাদ্ধ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ শ্রাদ্ধ করাই কর্ত্তব্য, সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণাধার রূপ ডাক বাক্সে মৃতের প্রিয় দ্রব্য সকল শ্রদ্ধার টিকিট লাগাইয়া পোষ্ট করিলে নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধ হইবে জানিও, তবে অর্থ পিপাসু পুরোহিতগণ পাওনার সম্ভাবনা

না থাকায় নিশ্চই এরূপ বিধান দেন না, ফলে দরিদ্র জনসাধারণ ঐ অন্ধতার অনুসরণ করায় তাহাদের পিতৃপুরুষগণ সাময়িক তৃপ্তি লাভেও বঞ্চিত হয়।

চ। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল তাহা মিটিয়াছে কিন্তু একটি কথায় একটু গোল লাগিতেছে এই যে, একের তৃপ্তি কি অপরের মধ্যে চালিত হয়?

র। জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক যাহারা সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে না পারিয়াছে, তাহাদিগকে সহজে ইহা বুঝান যায় না, তবে এ সম্বন্ধে আমি স্থূল পরীক্ষার দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার মধ্যে ২।১টি ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ কর।

জ্বরের সময় কিছুতেই তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে না অথচ ডাক্তারেরা অধিক জল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, এই অবস্থায় বরফ জলের সরবত প্রস্তুত করাইয়া আমার তৃষ্ণা শান্তির উদ্দেশে কয়েক জন বন্ধুকে উহা পান করিতে বলিলাম ও আমি আপনাকে তাহাদের সহিত অভেদ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ফলে কিছুক্ষণের মধেই আমার তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইল।

আমার একটি সাধু বন্ধু গঙ্গাসাগর গিয়াছিলেন তিনি ষ্টীমারে পানাহার করেন না। তৃপ্তি চালনার পরীক্ষা করিবার জন্য আমি তাঁহাকে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণার উপশম হয় কিনা তাহা লক্ষ্য করিতে বলিয়াছিলাম, পরে ঐ সময়ে তাঁহার তৃপ্তির উদ্দেশে আমি তাঁহার সহিত আপনাকে অভেদ ভাবিয়া আহার করিলাম, ফলে তাঁহার প্রত্যাগমনের পর শুনিলাম যে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তাঁহার ক্ষুধাও পিপাসার উদ্রেক হইয়াছিল কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি ঐ ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি অনুভব করিয়াছিলেন।

ভাই! অন্নময় ও প্রাণময় কোষদ্বয় তৃপ্তিকে মনোময় কোষের মধ্যে স্থায়ি ভাবে অবস্থান করিতে দেয় না, তথাপি সামান্য চিন্তার দ্বারা যখন এই কোষদ্বয় ভেদ পূর্ব্বক মনের মধ্যে তৃপ্তির আবির্ভাব উপলব্ধি করা যায়, তখন যাঁহাদের শরীর মনোময় উপাদানে গঠিত, একাগ্র চিন্তার দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে ঐ তৃপ্তি যে সহজে ও পূর্ণভাবে সঞ্চারিত হইবে তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? যোগদৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিগণের উপদিষ্ট প্রত্যেক কর্ম্ম সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জানিও, জ্ঞান লাভের পর একটু একাগ্র ভাবে চিন্তা করিলেই তাঁহাদের উপদেশের

মর্ম্ম উপলব্ধি হয়; অতএব সৎসঙ্গাদির দ্বারা জ্ঞান লাভের চেষ্টা কর; ভগবল্লক্ষ্য স্থির রাখিলে এই চেষ্টা অবিলম্বে ফলবতী হইবে ও তখন দেখিবে যে তোমার ইচ্ছা মাত্রেই তত্ত্ব সকলের আবরণ আপনা হইতে উন্মোচিত হইতেছে।

চ। জ্ঞানের পরে কি কর্ম্ম থাকে?

র। জ্ঞানের পূর্ব্বে কর্ম্মের সহিত অহঙ্কার যুক্ত থাকে কিন্তু জ্ঞানের পরে ঐ কর্ম্ম তৎকার যুক্ত হয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া যন্ত্রবৎ কৃত হয় এবং ইহারই নাম প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম।

চ। এক মাত্র জ্ঞানের দ্বারাই কি ভগবল্লাভ হয়?

র। ক্ষিত্যাদি প্রত্যেক স্থূল ভূতের সহিত যেমন অপর চারিভূত সামঞ্জস্য ভাবে মিলিত, সেইরূপ সাধকের মনে জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির সামঞ্জস্য না থাকিলে কখনই তিনি চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ফলের আস্বাদ সম্ভোগ করিতে পারেন না, যাহাতে এই সামঞ্জস্যের অভাব দেখিবে, তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত পথগামি বলিয়া জানিও. হস্ত পদাদির সামঞ্জস্য না থাকিলে যেমন দেহ অকর্ম্মণ্য হয়, সেইরূপ মনের হস্ত পদাদি স্বরূপ ভক্তি বিশ্বাসাদির সামঞ্জস্য না থাকিলে অকর্ম্মণ্য মন সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে পারে না। ভাই! মন অজ্ঞানান্ধকারে অবস্থান করিতেছে, তাহার জ্ঞানরূপ নয়ন থাকিতেও সে অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, যে আনন্দের জন্য সে অন্ধ ভাবে অনন্তকাল অলক্ষ্যে ছুটাছুটি করিতেছে, সেই সচ্চিদানন্দ ফল যে তাহার সম্মুখেই বিদ্যমান, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না, অতএব প্রথমতঃ আলোকের প্রয়োজন, কেননা আলোক হইলেই মন জ্ঞান নয়নের দ্বারা তাহার বাঞ্ছিত বস্তুর দর্শন পাইবে, ভাই! শ্রীভগবানের কৃপাই এই আলোক স্বরূপ ও ব্যাকুলতাই এই আলোক জ্বালিবার উপকরণ, শ্রদ্ধার বিনিময়ে সদ্‌গুরু বা সৎসঙ্গীর নিকট হইতে এই উপকরণ লাভ করিতে হয়।

এক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছ যে শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে সৎসঙ্গ * করিলে সংসারের স্বরূপ ও নশ্বরতা উপলব্ধি হওয়ায় মোহ অপগত হয়, তখন প্রকৃত উন্নতি ও

* সৎসঙ্গের প্রকার:—সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎকর্ম্ম, সৎপ্রসঙ্গ ও সৎস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তা।

আনন্দের নিদান স্বরূপ শ্রীভগবানের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে, ফলে এই ব্যাকুলতা ক্রমে তীব্র হইলেই অজ্ঞানান্ধকারের আলোও জ্ঞাননয়নের দর্শনশক্তি স্বরূপ শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ হয় জানিও।

কিন্তু কেবল দেখিলেইত চলিবেনা, অমৃতময় সচ্চিদানন্দ ফলটির আস্বাদ না পাইলে অনন্ত তৃপ্তিলাভ কিরূপে হইবে? সুতরাং ঐ ফলটিকে লক্ষ্য করিয়া পদদ্বয়ের চালনা করা চাই, কর্ম্ম (সাধনা) ও বিশ্বাসই মনের এই পদযুগল কেননা পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন যেমন পদদ্বয় অগ্রসর হইতে পারে না সেইরূপ সাধনা ও বিশ্বাস পরস্পর মুখাপেক্ষী জানিও।

মন অগ্রসর হইল বটে কিন্তু ফলটিকে ধরিতে হইলে হস্তের আবশ্যক, ভক্তিই মনের এই হস্তস্বরূপ, বিশ্বাসযুক্ত সাধনার দ্বারা সচ্চিদানন্দ ফলের নিকটস্থ হইলে ভক্তিরূপ হস্ত দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়। এক্ষণে লাভের পরে আস্বাদ করিবার জন্য জিহ্বার আবশ্যক, প্রেমই মনের এই জিহ্বা, প্রেমের দ্বারাই মন সচ্চিদানন্দ ফলের আস্বাদ পাইয়া অনন্ত তৃপ্তিগর্ভ নিত্যানন্দ সম্ভোগ করে।

এক্ষণে সামঞ্জস্যের ভাব বুঝিলে কি? এই সামঞ্জস্য কেবল তিনিই লাভ করিতে পারেন যিনি প্রকৃতই শ্রীভগবানের জন্য ব্যাকুল। প্রকৃত সাধক জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির ভেদ দেখেন না।

ভাই! যদি সচ্চিদানন্দ ফল আস্বাদ করিয়া অনন্ত কালের তরে কৃতার্থ হইতে চাও তবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎসঙ্গ কর, সৎসঙ্গের শক্তিতে চিত্ত অনিত্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া নিত্যানন্দ লাভের জন্য যত ব্যাকুল হইবে, শ্রীভগবানের কৃপালোক সঞ্চার হইয়া তোমার জ্ঞান চক্ষুর দর্শন শক্তিকে ততই প্রখর করিয়া দিবে, হৃদয়ে সাধন শক্তির বিকাশ হইবে, পরে জ্ঞানের পূর্ণতা হইলে যখন শ্রীভগবানের চিদ্ঘনরূপ তোমার পরিশুদ্ধ মনের বিষয়ীভূত হইবে তখন বিশ্বাসযুক্ত সাধনার দ্বারা অগ্রসর হও, কিন্তু সাবধান! এই সাধন শক্তিতে অহংবুদ্ধি আরোপ করিও না, এ শক্তি শ্রীভগবানের, তাঁহার বিশেষ কৃপার সঙ্গে সঙ্গেই এই শক্তি সাধকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, ব্যাকুলতার দ্বারা ইহার বৃদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা ইহার পথ রুদ্ধ হয় জানিও।

ফলে এইরূপে যত অগ্রসর হইতে থাকিবে, শ্রীভগবানের অপার মহিমার বিমল জ্যোতিতে হৃদয় ভক্তিরসে ততই আপ্লুত হইবে এবং ক্রমে এই ভক্তির পূর্ণতা সম্পাদিত হইলে তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের রাজ্যে উপনীত হইবে, ভাই! এইরাজ্য নিত্যানন্দময়, এখানে চুম্বক সহবাসে লৌহের ন্যায় ভগবৎ প্রেমের অমিয় সংস্পর্শে মন চৈতন্যময় হইয়া নিত্যনব আনন্দ সম্ভোগ করে, এবং ইহাই সাধনার চরম লক্ষ্য; এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অকপট প্রাণে যিনি সাধন মার্গে অগ্রসর হন, তাঁহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী জানিও নচেৎ যে হতভাগ্য শক্তি সম্মানের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কপটতা রাক্ষসী তাহার হৃদয় নিহিত আধ্যাত্মিক রত্ন সকল অপহরণ পূর্ব্বক তাহাকে অধঃপাতিত করে।

চ। এই জন্যই কি বৃদ্ধ বয়সে অনেক খ্যাতনামা সাধকের অধঃপতন দেখা যায়? কিন্তু কথা হইতেছে এই যে যাহাদের কৃত্রিম সাধুতা কপটতার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের অধঃপতন তো প্রথম হইতেই আরম্ভ হয়, কিন্তু প্রথমে যাহাদের এরূপ দুরভিসন্ধি থাকে না, সাধন মার্গে অগ্রসর হইবার পরে তাহারা কপটতার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অধঃপতিত হয় কেন?

ম। ভাই! পতন অনেক রকমে হয়, প্রথমে কপটতা না থাকিলেও অনেকের সাধনগত ভ্রান্তিই পরে কপটতাকে অভ্যর্থনা করিয়া লয়, ফলে সাধক-নামধারীগণের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, এক শ্রেণীর লোক কেবল অনিত্য স্বার্থ সিদ্ধিরদিকে পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া সাধুতার অভিনয় করে ও কপটতার দ্বারা লোক বঞ্চনা পূর্ব্বক নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার কারণ হয়, ইহাদিগকে পাষণ্ডগণের অপেক্ষাও হেয় বলিয়া জানিও। আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্যই সাধন করে, পরে একটু শক্তি লাভ হইলেই প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে তাহা ব্যয় করিতে আরম্ভ করে এবং শক্তি ক্ষয় হইবার পরেও সঞ্চিত প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য কপটতার আশ্রয় লয় কিন্তু তথাপি ঐ প্রতিষ্ঠা পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে না পারিয়া আপনার বিষে আপনি জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

আর এক শ্রেণীর লোক সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে অস্থির হইয়া শ্মশান বৈরাগ্যের বসে ত্যাগী হইয়া পড়ে, কিন্তু বিচারযুক্ত ভোগের দ্বারা প্রবৃত্তি ক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই অহঙ্কারের দ্বারা এই ত্যাগ হওয়ায় সাধন ভিত্তি দৃঢ় হয় না, ফলে তাহারা এই কাঁচা ভিত্তির উপর সাধন মন্দির নির্ম্মাণ করে বলিয়া উহা প্রলোভন রূপ ঝড়ের একটি সামান্য বেগ সহ্য করিতে পারে না, কাজেই তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যদি তাহারা আশ্রমান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে অল্প পরিশ্রমে তাহাদের কার্য্য সিদ্ধি হয় কেননা মন্দিরটি পড়িয়া গেলেও উহার উপকরণ গুলির অধিকাংশ বজায় থাকে বলিয়া পুনঃ নির্ম্মাণের সুবিধা হয় কিন্তু এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যাহারা নিজের ভ্রম জনিত পতন বুঝিতে পারিয়াও কপটতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সাধারণের নিকট সম্মান বজায় রাখিবার বৃথা চেষ্টা করে, পরিণামে সেই আত্মবঞ্চকদিগের ঘোর অধঃপতন অনিবার্য্য হয়, ফল কথা এই যে, সরল পাষণ্ড অপেক্ষা কপট জ্ঞানাভিমানিকে জগতের ঘোর অনিষ্টকারি বলিয়া জানিও, তবে পরোক্ষ জ্ঞানই যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের মধ্যেই এই কপটতার আধিক্য দেখা যায়, বাক্যের সহিত তাহাদের কার্য্যের মিল থাকে না কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞানীর মধ্যে কপটতা প্রবেশ করিতে পারে না, অনিত্যের খাতিরে তাঁহারা নিত্য হইতে বিচ্যুত হন না, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য অটুট থাকে সুতরাং ভগবদ্ কৃপায় তাঁহাদের নিকট অবিদ্যার বিক্রম প্রতিহত হইয়া যায়, কিন্তু এরূপ মহাত্মা বড় অল্প এবং এই জন্যই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"ঘুড়ি লক্ষ্যে একটা কাটে, হেসে দেয় মা হাত চাপ্‌ড়ি"।

চ। সে দিন একজন সাধুর মুখে শুনিলাম যে কলিতে কেবল নাম গান করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়, অপর সাধনা করিতে হয় না।

ব্র। ভাই! কথাটি সত্য বটে কিন্তু অল্প লোকেই এই কথাটির প্রকৃত অর্থ বোধ করিতে পারে, মুক্তি ভিক্ষার জন্যও লোকে হরিনাম করে, আবার এই হরিনামে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, ফলে প্রথমতঃ জ্ঞানের দ্বারা ভাবের পরিশুদ্ধি করা চাই, ভাব শুদ্ধ হইলে সাধক ভগবল্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নামাশ্রয় পূর্ব্বক ব্যাকুল ভাবে যে প্রার্থনা করেন, তাহাকেই প্রকৃত নাম সাধনা বলে।

কলির প্রাবল্যবশতঃ এ সময়ে অহঙ্কারে সাধনা হয় না, কাজেই প্রার্থনা যোগে শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি লাভ করিয়া সেই শক্তি বলে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হয়, এবং এইরূপ অকপট সাধককে তিনি যে পথে লইয়া যান, সেই পথ তাঁহার পক্ষে প্রকৃত ও অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে, নচেৎ কাকাতুয়ার ন্যায় রাধাকৃষ্ণ বলিলে কোন ফল হয় না, কালরূপ বিড়াল দেখিলে এই শ্রেণীর লোক আর্ত্ত-নাদ করিতে করিতে তাহার বদনবিবরের অন্তঃর্গত হয়, ফলতঃ নাম করিতে জানা চাই, যাঁহারা নামের বিজ্ঞান অবগত নহে অথচ ভ্রান্তলক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া নাম করে, তাহারা নামের প্রকৃত ফল লাভ করিেত পারে না, কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তিও যদি পূর্ব্ব সুকৃতিফলে ভগবল্লাভের উদ্দেশে ব্যাকুল হইয়া নামাশ্রয় করে, তাহা হইলে ক্রমে সকল বিজ্ঞানই তাহার আয়ত্ত হয় জানিও, ফলতঃ ভাবানুযায়ি ফল লাভ হয় ; কেহ ভণ্ডামি করিয়া সাধারণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্ম, কেহ লোক সম্মানের জন্ম, কেহ ব্যাধি নাশের জন্য, কেহ বা আমোদের জন্ম, এইরূপে কত লোক কত ভাবে নাম করে, তীব্রতা থাকিলে ইহাতে তাহাদের অনিত্যও ক্ষণস্থায়ী ফল লাভ হইলেও প্রকৃত ফল হইতে তাহারা বহুদূরে অবস্থান করে, ফলে এই ভাব ভেদে ফল লাভের সম্বন্ধে ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল মহাজন বাক্য আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি বলিতেছি শ্রবণ কর।

১ম। কোটি কল্পকাল যদি করে কৃষ্ণনাম,
তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।

যাহারা অনিত্য বাসনার দিকে পূর্ণলক্ষ্য রাখিয়া হরিনাম করে অর্থাৎ হরিনাম করিলে সংসারের মঙ্গল হইবে, শরীর ভাল থাকিবে, লোকে ধার্ম্মিক বলিবে, যদি স্বর্গ থাকে তাহা হইলে সেখানে বিষয় ভোগের চরম সুখ পাইব ইত্যাদি অনিত্য বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা হরিনাম করে তাহাদের উদ্দেশেই এই বাক্য বলা হইয়াছে, বিশ্বাস থাকিলে এই সকল ব্যক্তি তাহাদের বাসনানু-যায়ি ফল লাভ করে বটে কিন্তু অনন্ত আনন্দের প্রস্রবন স্বরূপ ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া জন্মমৃত্যুর পারে যাইতে পারে না।

২য়। কলিযুগে হরিনাম সকলে করিবে,
নাচিবে গাইবে কিন্তু নরকে যাইবে।

ইহা ভণ্ড কপটিগণকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে, পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই যাহারা সাধুতার অভিনয় করে, পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা স্বরূপ যাহারা ধর্ম্ম পথগামি দিগের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার কারণ হয় অর্থাৎ যাহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইলে সাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সাধুসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি ক্ষুন্ন হইয়া যায়, তাহাদের পাপের ইয়ত্তা নাই, সেই ছদ্মবেশী পাপিষ্ঠগণই হরিনামে নৃত্যগীত ও ভাবাবেশ প্রভৃতির অভিনয় করিয়া নরকের পথে দ্রুত অগ্রসর হয়।

৩য়। একবার হরিনামে যত পাপ হরে,
মহাপাপী তত পাপ করিতে না পারে।

যাঁহারা নামের বিজ্ঞান অবগত আছেন, একথা তাঁহাদের উদ্দেশেই বলা হই-য়াছে. ইন্ধন ও বায়ুর সুসংযোগ হইলে একটু সামান্য অগ্নির দ্বারা যেমন একটা প্রদেশ দগ্ধ হইয়া যায় সেইরূপ অনুতাপ ও ব্যাকুলতার সংযোগ হওয়ায় এই সকল ব্যক্তির পূর্ব্ব সঞ্চিত মহাপাপ সকল নিমেষে ভষ্মীভূত হইয়া যায়, ভাই! জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রভৃতির বিকাশ হইতে পারে না, তুমি যাঁহাকে জান না; যাঁহার শক্তি, সর্ব্বব্যাপীত্ব ও দয়া সম্বন্ধে তোমার বোধ নাই, তাঁহার উপর তোমার ভক্তি বা বিশ্বাস কিরূপে হইতে পারে? বিশ্বাসাদি গুণ সকল নিশ্চয়াত্মিকা, সুতরাং নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানের জমি ভিন্ন এই সকল ফসল ফলিতেই পারে না, লোক সম্মান অর্জ্জনের জন্য মুখে ভক্তি বিশ্বাস দেখাইয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু মন জ্ঞান ভূমিতে উন্নীত না হইলে প্রকৃত উন্নতি হয় না, তবে এই জ্ঞান অপরোক্ষ হওয়া চাই, যদিও পরোক্ষ জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞানের আনন্দময় রাজ্যে যাইবার পথ স্বরূপ তথাপি যাঁহারা নশ্বর লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জ্জন করেন তাঁহারা অর্থ বা লোক সম্মান রূপ দস্যুর দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানের পথেই আবদ্ধ হইয়া পড়েন, সুতরাং এরূপ জ্ঞান অজ্ঞানের অপেক্ষা ভয়ানক, কিন্তু যাঁহাদের লক্ষ্য চৈতন্যাভিমুখীন্, চিদ্ঘন শ্রীভগবানকে দর্শন ও লাভ করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা পরোক্ষ জ্ঞানানুযায়ি সাধন করিয়া অপরোক্ষানুভূতির অমৃতাস্বাদ লাভ করেন, * অবিদ্যা সম্ভূত কোন

* ঈশোপ নিষদের ৯ ও ১১ শ্লোক ইহার প্রমাণ

বিঘ্নই তাঁহার পথরোধ করিতে পারে না, অর্থ সম্মানাদি নশ্বর বিষয় সকল উপযাচক হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিলেও তিনি উহা প্রভুর নিকট পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন তাহাতে অহংবুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বভাবচ্যুত হন না; জমিদারের নায়েবের নিকট কোন প্রজা অর্থ বা দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলে যেমন তিনি অর্থ হইলে খাতায় জমা করিয়া মনিবকে দেখান ও দ্রব্যাদি হইলে তাহা চাপরাসীর দ্বারা মনিবের নিকট পাঠাইয়াদেন, সেইরূপ প্রকৃত সাধকের নিকট অযাচিত ভাবে অর্থাদি আসিলে কর্ম্ম দ্বারা ও সম্মানাদি আসিলে চিন্তারূপ চাপরাসীর দ্বারা তিনি তাহা প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দেন, উহা চুরি করিয়া নিজের ভাবরূপ চাকরিটুকু নষ্ট করেন না।

ভাই! অনেক গোঁড়া বৈষ্ণব জ্ঞানের নাম শুনিলে লাফাইয়া উঠেন, ফলে ভগবৎতত্ত্ব না জানায় ভক্তি বিশ্বাসাদি তাঁহাদের অন্তরস্থ হয় না, মুখে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমে কপটতার পরিপোষক হয় মাত্র, কিন্তু ইহাও জানিও যে ব্যবহার ভেদে যেমন অগ্নির দ্বারা উপকার ও অপকার উভয়ই হয়, সেইরূপ জ্ঞানের ব্যবহার করিতে পারিলে উন্নতি ও অব্যবহারে অবনতি হয়।

যাহারা আত্মোন্নতির পিপাসায় আকুল হইয়া নাম গান করেন ঈশ্বর সাক্ষাৎকার যাঁহাদের নামাশ্রয়ের উদ্দেশ্য, ভগবৎ প্রেরিত সৎসঙ্গের সাহায্যে তিনিই নাম সাধনের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারেন ও সেই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কৃতার্থ হন, ফল কথা এই যে, অভাবে—অলক্ষ্যে নাম করিলে নামের প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না, নাম আকর্ষণির স্বরূপ, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমার নাম ধরিয়া কেহ ডাকিলে যেমন তুমি তাহার নিকটস্থ হও, সেইরূপ নামিকে লক্ষ্য করিয়া নাম করিলে তবে কার্য্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু যদি তুমি জানিতে পার যে অসদভিপ্রায়ে কেহ তোমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, তাহা হইলে যেমন তুমি ফিরিয়াও চাহ না, সেইরূপ ভাবের কাপট্য থাকিলে সর্ব্বান্তর্য্যামি ভগবান তাহা হইতে দূরে অবস্থান করেন। ফল পাড়িতে হইলে অগ্রসর হইয়া প্রথমে বৃক্ষ তলে যাইতে হয় তাহার পর ফলটিকে লক্ষ্য পূর্ব্বক আকুষি লাগাইয়া জোরে একটি টান মারিলে যেমন উহা হস্তগত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ফললাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া অকপট ভাবরূপ

বৃক্ষতলে যাইতে হয়, পরে ফলটিকে লক্ষ্য পূর্ব্বক নামরূপ আকৃষি লাগাইয়া তীব্র ব্যাকুলতার একটি টান মারিবামাত্র কার্য্য সিদ্ধি হয় জানিও, নচেৎ আকৃষি লইয়া রাস্তায় লাফাইলে যেমন ফল পাড়া যায় না, সেইরূপ অভাবে-অলক্ষ্যে কোটি কোটি নাম করিলেও কোন ফল হয় না।

জনসাধারণ কোন কোন অজ্ঞান ভক্তনামধারি ব্যক্তিকে নাম করিতে করিতে ভাবাবেশ প্রভৃতির অভিনয় করিতে দেখিয়া সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মনে করে, তাহাদের অবসাদ ও পতনমূলক সহস্র দোষ দেখিয়াও দেখে না, এবং সেই ভক্তনাম ধারিগণ ও কেবল একটু নাচিয়া গাহিয়া আপনাকে কলিপাবনাবতার জ্ঞানে অহঙ্কারে স্ফীত হন, ফলে ইহাতে আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন কোন পক্ষেরই ফললাভ হয় না, যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, যাঁহাদের লক্ষ্য কম্পাসের কাঁটার ন্যায় ভগবন্মুখীন তাঁহারা এই ব্যাকুল প্রার্থনামূলক হরিনামের দ্বারা শক্তিসঞ্চয় করিয়া সেই শক্তি বলে সাধনমার্গে অগ্রসর হন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে হরিনামের সহিত ধ্যান, ধারণা, তিতিক্ষা নির্ভরতা প্রভৃতির পূর্ণ সমাবেশ থাকে এজন্য নাম করিবার পরে আধ্যাত্মিক শরীরে স্ফুর্ত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইঁহাদের ভাবে অবসাদ ও গ্লানি সঞ্চার হয় না, ফলে তালের রস পাকে না চড়াইয়া ফেলিয়া রাখিলে তাড়ি হইয়া যায় এবং উহা পান করিলে সাময়িক মাদকতা জনিত স্ফুর্ত্তি হইলেও পরিশেষে শরীর অসুস্থ হয়, কিন্তু উহা পাকে চড়াইয়া চিনি প্রস্তুত পূর্ব্বক আহার করিলে যেমন শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করে সেইরূপ ভাবরস ফেলিয়া রাখিলে ক্রমে উহাবিকৃত হইয়া সাময়িক স্ফুর্ত্তির কারণ হইলেও পরিশেষে আধ্যাত্মিক শরীরকে অসুস্থ করিয়া ফেলে কিন্তু উহা ধ্যানের কটাহে ঢালিয়া যদি জ্ঞানাগ্নিতে চড়াইয়া দাও ও ধারণার হাতা দিয়া নাড়িতে থাক, তাহা হইলে উহা হইতে যে প্রেমরূপ চিনি বাহির হইবে তাহা আস্বাদ করিলে উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হইবে জানিও।

চ। তবে যে শুনিতে তাই শাস্ত্রে আছে, হেলায় নাম করিলেও ফল আছে।

র। ভাই! হেলায় হউক বা শ্রদ্ধায় হউক, প্রকৃত নাম করা চাই, যে ভাবেই হউক, অগ্নিকে স্পর্শ করিলেই উহা তোমাকে দগ্ধ করিবে, কিন্তু স্পর্শ করা চাই, ফলে হেলাতেও নামে তন্ময়তা আবশ্যক, হিরণ্যকশিপু, কংস প্রভৃতি

হেলাতে নাম করিয়া বিপদের পথ দিয়াও পরম সম্পদ লাভ করিয়াছিল সেই ভাবে তুমিও যদি নাম করিয়া তন্ময়তা লাভ করিতে পার, শেষে কৃতার্থ হইবে, নচেৎ প্রত্যহ শত শত কুকর্ম্ম করিয়াও একবার অশ্রদ্ধায় হরি বলিলেই যদি বৈকুণ্ঠ করতলগত হইল বলিয়া মনে কর তাহা হইলে তুমি বদ্ধ পাগল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কর্ম্ম ও ভক্তি।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাধনায় আপাততঃ পুরুষকার লক্ষিত হইলে ও উহা তাহা নয়, উহা মাত্র ভগবৎ কৃপারই ধাক্কা। জলে মৎস্য থাকিলে যেমন তাহার ঢেউদ্বারা জলে অল্লাধিক তরঙ্গ সমুত্থিত হয় তদ্রূপ ভগবৎকৃপা আসিলেই একটা আলোড়ন জন্মায়। এই আন্দোলনই সাধনা। উহা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিনা, কৃপা-শক্তির স্ফুরণে ইচ্ছাশক্তির সঞ্চালন ঘটে এবং সাধনার প্রয়াস জন্মায়। ভগবদু-পাসনা ভগবৎকৃপার আন্দোলন মাত্র, সুতরাং উহা সংকল্পদুষ্ট নয়। তদ্ভিন্ন সংকল্পাত্মক শুভাশুভ কর্ম্ম স্বার্থপ্রণোদিত বলিয়া গর্হণীয় বটে। সর্ব্ব শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে আমাদের থাকে কি? থাকে, স্বভাবে অভ্যাসহেতু দেহ ধর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট। ক্ষুধায় খাই, ঘুমে ঘুমাই ইত্যাদি। সে সব ঠিক্ ঘা শুকাইয়া গেলে ও যেমন একটু দাগ থাকে, সামান্য একটু চুলকানি ও থাকে তদ্রূপ। ইহাই বস্তুতঃ ভক্তির অপূর্ব্বাবস্থা। ভক্তি হৃদয়ের পীযূষ সম্পত্তি। আমি একাদশী করি, আমি নিরামিষ খাই, আতপান্ন খাই, আমি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগি, প্রাতঃস্নান করি, চক্ষু বুজিয়া এক প্রহর সন্ধ্যা করি, ভাবি আমি এসব করি

লোকে গায়, ভাল বলে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখি আমার চিত্ত পাষাণসম কঠিন, দ্রবে না, মধুর হয় না। চিত্তে দয়ার কোমলতা আসে না আমি যে রুক্ষ সে রুক্ষ।

এত সব করিয়াও বাস্তব আমি ভক্ত হইতে পারি নাই; এসব ভক্তির অঙ্গ হউক্ কিন্তু ভক্তি ফুটে নাই, চিত্তস্তনে পীযূষোদ্ভব হয় নাই, দেহ অমৃতসিঞ্চিত হয় নাই। ইহার নিগূঢ় হেতু এই যে চিত্তে ভাব স্ফূর্ত্তি পায় নাই বা রাধা-রাণীর কৃপা হয় নাই। কিন্তু ও সব কর্ম্মফলে চিত্ত সত্ত্ববিধৌত হইয়া ভাব কণার স্পর্শ পাইতে পারে।

অহঙ্কারকে বিদায় দিয়া দৈন্যকে সাধনের সহচর করিতে পারিলে, ভাব আসে। কে করিবে? কৃপায় করায়। ব্রজবনের গোপী-কুসুম সমাজে রাধা গোলাপ, ভাব উহার অনুপম সুগন্ধ। ব্রজে ফুটিয়াছিল, কালে তাহার সংগোপন ঘটিল। শ্রীনন্দনন্দন সে গোলাপের আতর প্রস্তুত করিয়া গায়ে মাখিয়া আনিয়া কলির জীবে বিলাইয়াছেন। সেই অপূর্ব্বতর ভাব-গন্ধ যাহার নাসাপুটে প্রবেশ করে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যাহাকে কৃপা করেন তিনিই চিত্তোদ্গত পীযূষরসে বিহ্বল ও আনন্দিত হন, তিনিই ভক্ত। পাষাণে, বজ্রে, মধুক্ষরে না, হৃদয় কুসুম হওয়া চাহি, তবে অনবদ্য, অপার্থিব, দেবদুর্লভ স্বাদু মধুনিস্যন্দিত হয়। ভাব মধুর কণিকা পানে ও কর্ম্মস্পৃহা তিষ্ঠে না। এতদবস্থ হইয়াও যিনি কর্ম্মসমরে নামেন তাহার নিশ্চয় পতন ঘটে, কারণ চিত্তের সেই সুন্দর ভাবরস কর্ম্মের ঘর্ম্মে লবণাক্ত ও দুষিত হইয়া যায় সেই জন্য শ্রীচরিতামৃতের উপদেশ,—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। লোকভয়ে সমাজ ভয়ে ভাবুক ও ভাবকে সম্পত্ত রাখিয়া আড়ম্বরে স্থান দেন। গুরুতর ভ্রম! চিত্তের দুর্ব্বলতায় ভীরুতায় এরূপ ঘটায়।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীহর বসু।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

৫ম সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে! সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে॥

যদুপতি হে! আমায় তোমার চাকুরি দাও—চাকুরি দাও। তুমি যাচাই করিয়া লইতে পার, এমন চাকর আর পাইবার নয়। তোমায় আমার চাকরগিরির পরিচয়টা দিয়া দিই। কতকাল তা কেউ বলিতে পারে না, সেই অনিরূপিত কাল হইতে আমি ছয়-ছয়জন মনিবের গোলামী করিয়া আসিতেছি। মনিব আবার কেমন? দুর্জ্জনের অগ্রগণ্য। ফরমাজও যেমন তেমন নয়; বাছা বাছা যত খারাপ, যত কুচুটে হইতে পারে। তা আমি তাদের আদেশ একটি দিনও অমান্য করি নাই; লজ্জা-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য তাহাদের কি জানি কি ধাতু

দিয়া গড়া হৃদয়, দিন রাত সমানে খাটাইয়াও তাহাদের হৃদয়ে একটু দয়ার উদ্রেক হইত না। ছয়জনের যে হয় একজন একটা না-একটা হুকুম করিয়া আছেই আছে। তার আবার জুলুমই বা কত? একরত্তি জিরাইয়া লইবারও অবকাশ পাওয়া ভার। তায় আবার এমন বেহায়া, এত করিয়া খাটাইলাম, না হয় কিছু পুরস্কার দিই; তা তো গেল দূরের কথা, কেবল কথা হইতেছে—খাটো, আর খাটো। আশ্চর্য্যের কথা বলিব কি, এত খাটাইয়াও তাদের আশা আর মিটে না; একই কাজের হাজার বার ফরমাজ! কাজে কাজেই সে কাজে বেজায় বেজার ধরিয়া গিয়াছে। এ বিনা-বেতনের চাকুরি যে কেন করিয়া মরিতাম, বুঝিতাম না। আজ তোমার কৃপায় আমার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া গিয়াছে। এখন আমি দিব্য নয়নে দেখিতে পাইতেছি যে, ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এ ছয়টা মনিবের কোনটাই ভাল নয়;—সব কটাই সমান। তা আমি যখন এত দীর্ঘকাল ধরিয়া একসঙ্গে ছয় ছয়টা দুর্দ্দান্ত মনিবের মন জোগাইয়া মিনিমাহিনার চাকুরী করিয়া আসিয়াছি, তখন আমার মতন ভৃত্য আর মিলিবে কোথায়? যে, হৃদয়হীন করুণাহীন লজ্জাহীনের চাকুরি করিয়া চাকুরীর হাত পাকাইয়া লইয়াছে, সে কি আর তোমার মত মমতাময় করুণাময়ের দাসত্ব করিতে পারিবে না দয়াময়? অবশ্য বলিতে পারো যে,—যে ছ্যাঁচড়া ছোট-লোকের গোলামী করিতে চিরঅভ্যস্ত, সে কি কখনও মন বসাইয়া ভদ্রলোকের ভৃত্যগিরি করিতে পারিবে? দুইদিন বেজার বোধ হইয়াছে, কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে; আবার একটু প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া গেলেই যেকে সেই,—আবার সেই তাদের জন্য ছটফটানি ধরিবে। তা ঠাকুর! যা বলো যা কও, আমি কিন্তু তোমার দোহাই দিয়াই বলিতে চাই, আমি আর দুই-নৌকায় পা দিয়া তোমার চাকুরি করিতে আসি নাই। আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণাগত। তাঁদের আমি একবারে ছাড়িয়াই তোমার দ্বারে আসিয়াছি। আমার একথা আমার মুখের কথা নয়—প্রাণের কথা—দেহ মন সকলের কথা। দেহযন্ত্রের যন্ত্রী তুমি, হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত দিয়াই তো দেখিতে পারো—তাহার সঙ্গে দেহ ইন্দ্রিয় সমস্বরে বাজে কি না? আর এক কথা, যে দুর্বৃত্ত মনিবের দাসত্ব ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহাদের কাছে আবার যাইলে কি আর তাহারা

আমায় রক্ষা রাখিবে? বলিতে কি প্রভু! কত বার ছাড়িব ছাড়িব মনে করিয়াও তাহাদের চাকুরি ছাড়িতে পারি নাই। কেন পারি নাই? তাহাও বলি। যখনই ছাড়িব ছাড়িব মনে করি। তখনই ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কেননা, তাঁহাদের অধিকার—ছাড়া নির্ভয় স্থান আর নজরে পড়ে না। তাই চুপিচুপি মনের কথায় ছাই চাপা দিয়া তাদের কাজেই লাগিয়া যাই। কিন্তু আজ কি জানি কি তোমার করুণা,—অথবা তোমার কিঙ্করগণেরই করুণা, আমি তোমার বা তাঁহাদের কৃপায় এমন একটি নির্ভয় স্থান দেখিতে পাইয়াছি, যেখানে তাহাদের পরাক্রম পরাভব পায়। সেই নির্ভয় স্থানই আমার তুমি, আর আমি,—আর সকল ছাড়িয়া সেই তোমারই শরণাগত। যদি দয়া করিয়া আপনাকে চিনাইয়াই দিয়াছ, তবে আরও একটু দয়া করিয়া আপন-দাসত্বে আমায় নিযুক্ত কর। দেখ, আমি তোমার মনের মত সেবা করিতে পারি কি না? ভয় নাই ভয় নাই, ভয়হারি! আমি সেবার বিনিময়ে সেবা ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনা করিব না। যাতনা তো সহাই আছে, যদি দিতে চাও যত ইচ্ছা দিতে পার, তাহাতে আর কাতরও হইব না। দাও দাও যদুপতে! তোমার চাকুরি দাও,—চাকুরি দাও।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

প্রার্থনা।

(ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মিশ্রিত।)

—০ঃ—

কে জানে মহিমা তব সর্ব্ব শক্তিমান্!
কি আকাশে, কি পাতালে, এ মর্ত্ত্য মাঝারে—
নদী কূলে, মরুস্থলে, সাগরে, ভূধরে,
কান্তারে, প্রান্তরে তব হয় অধিষ্ঠান।
কি অন্তরে, কি বাহিরে, দূরে কি অদূরে,
বিরাজিত ঘটে পটে, নাহি ব্যবধান।

কিন্তু কি বিষম ভুল জাগিছে অন্তরে,—
হইবে না পুনঃ দেখা, কলুষিত প্রাণ।
আছি আমি একধারে, তুমি যেন দূরে,
মায়ার বিশাল রাজ্য রয় মাঝে তার।
তব কমনীয় মূর্ত্তি হৃদে নাহি স্ফুরে;
হেরিছি চৌদিকে যেন গভীর আঁধার।
কৃপাময়! কৃপাকণা কর বিতরণ।
মায়াতম ভেদ করি, হেরি শ্রীচরণ॥

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

উপদেশামৃত।

(প্রেমময় শ্রী "পাগল হরনাথের" মধুর উক্তি সংগ্রহ।)

[শ্রীভাগবতচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত।]

—:০:—

ভক্তের বা সাধুদের কৃপা হইলে পাপীদের উদ্ধার হতে পারে, যেমন মেকি টাকা একলা চলেনা, তবে ভাল হাজার টাকার সঙ্গে চলে যায়।

প্রভুর অনেক officer আছেন, যাঁহারা জীবকে পরপারে লইয়া যান; কিন্তু নিতাইয়ের খাস তরিতে নিতাইয়ের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া অপর কেহই যাইতে পারেনা। নিতাইয়ের তরিতে পার হইলে, প্রভু তখনই যাহারা পার হইল, তাহাদের খোঁজ করেন ও নিকটে লইয়া যান।

প্রকৃতি ভাবাপন্ন না হইলে প্রভুর বাটীর একজন হওয়া যায় না। ব্রজের ভাব বুঝিতে গেলে, প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইতে হইবে, নচেৎ ব্রজের ভাব বুঝা যাবেনা।

প্রশ্ন। প্রকৃতি ভাবাপন্ন কি করিলে হয়?

উত্তর। প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইতে হইলে double মুসলমান হইতে হইবে অর্থাৎ মুসলমানেরা যেমন পুরুষাঙ্গ কিঞ্চিৎ কাটিয়া থাকে, সেইরূপ অংশটা

কাটা হয়েছে ভাবিতে হইবে। পুরুষাঙ্গ ব্যবহার করিলে প্রকৃতি ভাবাপন্ন হওয়া হবেনা।

প্রঃ। Double মুসলমান্ হইবার সহজ উপায় কি?

উঃ। নাম আশ্রয় করা।

প্রঃ। প্রকৃত নাম করা কখন হয়?

উঃ। যখন নাম করিতে করিতে নিজের সত্ত্বার লোপ হইবে, অর্থাৎ হাত পা আছে ইহা স্মরণ করিতে আধ ঘণ্টা সময় লাগিবে, সেই অবস্থায় নাম করা হইতেছে, বুঝিবে। প্রথমতঃ কেবল নাম করিয়া চল, ক্রমশঃ ঐরূপ হবে।

প্রঃ। নাম ও মন্ত্রে প্রভেদ কি?

উঃ। নাম ও মন্ত্রে কোন প্রভেদ নাই। মন্ত্র আর কিছুই নয়, প্রাণ-বল্লভের সঙ্কেত নাম। সেই নামটী অন্য কেহই জানেনা, কেবল প্রাণ বল্লভ ও তাঁহার প্রেয়সী জানেন। প্রাণ বল্লভ প্রেয়সীর সেই সঙ্কেত ডাকেতে সাড়াদিয়া থাকেন, যেমন স্বামী স্ত্রীর সঙ্কেত নাম।

প্রঃ। হাঁসি মুখ দেখলে কান্না পায় কেন?

উঃ। এই হচ্ছে ব্রজের ভাব, কান্না দেখ্‌লে হাসি পায়, ও হাসি দেখ্‌লে কান্না পায়।

প্রঃ। Animal passion (কাম) যায় কেমন করিয়া?

উঃ। Animal passion এর (কামের) নাশ হইতে পারেনা, তবে এই animal passion ই (কামই) পুড়ে পুড়ে প্রেমে পরিণত হয়; তাই animal passion এর (কমের) নাশ হওয়া ভাল নয়।

শ্রীমতী রাধারাণী নিকটে থাকিলে আর দূতীরূপ বংশী শ্রীকৃষ্ণের বদনে থাকে না।

"যাইবি দক্ষিণে বলিবি পশ্চিমে দাঁড়াবি পূবর মুখে" ইত্যাদি—

ইহার ভাবার্থ।—

"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা, আপনারে হবে সাবধান।"

বাঁ পায়ের তিনটা আঙ্গুলের তলা আমার নয়, এই পথই আমার দেহবাস ত্যাগ করিবার পথ। আমার দেহ যখন ৬৪ অংশে ভাগ হয়, তখন মহা-

পুরুষ ৬১ অংশ যোগ করিয়া বাকী ৩ খণ্ড খুঁজিয়া না পাওয়ায় পাহাড়ের নীচে হইতে অন্য তিন্ টুকরা আনিয়া পূরণ করিয়া ছিলেন; তাই এই খানে হাত দিলে ব্যাথা বলে বোধ হয়। অনেকবার তাঁহার ঘুমন্ত সময়ে ঐ স্থান চাপিয়া ধরাতে তিনি ফোঁড়ার ন্যায় ব্যাথা পাইয়া পা সরাইয়া লইয়াছেন;' আর পায়ের তলায় এই অংশই কাটা, চটা ও গর্ত্ত বিশিষ্ঠ, double মুখের কাছে যাইতে নাই অর্থাৎ মুখের উপর মুখ, যেমন রাগিলে হয়।

প্রভুর এক মুহূর্ত্তের কথা কেহই লিখিয়া শেষ করিতে পারেনা, তবে তুই প্রভুর দুই একটা কথা লিখিয়া কি ছেলে মানুষি করিতেছিস; লেখা তো হবেই না তবে মিছে অহঙ্কার আনিবে কেন। এই কথা ঠাকুর একদিন ভাগবতকে বলিয়াছিলেন, কারণ ভাগবত তাঁহার কথা বার্ত্তার দু' একটী লিখিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাতে ভাগবত দুই তিন দিন আর কিছু লেখে নাই; ঠাকুরের বিশেষ কৃপাভাজন শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে মহাশয় এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলেন, 'সবই আমাদের ছেলে মানুষি! যাহাতে আমরা আনন্দ পাই তাহাতে নিষেধ করিয়াছেন কেন?" ইহাতে তিনি বলেন "তোমাদের যা ইচ্ছা কর।"

প্রঃ। "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর" এইরূপ ভাব আমাদের কত দিনে হবে?

উঃ। নাম আশ্রয় করিলে একদিন, না, একদিন ঐ ভাব হবে, যেমন পেট হ'লে ছেলে একদিন না একদিন ভূমিষ্ঠ হবেই হবে, তবে কবে হবে, কেহই বলিতে পারেনা।

ছেলে মেয়েরা ভ্রান্তির ধ্বজা উড়াইয়া দেয়, বলিয়া দেয় রাত্রে স্ত্রীর সহিত কি করিয়াছিল। যদি পার হইতে চাও, পুকুর জলে পূর্ণ রাখ, তবে তো ভেলা দিয়া পার হইতে পারিবে অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রকৃত ভাল বাসিতে শিখ। ভাল বাসা বিহীন সংসার আর জল বিহীন পুকুর রাখা, এ উভয়ই সমান। ডাঙ্গা পুকুরে কি ভেলা দিয়া পার হওয়া যায়?

প্রঃ। ভাল বাসা শিক্ষা করিবার জন্য, বোধ হয়, বাউল সম্প্রদায়ীরা প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে তাহারা সকলই কি পার হইয়া যায়?

উঃ। বাউলেরা খুব কম উৎরায়, যে উৎরায় সে চাঁদের মতন নির্ম্মল হয়।

প্রঃ। কাম কিসে কম থাকে?

উঃ। প্যান্তো ভাত খাইলে কাম কম থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব তবে শ্রীমতীর দাসী হওয়া খুব কম সম্ভব। প্রবাস যজ্ঞের নিমন্ত্রণার্থ প্রেরিত নারদ একদিন বিনায় রাধা, ধা বাদ্য করিতে করিতে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেছিলেন, তাঁহার রাধা, রাধা শব্দ শুনিয়া পশু পক্ষীরা আনন্দে রাধা, রাধা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। যে বৃন্দাবন কৃষ্ণ বিহনে এতদিন ম্রিয়মান হইয়াছিল ও পশু পক্ষীরা কোনরূপ শব্দ করিতে বিরত ছিল, আজ তাহারা সকলে বৃন্দাবনকে আনন্দে পূর্ণ করিল। শ্রীমতীর সখীরা পশু পক্ষী বৃক্ষ, লতার এই অবস্থা দর্শনে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আগমন নিশ্চয় করিয়া শ্রীমতীকে জানাইয়াছিল; তাহাতে শ্রীমতী বলেন, কৃষ্ণ কখনই আসেন নাই, তাহ'লে আমার উঠিবার ও চলিবার শক্তি আসিত, বোধ হয় তাঁহার কোন ভক্ত আসিয়া থাকিবে, তোমরা শীঘ্র যাইয়া ইহার সন্ধান কর, ও সেই ভক্তকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ কর, নচেৎ আমার প্রাণ এখনই বহির্গত হইবে, এই হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তের প্রভাব।

পৃথিবীর যে কোন দ্রব্য দিয়া বন্ধন হউক না কেন, তাহা ছিন্ন করা যায়, কিন্তু অপার্থিব জল দিয়া বাঁধা কোন রকমে ছেঁড়া যায় না, অর্থাৎ চক্ষের জলের বাঁধন বড় শক্ত। তাই অধর চাঁদকে চ'খের জল দিয়া কেবল বাঁধা যায়।

সে প'চে গেছে অর্থাৎ যেমন বীজ মাটিতে পুঁতিলে কিছুদিন পরে পচিয়া গিয়া অঙ্কুর হয়, তেমনি আমাদের দাদার ও হইয়াছে অর্থাৎ তাহাতে কৃষ্ণ প্রেমের অঙ্কুর হইয়াছে।

যদি কেহ পণ্ডিত হইতে চান, চৈতন্যচরিতামৃত পড়ুন, যদি কেহ ঈশ্বর তত্ত্ব জানিতে চান তবে চৈতন্য চরিতামৃত পড়ুন, যদি কেহ রাধা কৃষ্ণ ও রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব জানিতে চান, তবে ঐ পুস্তক পড়ুন, চৈতন্য চরিতামৃত পুস্তকের মতন গভীর পুস্তক আর দ্বিতীয় নাই।

প্রঃ। গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা আমরা সকলেই

জানি, কারণ সে মন্ত্র সকল পুস্তকে ছাপা আছে, তবে গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র নেওয়ার প্রয়োজন কি?

উঃ। যেমন লালা মিশ্রিত পোকা, পাখীর মা তাহার বাচ্ছাদিগকে দিলে বাচ্ছারা সহজে তাহা হজম করিয়া থাকে ও তাহাতে তাহাদের দেহ পুষ্ট হয়, কিন্তু অপর কেহ লালা বিহীন সেইরূপ পোকা দিলেও তাহাদের কোন উপকার দর্শেনা, পরন্তু বাচ্ছাদের প্রাণ নাশের বিশেষ আশঙ্কা হয়, সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র না লইয়া পুস্তক হইতে মন্ত্র লইয়া সাধন করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না।

নিদ্রা ভঙ্গের পর, কুম্ভ কর্ণ রাবণকে বলিয়াছিলে, "যখন তুমি মোহিনী বিদ্যা জান, তখন তুমি অনায়াসে রাম মূর্ত্তি ধরিয়া সীতা সম্ভোগ করিতে পারিতে, সীতাকে হরণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না," তাহাতে, রাবণ উত্তর দেন "আমি মোহিনী বিদ্যা জানি সত্য কিন্তু মোহিনী বিদ্যায় কোন রূপ ধরিতে গেলে সেই রূপ চিন্তার আবশ্যক, তাই রামরূপ ধরিবার জন্য রাম মূর্ত্তির চিন্তার প্রয়োজন; ভাইরে, যখন রামরূপ চিন্তা করি, তখন রাজত্ব ও তুচ্ছ বলে মনে হয়, সামান্য সীতা সম্ভোগ তো দূরের কথা। এই জন্যই ভক্তেরা চিনি আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, চিনি হইতে চাহেন না।

অভয় দাদা বলিলেন, "ভাগবত, তুমি জুতা পায়ে মহা প্রসাদ লইতেছে কেন" "তাহাতে হরনাথ ঠাকুর অভয়কে বলিয়া ছিলেন "অভয় তোমার গায়ে চামড়া আছে, তুমি কেমন করিয়া মহা প্রসাদ খাইতেছ?"

এই কান্নার সংসারে যতদিন হেসে যায়, তত দিনই ভাল, কারণ সকলই কাঁদতে এসেছে, হাঁসা খুব শক্ত।

যোধপুরের মহারাজা তাঁহার রাণী মিরাবাইকে প্রায়ই সাধু সঙ্গে বাস করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—"রাণী, তুমি অন্তঃপুরে না থাকিয়া পুরুষ সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করাতে আমার মান্ ইজ্জত্ নাশ করিয়া আমার নাক্ কাটিয়া দিতেছ," মহারাজের এই কথা শুনিয়া রাণী উত্তর করিলেন "যখন তুমি জন্মাবধি একবার ও কৃষ্ণ নাম লও নাই, তখন আর তোমার নাক্ কোথায় যে আমি তাহা কাটিয়া দিলাম।"

চণ্ডিদাস গ্রাম্য দেবতা বাশুলির সাধনা করিলে, গ্রাম্য দেবতা তাঁহাকে প্রেম-শিক্ষা করিতে আদেশ করেন ও গ্রামস্থ রজকিনী রামী তাঁহার প্রেমের আশ্রয় স্থল বলিয়া দেন। এই আদেশ পাইবার পর চণ্ডিদাস ক্রমাগত ১২ বৎসর রামী-ধোবানী যে পুকুরে কাপড় কাচিত, সেই পুকুরে ছিপ্ লইয়া মাছ্ ধরিবার ভান্ করিয়া বসিয়া থাকিত, ইচ্ছা কোন উপায়ে প্রণয় স্থাপন করেন। রামী উঠিয়া গেলে, সেও উঠিয়া যাইত। এই রকমে বার বৎসর কাটিলে রামী হঠাৎ একদিন চণ্ডিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর, তুমি তো এতদিন রোজই মাছ্ ধরিতে আস, কিন্তু কৈ, এক্‌দিনও তো তোমাকে মাছ্ ধরিতে দেখিলাম না"।

তাহাতে চণ্ডিদাস বলেন, "আজ আমার জন্ম সার্থক, আজ আমার মাছ্ ধরা হ'লো" চণ্ডিদাস রজকিণীকে প্রণয়ের কথা বলিল ও তাহার পিছনে পিছনে তাহার বাটীতে গেল, এদিকে রামী স্বামীকে সব কথা বলিয়া দিল, তাহাতে রামীর স্বামী বিরক্ত হইয়া চণ্ডিদাসকে কাটিয়া ফেলিল ও তাহারা দুজনে চণ্ডিদাসকে খান্ খান্ ক'রে মাংসের টুক্‌রা গুলি একটী বাক্সে বন্ধ করিয়া বাঘের আহারের জন্য বাজারে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বিদ্যাপতি পথে জিজ্ঞাসা করিলেন "চণ্ডিদাস! চণ্ডিদাস! পিরীতি কেমন দেখিলে বল দেখি? চণ্ডিদাস বাক্সের ভিতর হইতে উত্তর করিলেন, "পিরীতি বড়ই ভাল তবে খান্ খান্ করে"।

* দীনের নিবেদন।

পরম প্রেমময় দাদা শ্রীহরনাথের সুধাসিক্ত "পত্রাবলী ভক্তি সাহিত্যে ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিশেষ আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার একান্ত অনুরাগী ভক্ত প্রেমিক সুজন তাঁহার "উপদেশামৃত" উপহার লইয়া ভক্তবৃন্দের সমীপে উপস্থিত। খর্জ্জুর বৃক্ষ, রসের ভাণ্ডার বটে; তথাপি উহার রস নির্গমনের জন্য আঘাতের প্রয়োজন হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে দাদার সহচর অনুচর, অনুরাগী ভক্তগণ তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন। বাবা ভাগবত (শ্রীভাগবত চন্দ্র মিত্র) তাঁহার উত্তর গুলি অতীব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং সুবিধা মত সে গুলি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। "উপদেশামৃত"—

কাতরোক্তি।

(১)

কই তুমি কোথা হরি, আর যে সহিতে নারি,
রিপুর উত্তাপে জর জর তনু মম।
সংসার ও বহ্নিকণা, ভুঞ্জি অনেক যাতনা,
পশিছে হৃদয়ে নিত্য অগ্নি শেল সম॥

এইরূপ বহুদিন ব্যাপী আয়াস লব্ধধন। উপাদেয় দ্রব্য একা আস্বাদনে তৃপ্তি লাভ ঘটে না—আরও দশজনকে উহার অংশ দান করিতে সহৃদয়জনের অভিলাষ হয়; তাই, বাবা ভাগবতের এ কল্যাণকর প্রয়াস।

দাদার উপদেশাবলী, কিরূপ মধুর, কিরূপ শিক্ষাপ্রদ, কিরূপ উচ্চভাবপুর্ণ, কিরূপ চিত্তাকর্ষক, মলিন হৃদয়ের কলুষ কালিমা নাশক, সন্তপ্ত চিত্তের কিরূপ আনন্দ বর্দ্ধক, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। তাঁহার উপদেশে কোন কষ্ট কল্পিত কথা নাই—সহজ সত্য কথা স্বতঃই নিঃসৃত হইয়াছে। এক্ষণে, যাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ভাগবত বাবার এ আয়োজন, তাঁহাদের নিকট উহার সমাদর হইলেই, তিনি (সংগ্রাহক) শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন। শ্রীম—কথিত পরমহংস দেবের উক্তি মালার ন্যায়—ভা—কথিত সূক্তিমালা কিছু পরিমাণে জগতের হিত সাধান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

আকাশ হইতে পতিত বৃষ্টি, নির্ম্মল পাত্রে সঞ্চিত হইলে বড়ই শোভণীয় হয়; বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও এই মণি কাঞ্চনের শোভা পরিদৃষ্ট হইতেছে। দাদার উপদেশ-বাণী, আবিলতা পরিশূন্য বৃষ্টির ন্যায় পরিশুদ্ধ,—বাবা ভাগবতের হৃদয়া-পেটিকাও শারদীয় জোৎস্নাপূর্ণ যামিনীর ন্যায় নির্ম্মল। প্রফুল্ল, সুগন্ধি কুসুম উপযুক্ত পাত্রে অবচয়িত। হে ভক্তগণ! প্রসূনের অপরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া—উহার সৌরভ গ্রহণ করিয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন করুন—প্রাণ শীতল করুন—চিত্তের পবিত্রতা বৃদ্ধি করুন। উপদেশামৃত শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে; আমরা তৎপূর্ব্বে উহার কিয়দংশ "ভক্তির পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

(২)

কত আশে ভেঙ্গে গ'ড়ে, উপনীত তব দোরে,
সুধাতেছি তোমা প্রভো! হ'য়োনা বধির।
হের ওই আসে পুন, দহিবারে প্রাণ মন,
আর্ত্তেরে অভয় দানে করহে সুস্থির॥

(৩)

ওই দেখ যায় দেখা, সংসার পাবক শিখা,
অকালে পুড়িছে অহো! গৃহী জন যত।
একিরে কালের গতি, তবু মানবের মতি,
ধায় তারে আলিঙ্গিতে হ'য়ে কেন মত্ত॥

(৪)

বুঝেছি কেতক পাশে, অলি যথা মধু আশে,
আনন্দে মাতিয়ে ধায় গুণ্ গুণ্ রবে।
শেষে কিন্তু হয়ে সারা, ছুটা ছুটি করে তারা,
হস্ত পদাক্ষি তাদের বদ্ধ হয় যবে॥

(৫)

যুবক যুবতী তথা, না বুঝি সংসার প্রথা,
দিতেছে অনলে ঝাঁপ বড় আশা করি।
সে আশা না পুর্ণ হতে, অৰ্দ্ধ দগ্ধ শরীরেতে,
চারি ধারে ছুটে বলে, "কোথা শান্তি বারি"॥

(৬)

হয়ে যবে কুতুহলী, যবনিকা অল্প তুলি,
দেখি হে প্রভু, সংসার নাটকাভিনয়।
কত যে যাতনা হেরি, সন্তাপিত নর নারী,
ডাকিছে করুণ স্বরে তোমা দয়াময়॥

(৭)

সংসার.সমরাঙ্গনে, জয়ী হেরি অল্প জনে,
আলিঙ্গনে তারে কভু মন নাহি ধায়।
নিদাঘার্ত্ত মরুভূমে, উত্তপ্ত সিকতা ধূমে,
অন্ধ-ভূত, দগ্ধ প্রাণ তিষ্ঠিতে না চায়॥

(৮)

যে জনে শুধাই আমি, থাকি মাঝে রঙ্গভূমি,
কি শুনিলে, কি কুড়ালে, কিবা রঙ্গ সেথা।
সমস্বরে এক বাণী, সকলে কহিছে শুনি,
কুড়াতেছি হেথা আসি সুধু মনোব্যাথা॥

(৯)

ভেবেছিনু মোরা হায়, এ আগার শান্তিময়,
প্রেম, শান্তি, ভালবাসা লভিব যতনে।
হায়রে বিধির বিধি, হারায়েছি আশা নিধি,
সম্বল মোদের ক্রীড়া নিত্য দুঃখ সনে॥

(১০)

কর্ম্মের বিকট ফলে, শ্মশানের চিতা জ্বলে,
দাউ দাউ ধূ ধূ রবে হৃদে অনিবার।
দূরেতে পলাও তাই, . হেথা আসি কাজ নাই,
ভুলিওনা বাছা, হবে নেত্রনীর সার।

(১১)

কেহ দীর্ঘ শ্বাস ফেলি, নিজ দুঃখ কথা বলি,
আপনার পরিচয় দিতেছে আপনি।
কহে তপ্ত গৃহ স্বামী, কলুর বলদ আমি,
সংসার না লাগে ভাল, কহিছে গৃহিনী॥

(১২)

সংসারালিঙ্গন হেন,　　　　নাহি চায় মন যেন,
দুর্গমে না পশি নাথ! সুগম ছাড়িয়া।
বিষয় বাসনা ত্যজি,　　　　কবে সব অসার বুঝি,
পাশরিব যত ক্লেশ স্নিগ্ধ হবে হিয়া॥

(১৩)

নহি আমি সুখাকাঙ্ক্ষী,　　　　পুন নহি দুঃখাকাঙ্ক্ষী,
সুখ দুঃখ বিজড়িত অনিত্য সংসার।
দেখো কিন্তু দয়াময়!　　　　উপজিছে বড় ভয়,
কৃপা করি করো মোরে ভবার্ণবে পার॥

শ্রীচুনী লাল চন্দ্র।

শ্রীশ্রীগৌরপদে।

"জয় জয় শ্রীগৌরহে জয় নিত্যানন্দ।
জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
ধন্য ধন্য গৌর দয়াধার।
নিজ নামে করি তরি,　　　　নিজেই হয়ে কাণ্ডারী,
পাপীসব করিল উদ্ধার॥
দায়াময় কল্পতরু,　　　　জগৎজনার গুরু,
বিনামূল্যে প্রেম যেচে দিল।
প্রেমিক আছিল যাঁরা,　　　　হেন প্রেম পাইল তাঁরা,
সুধাসার রস আস্বাদিল॥
মহাপাপী ছিল যাঁরা,　　　　নাহি উদ্ধারিত তাঁরা,
নাহি ছিল গতির উপায়।

দয়াময় দয়াকরি, দ্বারে দ্বারে ঘুরি ঘুরি,
যেচে নাম উদ্ধারে সবায়॥
কেবা আছে হেন জন, যেচে দেয় প্রেমধন,
গৌর বটে দয়ার সাগর।
যে প্রেমেতে চতুর্ম্মুখ, আর মুগ্ধ পঞ্চমুখ,
হেন প্রেম দিল প্রেমাকর॥
গৌর বিনে কেবা আর, উদ্ধারিত এ সংসার,
পাপেতে জগত হৈত পুর।
ভাগ্যে গৌর আইলধরা, তেঁই রক্ষা পাইলধরা,
ধরা(র) পাপ ধরা হৈল দূর॥
কে বুঝে গৌরের খেলা, অশেষ তাঁহার লীলা,
দেয় কোল ব্রাহ্মণ চণ্ডালে।
কেবল নামেতে মত্ত, পাইয়া পরম তত্ত্ব
জগৎ মাতায় হরি বোলে॥
জাতির বিচার নাই, হরিনাম লয় যেই,
সে বৈষ্ণব সে তার সংসার।
নামের মহিমা যত, আমি তাহা কব কত,
হরি নিজ নামে মাতুয়ারা॥
হায়রে কি সুধার নাম, শ্রীগৌরাঙ্গ গুণধাম,
ধরায় আনিয়াদিল ঢেলে।
নাচে করতালি দিয়ে, হাসি কাঁদি লুট দিয়ে,
সুধাপান করিছে কাঙ্গালে।
পাঠান বৈষ্ণব হৈল, সবে হরি নাম লৈল,
শমন সহজে পায় ভয়।
নাম বিগ্রহ স্বরূপ, তিন হয় একরূপ,
তিনিইত চিদানন্দ হয়॥

নামে কৃষ্ণে নাহি ভিন্ন রস মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্য,
সর্ব্ব শক্তি পূর্ণ দয়াময়।
মায়াগন্ধ ত্যাগি তিনি, নিত্য মুক্ত চিন্তামণি,
নাম রূপে হন আবির্ভূত।
হেন নাম কেবা নিত, যদি গৌর না আনিত,
নামে জীব না হইত রত॥
ইন্দ্র গৌর পায়ে পড়, হরিনাম নাহি ছাড়,
হরি বোল বলরে সবাই।
চৈতন্য নিতাই বোল, বল বল হরিবোল,
ইহা বিনা গতি আর নাই॥

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য।

বিভু-গীত।

—:০:—

(১)

তার হে দীননাথ, হইলাম অনুগত,
মায়াজালে বদ্ধ আছি পিঁজরের পাখী মত।
ডাকিতেছি সকাতরে, কৃপা কর কিঙ্করীরে,
পড়েছি বিষম ফেরে, মায়ারূপ বন্ধনে কত॥
চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ, সদৃশ মত্ত বারণ,
না শুনে তারা বারণ, কুপথে ধায় সতত।
তার হে ভব দুস্তরে, প্রাণ হারাই তার তীরে,
ভ্রমিতেছি চিন্তাকরে, থর থর হয়ে ভীত॥

(২)

ত্রাণকর মোরে হরি, হয়েছি শরণাগত,
কৃপা-গুণে তারিতেছ পাপীতাপী কত শত।
প্রভো! আমি জ্ঞানহীনা, অকিঞ্চন অতিদীনা,
ধর্ম্মহীনা পাপে লীনা, শান্তিহীনা অবিরত॥
কত আর স'ব ত্রাতা, কারে বলি দুঃখ কথা,
কে মোর বুঝিবে ব্যাথা, কে আছে মোর ব্যাথিত।
প্রভু তুমি পরিত্রাতা, আনাথের শান্তিদাতা,
তব পদে মন কথা নিবেদি হে আছে যত॥

দীনা—শ্রীমতী কুসুম কুমারী দেব্যা।

কর্ম্ম ও ভক্তি।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাত তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বং প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ গীতা।

কেহই ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। সকলেই প্রকৃতি গুণে অবশ হইয়া কর্ম্ম করেন। মানবের জীবন লক্ষ্য ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ফলাতীত পঞ্চম পুরুষার্থ বা ভগবৎপ্রেম। কৃষ্ণে আত্যন্তিকী মমতার নাম প্রেম। প্রেম ভক্তির উত্তমাবস্থা, কারণ ভক্তিতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব মানিতে হয়, প্রেমের অবস্থায় অন্যরূপ প্রেম সঞ্চারে ঈশ্বর বিষয়ে জীবের ধারণা এইরূপ, যথা—

আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

যে ভক্ত নিজকে বড় মনে করে, এবং আমাকে (ঈশ্বরকে) সম কিম্বা হীন (ছোট) মনে করে, আমি সেই ভাবে (আমাকে যে সমান বা ছোট জ্ঞান করে ভক্তের এই ভাব দ্বারা) তাহার (সেই ভক্তের) অধীন হই; এই ভাবই প্রেম বা শুদ্ধ ভক্তি নামে অভিহিত হয়। মানবের একমাত্র লক্ষ্য এই শুদ্ধ ভক্তি বা প্রেম। কৃষক পক্ক শস্য প্রাপ্তির মানসে ভূমির চাষ আবাদ ও আনুষঙ্গিক অপরাপর সকল কর্ম্ম সাধন করে। সেইরূপ শুদ্ধ ভক্তির লাভোদ্দেশে যে যে অনুকূল কর্ম্ম প্রয়োজনীয় তত্তৎ জীবের করণীয়—কর্ম্ম। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সঙ্কেত সন্ধানে নিশ্চিত হয়। লক্ষ্য ঠিক সাব্যস্ত, দেদীপ্যমান থাকিলে কর্ম্মভ্রম ঘটে না। ভক্ত্যনুকূল কর্ম্ম মাত্র সাধু পুন্য, তদিতর সমস্ত পাপ ইহা নিশ্চিত ধ্রুব।

লৌকিক, সামাজিক ও দেশগত জীবন-লক্ষ্য-স্রোত যে ভাবে প্রবাহিত লক্ষিত হইতেছে, উহা মানবকে অযথা প্রায়ই ভ্রাম্যমান, পথভ্রষ্ট করিতেছে। জীবনের উক্ত সিদ্ধ লক্ষ্য সর্ব্ববাদি-সম্মতি ক্রমে যে দিন স্থিরীকৃত ও অনুসৃত হইবে, সে দিন হইতে জগতে অভিনব শাশ্বত মঙ্গল ধারা প্রবাহিত হইবে। দেশের দুর্দ্দিন, জীবনের সারোদ্দেশ্য কেহ আগে জানিয়া লন না। কোন্‌দিক যাইতে হইবে অনবগত, সুতরাং জীব ভবসমুদ্রের তুঙ্গতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া ফাঁপর হইতেছে, হাঙ্গরের (যমের) মুখে পতিত হইতেছে। পাঠ্যাবস্থায় বালক বালিকাগণ বিদ্যার্জ্জন করেন কিন্তু উহার পরিণাম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি একথা সতত পূর্ব্বাবধি চিত্তে উদ্ভাসিত ও প্রকট থাকা চাই।

শ্রীভগবানের শ্রীমন্দির চূড়া ওই যে দৃষ্ট হইতেছে, তদুপরি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কেবল আমাদিগকে ভয়সঙ্কুল জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ঐ চূড়াগ্রপানে দৃষ্টি সংলগ্ন থাকিলে মন ঝুলিয়া শূন্য দিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হয়; তাহাতে জলস্থলের বিঘ্নবিপদ জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। শূন্য দিয়া ফাঁকে চলিয়া যাওয়ার নাম সংযত-চিত্ততা। গন্তব্য স্থলে উপনীত হইবার প্রয়োজনীয় বস্তুনিচয় মাত্র বাছিয়া সম্বল করার নাম সংযম। সংযম বিধি ও করণীয় কর্ম্মের তালিকা শাস্ত্রে গ্রথিত আছে।

বাল্যাবধি ক্রমিক তদনুষ্ঠান আমাদিগকে শুদ্ধভক্তিতে পৌছাইয়া দেয়; কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমরা সে সব এককালে উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছাচারে

ডুবিয়া পড়ি, পরে অযথা সময়ে হায় হায় করিয়া শিরে করাঘাত করি। আমাদের ঘোর দুর্দ্দিন, ভগবৎকৃপায় বঞ্চিত, তাই বলিয়াই নাকি ওরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হয় না। ভজন-পদ্ধতি-সূত্র জন্ম ও মৃত্যুকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। জীবন আদ্যোপান্তই ভজন, ভোজন নয়। আগে ভোজন করি কালে ভজন করিব এ কথা অর্থহীন। ভজনই জীবন, যদি ভোজন করিতে হয়, ভজনের জন্যই। আমি যে বাট্‌না বাটী, অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিবার জন্যেই। অন্নই লক্ষ্য; জলাহরণ, তণ্ডুলধাবন প্রভৃতি সমস্তই অন্নপ্রস্তুতের অনুকূলে, আনুষঙ্গিক। অন্ন রাঁধিতে হইবে ভাবিয়া কেহ ছাদে উঠিয়া গাছের গোটা গণে না। আমরা কিন্তু তাহাই করি, কারণ আমাদের লক্ষ্য অনির্ব্বাচিত, অপক্ক। লক্ষ্য পক্ক করিয়া দিবার জন্যই গুরুর প্রয়োজন। বার্দ্ধক্যে গুরুকরণ হইলে সব নিষ্ফল। মন্ত্রগুরু এক, কিন্তু শিক্ষা গুরু বহুমূর্ত্তি। সুকুমারমতি বালক বালিকার জন্যে পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, বিদ্যালয়ের গুরু শিক্ষকগণ সকলেই তাহাদের শিক্ষাগুরু। তাঁহাদের মুখ্য কর্ত্তব্যজীবনের সার-লক্ষ্য-সহরটী মনশ্চক্ষুর সাক্ষাতে জীবন-ম্যাপ হইতে দেখাইয়া দেওয়া। নচেৎ মনুষ্যত্ব জন্মাইবার আশা দুরাশা মাত্র, ভস্মে ঘি ঢালা মাত্র।

ইদানীং ছোট ছোট বেলা পিতামাতা বালককে শিক্ষা দেন, "পড় পড়, না পড়্‌লে খাবে কি ক'রে?" অর্থাৎ উঠতে বলেন না, কেবল পড়্‌তে বলেন। একথা কেন বলি, তাহার হেতু এই ঃ—বালকের কোমল চিত্তে পিতামাতা গুরুজন ওরূপ উক্তি দ্বারা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য যে অর্থ, টাকা পয়সা, তাহাই সুগভীর মুদ্রিত করিরা দেন। অনর্থকে অর্থ দেখাইয়া তাঁহারা বালকের জীবনমূলে কুঠারাঘাত করেন। হায় কি দুর্দ্দশা! কি দুর্দ্দিন!! বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ অনেকেই এক প্রকার নাস্তিক, ঈশ্বরের বড় একটা ধার ধারেন না। ব্যাকরণ শাস্ত্রাদির নাড়াচাড়া নিবন্ধন, ইংরেজী শিক্ষিত চেয়ে, পণ্ডিতগণের চিত্ত সমধিক নীরস। ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন। চিত্ত নীরস হইয়া পড়িলে ভক্তি-ধর্ম্ম-কুসুম ভাল বিকশিত হয় না। যাহাদের হস্তে বালকের জীবন গঠন ন্যস্ত, তাঁহারা যদি দগ্ধ, রসহীন, ঈশ্বর স্মরণ-মনন-বিহীন, আচার ভ্রষ্ট, দিশাহারা হয়েন, তবে তাঁহাদের দ্বারা বালকের ভাবিকল্যাণবীজ রোপিত, অঙ্কুরিত, পরিপুষ্ট ও বিবর্দ্ধিত হইবে আশা করা যাইতে পারে কি?' পরিষ্কার

দীক্ষায় শিক্ষা পলায়মানা। মধ্যে মধ্যে আমরা সদাচারপরায়ণ শিক্ষক দেখিতে পাই। ইহা আমাদের দেশের ভাবী ভাগ্য সূচনা করিতেছে। হাকিম (বিচারপতি) ও শিক্ষক ভক্ত (পাদরী) হওয়া যেমন শুভঙ্কর এমন শুভঙ্কর আর জগতে কিছু নাই। সর্ব্বদেশেই এতুটি প্রধান কল্যাণ বৃক্ষ।

ব্যবসায়াত্মক কর্ম্ম, ভক্তি প্রতিকূল। উহা নানা অনর্থ আনিয়া দেশ মজায়। "ব্যবসায়" উচ্চারিত মাত্র স্বার্থের কাংস্য যন্ত্রে আঘাত দেয়। প্রবৃত্তির ও বুদ্ধির নীচতারূপ পাতালে যাইবার প্রশস্ত পথ ব্যবসার তুল্য আর কিছু নাই। ব্যবসায় "অহং" লইয়া ব্যস্ত। অহঙ্কার থাকিলে পরগুণ লক্ষিত হয় না; তন্নিবন্ধন, চিত্তে দৈন্য জাগরিত হয় না। গুণগ্রাহিতায় লোককে পরগুণে বিমুগ্ধ করে এবং নিজ নিষ্কিঞ্চনতার উপলব্ধি জন্মায়। জগতে পারস্পরিক ব্যবহার সংবাদ নিষ্কিঞ্চনতার তারে যাতায়াত করিবে। এরূপ না হইলে জীব জগতের সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা পরিরক্ষিত হয় না। নিষ্কিঞ্চনতার প্রণোদনে আমরা যে সব কর্ম্ম করি, তাহা ঠিক অমৃতময়, ভক্তির অনুকূল।

চন্দ্র-শিশির-সেকে কুমুদ বিকাশ পায়; ভক্তি-কুমুদ, উহাতে তাপ সহে না। তাপাশঙ্কায়ই কুমুদ শুকায়। চিত্তক্ষেত্রে ভক্তি-লতার পোষণ করা অতীব কঠিন, বড় সাবধান হইতে হয়। কিন্তু ঘোর বিরোধ দেখিতেছি—কর্ম্মসংঘট্টে বড় গোল। ভক্তি বালিকা শিশুটী বইয়া কোথায় বাস করিবে, কোথায় পালাইবে স্থির করা দুরূহ। মহাশয়! ঘোর জীবন সমস্যা, কেন দেখুন ঃ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিবঃ সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীহরির নাম গুণ, লীলা চরিত কীর্ত্তন করাই জীবের এক মাত্র কর্ম্ম। কারণ এস্থলে "সদা" শব্দে ইহাই ধ্বনিত হয়। অন্যবিধ কর্ম্মনিচয় দৃষ্টতঃ থাকিলে ও সে সব কীর্ত্তনেরই আনুষঙ্গিক মাত্র। আবার "সদা" শব্দ প্রয়োগের অর্থবল এরূপ ও দর্শান যাইতে পারে যে, কীর্ত্তন-কালে তৃণাদপি সৌনীচ্য ইত্যাদি অবলম্বন করিবে। হাত নাড়ায় যেমন স্বাধীনতা দেখি, কাণ নাড়ায় তেমন নয়। অর্থাৎ আমরা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কাণ নাড়িতে পারি না। শিকারী কুকুরের কর্ণ দোদুল্যমান। শিকারী কুকুর স্বেচ্ছায় কাণ নাড়িতে পারে। সর্ব্বকালের জন্য যিনি তৃণাদপি সৌনীচ্য রূপ শিকারে

অভ্যস্ত নহেন, কাণ ঢুলিয়া পড়ে নাই, তিনি "এখন হরি সঙ্কীর্ত্তন করিব সুনীচ হই" এমন ভাবিয়া সুনীচ হইতে পারেন না। বস্তুতঃ অমানিত্ব, মানদত্ব প্রভৃতি জীবের নিত্যস্বভাব, তদ্‌ভ্রষ্টতাই আমাদের পতন ও নামে অনধিকার ঘটাইয়াছে। এখন প্রশ্নোত্তর উপস্থিত ঃ—আমরা সুনীচ, আমানী, মানদ কাহার প্রতি হইব? ঈশ্বরে, কি ভক্তে, কি সর্ব্বজীবে? ঈশ্বরে সুনীচ হওয়া চেয়ে ভক্তে সুনীচ হওয়া তদধিক কঠিন, ভক্তে সুনীচ হওয়া চেয়ে সর্ব্বজীবে সুনীচ হওয়া পুনশ্চ ততোধিক কঠিন।

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"

একি ভক্ত সামাজে, না সর্ব্বজীব মণ্ডলে? আমার এসব বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহা ক্রমে ব্যক্ত করিতেছি।

ক্রমশঃ

কালীহর বসু।

শিবরাম।

—ঃঃ০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(২)

শিবরামের রচিত "গনেশ জননী প্রসঙ্গ," রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক গান 'তত্ত্ব সঙ্গীত' ও রামায়ণ প্রভৃতি কয়েক খানি ক্ষুদ্র-বৃহৎ পুঁথি আমরা অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। তাঁহার রচিত অনেক কবিতা বর্ষার জলে ভিজিয়া নষ্ট এবং কতক বা কীট-দষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই।

শিবরামের 'রামায়ণ' অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সহিত উহার ভাষা গত কোন মিল নাই। আকারে কৃত্তিবাসী রামায়ণের চতুর্গুণ বলিলেও চলে। কেবল হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানকে সপ্ত কাণ্ডের এক কাণ্ড বলিলেও হয়। আমরা সুবিধা অনুসারে রামায়ণের বিষয় আলোচনা করিব।

তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তক গুলির ২।৪টী কবিতা ও গান পাঠক বর্গকে উপহার দিতে অদ্য প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গিরিরাজ, ভোলানাথের সহিত গিরিজার বিবাহ দিয়া জামতা সহ কন্যাকে গৃহে আনিয়াছেন। নগেন্দ্র-নন্দিনীর রূপের ছটায়, দশদিক আলোকিত, কিন্তু তাঁহার যোগ্য বর কই? যোগীন্দ্র-মোহিনীর রূপের পার্শ্বে যোগীন্দ্রের রূপ স্তিমিত,—নিস্প্রভ; যেমন শশধরের বিমল ছটায় ক্ষুদ্র নক্ষত্র দীপ্তিহীন। দম্পতির রূপের এই অসামঞ্জস্য দর্শনে সখীগণ কি বলিতেছেন, কবি শিবরামের ভাষায় তাহা শুনুন।

"গিরি পুরবাসী, যতেক রূপসী, কুতূহলে আসি,
ঘেরিল বরে।
বলে বর কৈ, কেহ বলে ঐ, দেখ দেখ সই,
প্রবীণ হরে॥
আহা মরি মরি, যাই বলিহারি, হিমালয় গিরির,
নয়ন আছে।
বেছে বেছে বর, এনেছে ভূধর, রূপে বাড়ী ঘর,
আলো হ'য়েছে॥
মাথা ভরা জটা, তামা পারা ছটা, বর্ণ খানা কটা,
ধুতুরা কাণে।
শাঁখের কুণ্ডল, করে ঝলমল, গলে হলাহল,
দেখ নয়নে॥
পাকা গোঁপ দুটী, কিবা পরিপাটী, ডাগর দাড়িটী
কথাতে নড়ে।
দেখ দেখ সখি, বাঁকা বাঁকা আঁখি, দুইটী ভুরু কি,
ঢাকিয়া পড়ে॥
ধুতুরা ভোজন, রহিত চেতন, চেয়েছে যেমন,
কপাল পানে।
কি গড়িল ধাতা, বামে ঢলা মাথা, হাসে কি কাঁদে তা,
সেই সে জানে॥

হাঁড়ি পারা পেট, চাইতে মাথে হেঁট, সকলের জেঠ,
বয়স পারা।
শিঙ্গা ও ডম্বুর, বাজায় মধুর, বুড়া রসে চুর,
ভাবেতে ভরা॥
পরে বাঘ ছাল, গলে হাড় মাল, সকল অঙ্গ কাল,
ত্রিকাল গেছে।
কিবা পরিপাটী, ভিক্ষা কর্ম্মে খাটী, কাঁধের ঝুলটী,
কাঁধেতে আছে॥
বাহন বলদ, যেমন জলদ, গতির শবদ,
সঘনে করে।
একি অদ্ভুত, বরযাত্র ভূত, যেন যম দূত,
চৌদিকে ফিরে॥
নারদ ঘটক, কোন্দল যোটক, কথার চটকে,
গগন ফাটে।
বাজ্য কক্ষ গাল, দানা ধরে তাল, নন্দী মহাকাল,
আছে নিকটে॥
হেদেগো মেনকা, আসি কর দেখা, দিয়ে ঝুড়ি ঢাকা,
জামাতা রাখ।
মিছে লোক জনে, দেখে যায় কেনে, তোমরা দুজনে,
নির্জ্জনে দেখ॥
সদা সিন্ধু কুলে, শতদল ফুলে, হরিকে পূজিলে,
গিরীন্দ্র রাণী।
ভুবন, মোহিতা পাইলে দুহিতা, সেরূপ জামতা,
মিলিল ধনী॥
না চিনি যোগীন্দ্র জগতে অনিন্দ্য যত নারী বৃন্দ,
নিন্দয়ে শিবে।
নিরন্তর বাম, কহে শিবরাম, মন মনস্কাম,
শিব পুরাবে॥"

উপরি উক্ত কবিতায় দুই একটী কথা আমরা ভাষার ঐকান্তিক দোষ পরিহারার্থ ও নিয়ম বন্ধন রক্ষার জন্য, পরিবর্ত্তন করিয়াছি। তবে যাহা পরিবর্ত্তন করিলে, রসাভাব হইবে ও ভাবের লালিত্য নষ্ট হইবে, তাহা অপরিবর্ত্তিত রাখা গেল।

কবির দুইটী সুন্দর গান দেখুন।

"তবে তার মালায় কি ফল ?
যদি হৃদে না জাগে সে নীল কমল ॥
সারা দিনান্তরে, একবার ডেকে তারে,
দুটী নয়ন ব'য়ে পড়ে যদি জল ॥
মালা কেবল নামের সংখ্যা করার তরে,
অধিক নামে কি আর অধিক ফল ধরে,
সভক্তি অন্তরে বারেক ডাক্‌লে পরে,
লক্ষ নামের ফল ধরেরে পাগল।
মুখে বল্‌তে যদি অলস কর ভাই,
মনে মনে জপ তাহে ক্ষতি নাই,
কিন্তু ভক্তি ছাড়া কিছুই হবে নাই,
ভক্তি বিনা উঠে অমৃতে গরল।
শিবরাম বলে মনে ভক্তি কর,
মালা মলা ছলা সব পরিহর,
বন মালাধারী হৃদি পদ্মে হের,
কর্‌তে পার যদি অন্তর নির্ম্মল ॥"

ব্রজ ভূমি ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন, কৃষ্ণ গত প্রাণা রাধা বলিতেছেন :—

"নাথ যাবে যদি মথুরায়।
নিষেধ না করি ওহে বংশীধারী,
কংশ রাজ্যে যদি কার্য্য আছে ভারী,
বারেক দাঁড়াও হরি, তোমার আগে মরি,
করি বিহিত বিদায়।

সঙ্গ ছাড়া অঙ্গ কি জন্য রাখিব,
ত্রিভঙ্গ হে তোমার ম'লেও সঙ্গ পাব,
ক'রে বামে শব, যাবে হে কেশব,
শব ভাল সুযাত্রায়।
প্রেম ব্রত যদি ক'র্‌লে সমাধান,
দক্ষিণান্ত করি দিয়ে নিজ প্রাণ,
সুখী হ'য়ে কর সেখানে প্রয়াণ,
শিবরাম ইহাই চায় ॥"

পূর্ব্ববারের প্রবন্ধে শিবরামের দুইটী শ্যামা সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। এবারও একটী তত্ত্ব সঙ্গীত এবং একটী শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান উপহার দেওয়া হইল। ভাষা গত দোষ থাকিলেও শিবরামের কবিতা কিরূপ প্রাণ-স্পর্শিনী, তাহা নমুনা দেখিয়াই পাঠকগণ জানিতে পারিতেছেন। রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া শিবরাম লেখনী ধারণ করিলে তিনি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু যে কারণে হউক তাঁহার সে সুবিধা ঘটে নাই। শিবরাম রচিত আরও উৎকৃষ্ট গান, কবিতাদি আমরা আগামী বারে দিব, বাসনা রহিল।

অদ্য আর একটী অবান্তর বিষয়ের আলোচনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

শিবরামের শেষ জীবন অতি দুঃখে পূর্ণ। কবি তখন বার্দ্ধক্যের প্রবল উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া রামায়ণ গান বন্ধ করিয়াছিলেন। রামায়ণ গান করাই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। উহা বন্ধ হইলে তিনি কিরূপ কষ্টে দিনপাত করিয়াছিলেন, কবি তৎসম্বন্ধে এক খণ্ড কাগজে নিজ দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ এই :—

"পূর্ব্বে ছিল প্রীতি মোর সুখের সংহতি।
বাদ বিসম্বাদ কিন্তু হ'য়েছে সম্প্রতি ॥
মম ভাগ্য দোষে যদি পলাইল সুখ।
মিত্রতা আমার সনে করিল যে দুঃখ ॥
গলায় গলায় প্রীতি দুঃখের সঙ্গেতে।
তিলার্দ্ধ না ছাড়ে দুঃখ দিনে কিম্বা রেতে ॥

খেতে শুতে পথে যেতে দুঃখ সঙ্গ করে।
দুঃখ মোরে বড় দুঃখ দেয় অকাতরে ॥
পূর্ব্বে ছিল রামায়ণ গীতের ব্যবসা।
উপার্জ্জন ছিল তাহে অনেক ভরসা ॥
(এবে) ধান গেছে মান ক'রে গান ছাড়া হ'তে।
কত চেলে বোলে চাল না পারি বুঝিতে ॥
অন্নত সম্পূর্ণ বক্র ক্ষুন্ন তার মন।
দিবসান্তে দেখা দেন কখন কখন ॥
কলাই খলাই ক'রে পলাইয়া গেছে।
পশ্চিম পাহাড়ে বুঝি বাস ক'রে আছে ॥
লবণ পশিল বনে, দরশন নাই।
তবে যদি কদাচিত ছিদামে পাঠাই ॥
তৈল হৈল মোর প্রতি আতরের প্রায়।
দুগ্ধেতে জনমে ঘৃত কাণে শুনা যায় ॥
চাইলে পানের পানে কাজ কি তারে খুজে?
বরাৎ হইলে দেখিনে বারুই বোরজে ॥
খুন হ'লে চুন্ আমা পানে চায়না ফিরে।
অবাক্ না সরে বাক্, গুবাকের তরে ॥
মহার্ঘ যে ঘৃত তৈল ক্ষতি কি তাহাতে।
জানি খুব্ পারি খুব্ রুখু ডুব্ দিতে ॥
কয়া কিছু দয়াল শাকের রাগ নাই।
কচুকে কাকুতি কোরে উদর ভরাই ॥"

আজ এই পর্য্যন্ত। কবির অন্য পরিচয় বারান্তরে।

ক্রমশঃ

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

সৎপ্রসঙ্গ।

——:০:——

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

চ। নাম করা সম্বন্ধে তুমি যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিলে, তাহা বড়ই সুন্দর, কিন্তু শাস্ত্র পাঠ করিলে উপদিষ্ট তত্ত্ব গুলির যুক্তি বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম হয় না কেন? ফলে হরি নাম কীর্ত্তন করিবার বিধি নিষেধ সম্বন্ধে যদি কোন শাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া কিছু লেখা থাকে তাহা শুনাইলে বড় বাধিত হইব।

র। শাস্ত্রে কেবল বিধি ও নিষেধ গুলি লিখিত আছে, তবে—কেন উহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য তাহার বিশেষ কোন যুক্তি দেওয়া নাই; কিন্তু ভগবল্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শাস্ত্রানুযায়ি কর্ম্ম করিলে এই কেন'র উত্তর পাইতে বিলম্ব হয় না; ঐ বিধি নিষেধের যুক্তি বিজ্ঞান আপনা হইতেই হৃদয়ে প্রতিভাত হয় এবং সাধক তখন ঐ বিধি নিষেধের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক উহার পরপারে রাগমার্গে উপস্থিত হন, এই রাগমার্গ বিস্তৃত ও বিঘ্নশূন্য, জ্ঞানের পথে যাইবার সময়ে সাত্ত্বিক অহঙ্কার থাকে কিন্তু রাগের পথে উপস্থিত হইলে ঐ অহঙ্কার নির্গুণ ও চৈতন্যময় হইয়া যায়।

ভাই! ভগবল্লাভের জন্য আকুল হইয়া কখন শাস্ত্র পাঠ করিয়াছ কি? শব্দের আবরণে শাস্ত্রের ভাব আবরিত থাকে এবং প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন অপর কেহ সেই আবরণ খুলিয়া সার তত্ত্ব জানিতে পারে না, তবে যে যে পরিমান অধিকারী সে সেইটুকু জানিতে পারে মাত্র, শাস্ত্র সমুদ্রবৎ, ইহাতে না আছে কি! প্রকৃত জিজ্ঞাসুগণ সহজেই শাস্ত্রের মধ্যে আপন প্রশ্নের উত্তর দেখিতে পান। আবার জ্ঞানোদয়ে সাধকের হৃদয়শাস্ত্রেই সকল প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়া যায়, তথাপি যদি তিনি বাহ্য শাস্ত্রের সহিত তাহা মিলাইতে ইচ্ছা করেন তবে অচিরেই তাহাতে সফল মনোরথ হন, নতুবা কেবল কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রের মধ্যে কোন প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা অনুসন্ধান করিলে বহু আয়াসেও ফল লাভ করা দুস্কর বোধ হয়। কর্দ্দমাক্ত লৌহ যেমন চুম্বক শক্তিকে ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ অনেক আত্মাভিমানি ব্যক্তি আবার ফল সম্মুখে দেখিলেও বুঝিতে

পারে না। ফলে বিষয়-মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের চিত্তে শাস্ত্রের প্রকৃততত্ত্ব প্রতিফলিত হওয়া দূরে থাকুক তাহারা স্থূল ভাবেরই ধারণা করিতে চেষ্টা করে না, উপায়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধির মূল, কোন পার্থিব অনিত্য কার্য্য করিতে হইলে অজ্ঞানীগণ অগ্রে তাহার উপায় চিন্তা করে ; কিন্তু নিত্য ফলপ্রদ আধ্যাত্মিক কার্য্যের সময় উপায় চিন্তা করিতে বিমুখ হয়, সুতরাং বাতাস অনুকূল হইলেও পাল না খাটাইলে যেমন নৌকা উজানে অগ্রসর হইতে পারে না, কেবল দাঁড় টানিয়া বহু আয়াসে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেও শেষে স্রোতের টানে পিছাইয়া পড়িতে হয়, সেইরূপ সুকৃতির আকর্ষণে সৎকর্ম্মের প্রবৃত্তি হইলেও যে উহা সম্পন্ন করিবার উপায় বা কৌশল জানে না, বিশ্বাসের মাস্তুলে ভাবের দড়ি দিয়া নির্ভরতার পাল খাটাইতে পারে না, কেবল মাত্র অহঙ্কারের দাঁড় টানিয়া অবিদ্যা স্রোতের প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে বৃথা পরিশ্রম করে, তাহার অনুশোচনা মাত্র সার হয় জানিও।

ভাই! ভগবল্লাভের জন্য আকুল না হইলে কদাচ শাস্ত্রব্যূহ ভেদ করা যায় না, শাস্ত্র অপরা বিদ্যা, সুতরাং মায়ার অন্তর্গত। শ্রীভগবানের কৃপা শক্তি ব্যতীত ইহা ভেদ করা অসম্ভব, তিনি বুদ্ধির উন্মেষ করিয়া না দিলে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, তবে নিম্নাধিকারিগণের জন্য পুরাণ তন্ত্রাদির অনেক স্থলে যে সকল উপদেশ সহজ ভাবে ও উপাখ্যান রূপে বিবৃত আছে, প্রবর্ত্তকগণের পক্ষে তাহা পাঠ করিয়া তদনুযায়ি কর্ম্ম করা উচিত, প্রথমতঃ মহাভারতাদি নিরপেক্ষ পুরাণ পাঠ করিয়া পরে যাহার যে ভাব প্রবল তাহার সেই সম্প্রদায়ের অন্তঃর্গত পুরাণ তন্ত্রাদি পাঠ করিয়া ক্রমশঃ সাধন মার্গে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। চেষ্টা আন্তরিক ও তীব্র হইলে সিদ্ধি লাভের বিলম্ব হয় না, অগ্নির সহিত শুষ্ক ইন্ধন সংযুক্ত হইলে যেমন উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া অন্ধকার নাস করে সেইরূপ অধ্যয়নের সহিত আন্তরিক সাধন সংযুক্ত হইলে হৃদয়ে শ্রীভগবানের কৃপা জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া ভেদ জ্ঞান বিনষ্ট করে, সাধক তখন সাম্প্রদায়িক গণ্ডির পার হইয়া শ্রীভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন ও সকলের ভিতর একের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাহা হউক এক্ষণে শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপায় বুঝিলে কি? তোমার প্রশ্নের শেষাংশ এই যে "নাম কীর্ত্তন সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন বিধি নিষেধ আছে

কি না" ? ভাই! অন্বেষণ করিলে পুরাণ তন্ত্রাদির বহুস্থলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেখিতে পাইবে, বৈষ্ণব তন্ত্রের বিধি নিষেধ অল্প কথায় বলা যাইবে না, তবে তোমার সন্তুষ্টির জন্য মহিষ-মর্দ্দিনী তন্ত্রের শিববাক্য তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর ;—

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেব দেব! পূজা ও জপাদি করিয়াও মনুষ্য তাহার ফললাভ করিতেছে না কেন ?" মহাদেব বলিলেন "হে মহেশ্বরী! এই কলিকালে বহু লোকেই অতি পাষণ্ড এবং যাহারা পাষণ্ড নহে তাহারাও পাষণ্ডের সংসর্গে দূষিত ; পাষণ্ড কিম্বা পাষণ্ড সংপৃষ্ঠ লোকের পূজা. ও জপাদি সকল হইতে পারে না, অতএব যত্ন পূর্ব্বক অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত, সংসর্গ দোষে সিদ্ধি হানি হয়। এই কলিযুগে বহু লোকেই অন্যোপাস্য দেবতার নিন্দাদি নানাবিধ গর্হিত কার্য্যে সমাসক্ত। কেহ বা শিব নিন্দা পরায়ণ, কেহ বা বিষ্ণুনিন্দা তৎপর, কেহ বা অন্য সকল দেব দেবীর নিন্দা নিরত। কোন ব্যক্তি পরস্ত্রীতে সমাসক্ত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিতেছে, কোন নরাধম আপনাকে বৈষ্ণবোত্তম মনে করিয়া কণ্ঠ, কর্ণ, হস্ত এবং হৃদয়ে তুলসী মালা ও নাসিকাতে হরিমন্দির স্বরূপ তিলক ধারণ পূর্ব্বক সুস্বরে হরিনাম করত অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। হে দেবী! উক্তবিধ হরিনাম কারী ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ, উহার পাপ অবর্ণনীয়। যদি স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করে তাহা হইলে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু যদি সন্ধ্যা ও গায়ত্র্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গীতভাবাবিষ্ট হইয়া কেবল মাত্র কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে উক্তবিধ হরিনাম কীর্ত্তনকারী পদে পদে নামাক্ষর সমসংখ্যক অতি ঘোর পাপে লিপ্ত হয়। ইহার নিবেদিত অন্ন হরি গ্রহণ করেন না। ইহার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য ও জল মূত্রতুল্য জানিবে। এই কলিকালে গৃহে গৃহে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণ বিরাজমান। যেখানে বর্ণ সঙ্কর বৈষ্ণবগণ বাস করে, সে দেশ সর্ব্বদা পতিত জানিবে। ব্রাহ্মণগণ গীত, বাদ্য, ও গীত ভাবাবিষ্ট হইয়া নৃত্যগীতাদি করিতেছে। এ সকল কার্য্য পাপপ্রদ। যে ব্রাহ্মণ গীত নৃত্যাদিতে মত্ত হইয়া বিষ্ণুর নিকটে পৃথিবীতে পদাঘাত করে তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণও স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়া পাদ তাড়ন সংখ্যায় নরক বাস করে। কিন্তু যদি ধ্যানানন্দে আনন্দিত হইয়া বিষ্ণু, দুর্গা কিম্বা শিব সন্নিধানে গীত নৃত্যাদি করে তাহা হইলে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। কলিকালে ভারতবর্ষে

ব্রাহ্মণ-স্ত্রী নৃত্য-তৎপরা হইবে এবং অধম ব্রাহ্মণগণ বাদ্য প্রসক্ত হইয়া নৃত্য করিবে ইহাদের সংসর্গ মাত্রেই সাধকের সিদ্ধি হানি ঘটিবে। অতএব হে দেবী! সাধক যত্ন পূর্ব্বক ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। কলিকালে সংসর্গ-দোষ-দুষ্ট ব্যক্তির সিদ্ধি হইবে না। অতি প্রয়াসে সিদ্ধি হইলেও বহুদিনে হইবে। অতএব পাষণ্ড ও বর্ণ সঙ্কর "জাতি (নামধারী) বৈষ্ণবগণের সঙ্গ সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়। হে দেবী! কলিকালে সর্ব্ব দোষময় ভারতবর্ষের একটি মুক্তির উপায় আছে। যদি কোন ব্যক্তি মহাবিদ্যারূপিণী মহামায়ার শরণাগত হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ নির্মুক্ত হইয়া মহামোক্ষ লাভ করিবে।"

ভাই! পুরাণ তন্ত্রাদির এই শাসন বাক্য গুলি ভাবিবার বিষয়, অজ্ঞান জন সাধারণকে প্রকৃত পথে লইয়া যাইবার জন্যই ইহাদের সৃষ্টি; ফলে এক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছ যে, কুসঙ্গ ও ভ্রান্তলক্ষে নাম করা কিরূপ বিপজ্জনক! বর্ণ সঙ্কর বৈষ্ণবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলার উদ্দেশ্য এই যে, জন্ম ও ভাবগত দোষ থাকায় ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি দুর্লভ, এবং পরিশেষে যে মহামায়ার শরণাগত হইতে বলা হইয়াছে, ইনিই পরাবিদ্যা বা শুদ্ধা জ্ঞান স্বরূপিণী, সম্প্রদায় ভেদে ইনিই দুর্গা, রাধা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন, শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির আধারভূতা ইনিই সাধক হৃদয়ে শুদ্ধা জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দেন, মহাগ্নির দ্বারা যেমন বায়ু আকর্ষিত হয় সেইরূপ হৃদয়ে এই শুদ্ধা জ্ঞানের উদয় হইলেই পরাভক্তির আবির্ভাব হইতে বিলম্ব হয় না, অতএব হৈতুকী ভক্তি সংযুক্ত সাত্ত্বিক কর্ম্মের দ্বারা এই শুদ্ধা জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করা সাধক মাত্রেরই প্রথম কর্তব্য জানিও। গীতাতেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ

অর্থাৎ এই জ্ঞানাশ্রয়ের দ্বারা সাধক চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত হন তাঁহার পক্ষে জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তন রহিত হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর ৺দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহোদয়ের পরলোক গমনে

শোকোচ্ছ্বাস।

—:০:—

দয়াময় গুরুদেব! প্রণমি চরণে।
প্রত্যক্ষ হেরিতে আর পাবনা ভুবনে॥
অকস্মাৎ বজ্রসম শুনিলাম বাণী।
গুরুদেব! আর নাই এই রব শুনি॥
শেলসম বাক্য শুনি হৃদয় কাঁপিল।
গুরুদেব! তব শোকে জগত কাঁদিল॥
অন্ধকার অনুভব হয় ধরাধাম।
আর কেবা সুধাসম শুনাইবে নাম॥
সার গর্ভ উপদেশ আর কেবা দিবে।
হৃদি-মরুক্ষেত্রে বারি কে আর সিঞ্চিবে॥
ত্রিতাপ দহন প্রভু আর কে নিভাবে।
তাপিত হৃদয় কেবা শীতল করিবে॥
কোথা গেলে দয়াময় ধরাধাম ছাড়ি।
তব শোকে সবে কাঁদে দিয়া গড়াগড়ি॥
কত লীলা দয়াময় প্রকাশ করিলে।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘোষণা রাখিলে॥
ভক্তগণে দয়াময় নাম বিতরিলে।
মন্ত্র দানে কত শত পাপী তরাইলে॥
অধম তারণ নাম জগতে রহিল।
দীনবন্ধু নাম তাই ঘোষণা হইল॥
গুরুদেব দয়াময় নিবেদি চরণে।
প্রার্থনা পুরণ কর আশীর্ব্বাদ দানে॥

বঞ্চিত করনা প্রভু স্মরণ মননে।
ভাবে ভাবে দেখা পাব এই আশা প্রাণে॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপ হেরি নয়নে নয়নে।
মত্ত যেন থাকি সদা তব নাম গানে॥
চিন্ময় স্বরূপ রূপে হৃদয়ে রহিবে।
চিদানন্দ রূপে সদা শান্তিতে রাখিবে॥
ভকতি শকতি হীন কি আর বলিব।
দয়াময়! তবগুণ কেমনে বর্ণিব॥
যে ভাবে ভাবও তুমি সেই ভাবে বলি।
যে ভাবে চালাও তুমি সেই ভাবে চলি॥
দয়াময় গুরুদেব! অধম তারণ।
ভরসা করেছি ভবে তোমারি চরণ॥
গুরুদেব! রাঙ্গাপদে এই ভিক্ষা চাই।
অন্তে যেন শ্রীচরণে স্থান আমি পাই॥

শ্রীঃ—

(২)

অহে প্রভু গুরুদেব পতিত পাবন।
দয়াময় দীন হীন দুঃখ বিমোচন॥
কি কারণে অকস্মাৎ হইয়া নিদয়।
নিত্যধামে চলি গেলে কাঁদায়ে সবায়॥
দেখ প্রভু তব তরে তব শিষ্যগণ।
শোকাকুল হয়ে সদা করিছে রোদন॥
তব অদর্শন দুঃখ বজ্রের সমান।
দহিতেছে তাহাদের সদা তনু মন॥
জ্ঞানদাতা পিতা তুমি স্নেহের আধার।
জ্ঞান দানে কতজনে করেছ নিস্তার॥
কে আর সদয় হয়ে মো সম অজ্ঞানে।
বিতরিবে জ্ঞানালোক নিস্বার্থ পরাণে॥
তাপিতেরে মেঘ সম স্নেহবারি দানে।
শীতল করিবে দেব আপনার গুণে॥
ভাবিতাম ওই সুশীতল মেঘ তলে।
কাটাইব এ জীবন আনন্দে সকলে॥
কে ভেবেছে ওই মেঘ হতে অকালেতে।
তব অন্তর্ধান বজ্র পড়িবে শিরেতে॥

হা পিতঃ ? কি দোষ মোরা করিয়াছি পায়।
কেন অকালেতে গেলে কাঁদায়ে সবায় ॥
আর সেই স্নেহময় প্রশান্ত মুরতি।
দয়াময় গৌরসম, গৌরসম কান্তি ॥
আর না হেরিব মোরা পার্থিব নয়নে।
আর সে মধুর স্বর না শুনিব কাণে ॥
আর সেই ভক্তি মুক্তি দাতা শ্রীচরণ।
পাব না করিতে মোরা এদেহে স্পর্শন ॥
কেন, প্রভু তবমূর্ত্তি স্মরণে এখন,
না পাই আনন্দ হই বিষাদে মগন!
অবিরল অশ্রুজল ঝরে এ নয়নে।
না মানে প্রবোধ আর প্রবোধ বচনে ॥
এস দেব দয়া করি এস একবার।
অশ্রু জলে ধৌত করি চরণ তোমার ॥
অধম বলিয়া প্রভু তাই কি ঘৃণায়।
ত্যজি গেলে আমা সবে হইয়া নিদয় ॥
না না আমি জ্ঞানহীনা অতি ক্ষুদ্রমতি।
তোমার মহিমা বুঝি নাহিক শকতি ॥
যে প্রভু জীবের দুঃখ দেখি কৃপাদানে।
তরালেন না বিচারি উত্তম অধমে ॥
কেন তিনি ঘৃণা করিবেন আমা সবে।
সর্ব্বজীব প্রতি যাঁর দয়া সমভাবে ॥
গুরু কি ত্যজেন কভু ওরে মূঢ় মন।
ভ্রমেও এমন কথা না ভেব কখন ॥
সর্ব্বস্থানে বিরাজিত আছেন তো তিনি।
জ্ঞান হীনা তাই কাঁদি দিবস যামিনী ॥

শ্রীমতী নীলনলিনী দাসী।

মাঘ মাস, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ ॥

বলো, বলো নাথ! সে দিন কবে হবে, যে দিন আমি আর সকলের সেবা ছাড়িয়া একমাত্র তোমারই সেবায় নিরন্তর নিরত থাকিয়া তোমাকে প্রীত করিতে পারিব? সেবা করিয়া প্রীত করিবার ভাগ্য তো আমার নাই, তাই ভয় হয়, পাছে তোমাকেও প্রীত করিতে না পারি। তবে একটা কথা হইতেছে কি, আমি এত দিন যাহাদের সেবা করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের সেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটু আপনাকে প্রীত করিবার প্রচ্ছন্ন লালসাও ছিল। বোধ হয় তাই তাহাতে প্রীতির পরিবর্তে অপ্রীতিই পাইয়াছি, তাহাদিগকেও প্রীত করিতে পারি নাই। আমার নিজের কথাটা ষোল আনা বাদ দিয়া তাহাদের সেবা করিলে কি হইত বলা যায় না। সে বলাবলির আর কাজও নাই। কেননা, আমি এখন দিবানিশি তোমারই সেবা করিতে চাই। সেই যেমন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সেবা মাগিয়া ছিলেন, সেই রকম সেবা। তিনি যাচিয়া ছিলেন, দাদা! তুমি আমাকে তোমার অনুচর কর, তার পর—

"ভবাংস্তু সহবৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যতে।
অহং সর্ব্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে॥"

তোমার কাজ তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না। তুমি বৈদেহীকে লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিহার করিয়া বেড়াও, আর আমি তোমার কিবা দিবা কিবা রাত্রির সময়োচিত সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে থাকি।

তোমার এই রকম সেবাই আমার চাই। সেবার মধ্যে একটু অবকাশ ঘটিলে জাতি-সেবক আমি হয়তো আর কাহারও সেবায় লাগিয়া যাইব। তাই প্রার্থনা, তুমি দয়া করিয়া তোমার এই ভাবের সেবাই আমাকে দাও। তোমার সেবা করিয়া আর যেন আমার একটুও অবকাশ না থাকে। কিন্তু সেবা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কৃপাও করিতে হইবে, আমার মনের ফাঁক গুলা যেন সব বুজিয়া যায়, সে যেন অভাবের আহ্বানে আর আমায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তুলে। আশ্চর্য্য তাহার খাঁকৃতি? যত দাও তার আশা আর মিটে না। সে কচি ছেলের চেয়েও বেশী বায়নাদারে। একটা আবদার মিটাইতে-না মিটাইতে, সে দশটা সামগ্রীর আবদার করিয়া বসে, তাই তারে বশে আনা—ঠাণ্ডা করা বিষম দায়। এখন তুমি যদি কৃপা করিয়া সেই অশান্তটাকে প্রশান্ত করিতে পার, তবেই। তাহার অন্তরগুলি বুজাইতে অন্তর্য্যামী তোমার আর কতটুকু প্রয়াস পাইতে হইবে বল? কেবল করুণা করিতেই যতটুকু বিলম্ব।

নাথ! হয়তো তুমি কৃপাও করিবে চাকুরিতে বাহাল করিয়া দিবে; আর সেই সঙ্গে হয়তো বলিয়াও দিবে যে, তুমি এদেবতা সে দেবতা—এর ওর তার সেবা কর, তাহা আমি কিছুতেই করিতে পারিব না। আবার পাঁচজনের সেবা? বাপ্! আমি স্পষ্ট করিয়া তোমায় বলিয়া দিতেছি, আমি একমাত্র তোমা ছাড়া আর কাহারও কিঙ্কর হইতে প্রস্তুত নহি। তুমি দয়া করিয়া আমায় তোমার ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্কর করিয়া লও; আর আমি অহোরাত্র তোমার কাছে কাছে থাকিয়া আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তোমাকে আনন্দিত করিতে থাকি। আমি কপটতার পটাবরণ উন্মোচন করিয়াই বলিতেছি,—তোমার এ সেবায় আমার আত্মসুখের একটুও আকাঙ্ক্ষা নাই। তুমি দয়া করিয়া এই ভাবে আমার সেবা অঙ্গীকার কর, ইহাতেই আমার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিবেনা।

হায় নাথ! আমি যে বড় হতভাগ্য, এ সৌভাগ্য কি আমার ঘটিবে? বলিব কি প্রভু! প্রাণের কথা বলিব কি প্রভু! আমি যখন আপনি আপনার মনিব সাজিয়া বসিয়াছি, তখনও আমার প্রাণ কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত। আবার যখন কামাদির দাসত্ব করিয়াছি, তখনও আপনাকে অনাথ বলিয়া মনে হইত। যেন প্রকৃত পক্ষে আমার প্রভু কেহই নাই। মনে, হইত,—আমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী দয়াল প্রভু কেহই নাই। কিন্তু কৃপাময়! আজ যদি তুমি দয়া করিয়া আমার দাসখৎ মঞ্জুর কর, তবেই আমার এই নাথ—হীন জীবন সনাথ হইবে। আমি তখন তোমার গরবে গরব করিয়া ভয়হীন, শোকহীন, সন্তাপহীন হইয়া নিশ্চিন্তমনে তোমার সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকিতে পারিব। বলো, বলো নাথ! সেদিন আমার কবে বা হবে?

শ্রীঅতুল কৃষ্ণ গোস্বামী।

প্রভুর সমুদ্রে পতন।

—:০:—

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থিতি কালে যে সকল লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সমুদ্রে পতন তাঁহার একটী লীলা। প্রিয় পাঠকগণ! সেই লীলার স্বাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আপনাদের হইবে নাকি?

একদিন শরতের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রভু নিজগণ লইয়া উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমন করিতেছেন। একে শরৎ কাল, তাহাতে চন্দ্রের কিরণ, মনোহর উদ্যান আরও কতই মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। উদ্যানের শোভা দেখিয়া প্রভুর সেই রাস রজনীর কথা মনে পড়িল। তিনি রাসের শ্লোক একটি একটি করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও তাঁহার ভাব বুঝিয়া কখন কখন শ্লোক উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন; তাঁহার আর সুখের সীমা থাকিলনা; তিনি পড়িতে পড়িতে

শুনিতে শুনিতে ক্রমে ক্রমে রাস রসে বিভোর হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি প্রেমাবেশে কখন নাচিতে লাগিলেন, কখন রাস লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন, কখন ভাবোন্মাদে এদিকে ওদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন, কখন বা মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে রাসের শ্লোক গুলি সব ফুরাইল। অতঃপর জল কেলির শ্লোক আরম্ভ হইল। প্রভুর মনেও বৃন্দাবনের সেই জল কেলির ভাব জাগিয়া উঠিল। জল কেলির শ্লোক পড়িতে পড়িতে তিনি আই টোটা হইতে হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। চন্দ্র কান্তিতে সমুদ্রের উচ্ছলিত তরঙ্গ সমুহ যমুনার জলের ন্যায় ঝলমল করিতেছে, দেখিয়া তিনি যমুনা মনে করিয়া বেগে ধাবিত হইলেন, এবং সকলের অলক্ষিতে যাইয়া সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিবা মাত্র মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর বাহ্য জ্ঞান কিছুই থাকিলনা। তরঙ্গে পড়িয়া তিনি কখন ডুবিতে লাগিলেন, কখন বা ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহিরে তরঙ্গ, ভিতরেও তরঙ্গ। বাহিরে সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ, সে তরঙ্গে তাঁহার দেহ কখন ডুবিতেছে, ভিতরে প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ, সে তরঙ্গে তাঁহার মনকে ইন্দ্রিয়গণের সহ ডুবাইয়া রাখিয়াছে, বাহিরের তরঙ্গকে জানিতেও দিতেছে না।

যমুনাতে জল কেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

প্রভু তরঙ্গে পড়িয়া কোলার্কেরদিকে ডুবিতে ডুবিতে ভাসিতে ভাসিতে যাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার এই অবস্থা জানিতে না পারিয়া নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বামী কতকগুলি ভক্ত লইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে সমুদ্রের তীরে আসিয়া জলে ও স্থলে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোথায়? ভক্তগণ কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন? রাত্রি গত হইল, তথাপি তাঁহাকে পাইলেন না। অবশেষে সমুদ্রের ধারে ধারে খুঁজিয়া পূর্ব্ব দিকে অনেক দূরে আসিয়া দেখেন, এক জালিয়া স্কন্ধে জাল লইয়া আসিতেছে, আর হরি হরি বলিয়া কখন নাচিতেছে, কখন কাঁদিতেছে তাহাকে দেখিয়া স্বরূপ গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দিকে কাহাকেও দেখিয়াছ কি? তোমার এই দশা কেন হইল?" জালিয়া

কহিল "কাহাকেও আমি দেখিতে পাই নাই। তবে একমরা আমার জালে উঠিয়াছে, দেখা বলিতে তাহাকেই দেখিয়াছি। বড় মৎস্য ভাবিয়া তাহাকে যত্ন করিয়া উঠাইয়া ছিলাম, উঠাইয়া দেখি মৎস্য নহে একটি মৃত দেহ। মরা দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল। পরে জাল খসাইতে গিয়া যেমন তাহার অঙ্গস্পর্শ হইয়াছে, অমনি আমাকে ভুতে ধরিয়াছে। এই দেখ, ভয়ে এখনও আমি কাঁপিতেছি, এখনও আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে।" এই বলিয়া জালিয়া কহিল, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—

"কিবা ব্রহ্ম দৈত্য ভুত কহনে না যায়।
দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁ সাত।
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত॥
অস্থি সন্ধি ছুটি চর্ম্ম করে নড় বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কার নহে রহে ধড়ে॥
মরা রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন॥"

ধন্য জালিয়া! তুমি রাশি রাশি পুণ্যের প্রভাবে স্বয়ং ভগবানকে জালে আবদ্ধ করিয়াছ। তোমার জন্ম সার্থক। প্রভো! তোমার এই পরমাদ্ভুত প্রকট লীলার জয় হউক।

অতঃপর জালিয়া কহিল, "নৃসিংহ স্মরণে আমার ভুতের ভয় থাকেনা। কিন্তু এই ভুত নৃসিংহ স্মরণে আমাকে দ্বিগুণ চাপিয়া ধরিতেছে। আমি এক্ষণে ওঝার নিকটে যাইতেছি, তোমরা আর ওদিকে যাইওনা।"

স্বরূপ গোস্বামীর বুঝিতে বাকী থাকিলনা। তিনি কহিলেন, "আমি ভাল ওঝা, এস তোমার ভুত ছাড়াইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তাঁহার শ্রীহস্ত জালিয়ার মস্তকে অর্পণ করিলেন, এবং তিনটি চাপড় মারিয়া কহিলেন, "আর ভয় করিওনা, ভুত ছাড়িয়াছে।" তাঁহার কথায় জালিয়া নির্ভয় হইল। তখন তিনি পুনরায় কহিলেন, "ভুত নহে, উনি আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু। তিনি প্রেমাবেশে সমুদ্রের জলে পড়িয়াছেন, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তোমার কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হইয়াছে, তবে ভুত মনে করিয়া কিছু ভয়ও

পাইয়াছ। যাহা হউক, এখন তোমার ভয় গেল। এখন আমাদিগকে দেখাইয়া দাও তিনি কোথায়?" জালিয়া কহিল, "আমি তাঁহাকে কতবার দেখিয়াছি, তিনি কেন এমন হইবেন? এ যে অত্যন্ত বিকৃত আকার।" স্বরূপ কহিলেন, "তিনিই বটেন, প্রেমে তাঁহার এইরূপই হয়। চল, এখন আমাদিগকে দেখাইয়া দাও।" অতঃপর জালিয়া গিয়া প্রভুকে দেখাইয়া দিল। তাঁহারা দেখিলেন—

"ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ সবকায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম লটকায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

ভক্তগণ প্রভুকে উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না, অগত্যা সেই খানেই তাঁহার আর্দ্র কৌপীন ছাড়াইয়া দিয়া শুষ্ক একখানি পরাইয়া দিলেন, এবং বালুকা ছাড়াইয়া বহির্ব্বাসের উপরে শোয়াইয়া রাখিলেন। অতঃপর সকলে তাঁহার কর্ণে উচ্চ করিয়া কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে তিনি নাম শুনিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া বসিলেন। উঠিবামাত্র তাঁহার দেহ পূর্ব্বের ন্যায় হইল। তিনি বসিয়া অর্দ্ধ বাহ্য দশায় প্রলাপ বাক্য বলিলেন। তিনি কহিলেন,—

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জল ক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥"
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের অপূর্ব্ব জল কেলি বর্ণনা করিলেন। তাহার পরে বন্য ভোজনের কথা বলিয়া শেষে কহিলেন,

দুঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদ সম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বুল ভক্ষণ॥

রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥

শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস।

শিবরাম।

(৩)

সোণামুখীর কবি শিবরামকে জানেন না অথবা তাঁহার নাম শুনেন নাই, সোণামুখীর মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি কম। তাঁহার উপর অনেকের অনুরাগ ও ভালবাসা দেখিতে পাই। তাঁহার কবিতা, গান প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া অনেকেই তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ কি? তাঁহার রচিত গান কবিতায় রস, ভাব ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, অতএব অন্যান্য পাঠকেরও অতৃপ্তির কারণ নাই।

শিবরামের উৎকৃষ্টতর গানের পরিচয় দিতে আমরা গতবারে প্রতিশ্রুত ছিলাম অদ্য সেই প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা করা যাইতেছে। "কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গা জল;" বঙ্গদেশে যিনিই কবির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই এই কৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে কিছু না কিছু আলোচনা করিয়াছেন। এ বিশুদ্ধ প্রেমের আলোচনা না করিলে কবিতার যেন অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। কবি শিবরামও তাই আনন্দে মাতিয়া রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেম প্রসঙ্গে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

শ্যামের বাঁশীর কি মোহিনী শক্তি। রাধাকুল কলঙ্কিনী এই বংশীর রবে, গোপাঙ্গনাগণের গৃহ কার্য্যে বিরাগের কারণ, এই বংশী ধ্বনি। "রাধা নামে সাধা" এই বাঁশীর গান নানা কবি নানা ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কবি

বলিতেছেন "বাঁশীরে আর বেজোনা বারে বারে করি মানা," কেহ বলিতেছেন "আর কি সময় নাহি রসময়, বাজাতে মোহন বাঁশী" আর আমাদের কবি শিবরাম কি বলিতেছেন শুনুন :—

"বাঁশীরে এই ভেবেছিলি। অকলঙ্ক রাধার কুলে কলঙ্ক রটায়ে দিলি॥ সরলে জন্মিয়ে বাঁশী, অন্তরে গরল রাশি, ক'রে আমার মন উদাসী, পরের দাসী ক'রে দিলি॥১ এই আনন্দ বৃন্দাবনে সকলের আনন্দ মনে, আমি কুটীলের গঞ্জনে ভেবে ভেবে হ'লাম কালি ॥২॥ বৃষভানু রাজার কন্যে, কলঙ্কিনী তারি জন্যে, শিবরাম কয় বৃন্দারণ্যে, আমার বিপক্ষ হ'লি ॥৩॥"

ব্রজপুরের কালশশী মথুরার দণ্ডধারী রাজা হইয়াছেন। বামে কুব্জা রাণী-রূপে শোভা পাইতেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ গত প্রাণা রাধার কথা, স্নেহময়ী জননীর কথা উচ্ছ্বাসময়ী যমুনার কথা, তিনি কি ভুলিতে পারেন? তাই, দূতী আসিলে রাধারমণ কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"বল দূতী সে শ্রীমতি আছে কেমন? আমি দিবা রাতি, দুঃখমতি তাহারি কারণ॥ কেমন আছে ব্রজভূমি, যথায় ধূলা খেলা কৈত্তাম আমি, সে যমুনা তরঙ্গিনী, মধুর বৃন্দাবন? নীপ তরু কেমন আছে, দাঁড়াইতাম যার কাছে, মা যশোদা পিতানন্দ যত রাখালগণ॥ কেমন আছে ব্রজ নারী, কেমন আছে সুকুমারী শিবরাম কয় আহা মরি ধেনু বৎসগণ॥"

উত্তরে দূতী কি বলিতেছেন, শুনুন :—

"সেই রাইয়ের কথা, তুমি বৃথা, কি শুধাও হে শ্যাম। সে ওষ্ঠাগত প্রাণ মাত্র জিহ্বায় তোমার নাম॥ শ্মশান হ'ল ব্রজপুরী, জীবমৃত ব্রজনারী, যশোমতি নন্দ অন্ধ ওহে গুণ ধাম॥ ধুলায় প'ড়ে কমলিনী, দশম দশা গত ধনী, বাঁচে না সে বিরহিণী কহে শিব রাম॥"

ভাবময়ী রাধা, প্রেমের ভাবে বিভোরা। সম্মুখে প্রেমের বস্তুকে দেখিয়া চিনিতে পারিতেছেন না, অগ্রভাগে ও কি? নবজলধর, না, নবজলধর-শ্যাম ভ্রম বশে রাধা, বড়াইকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন দেখুন :—

"তরুতলে এই কিগো বড়াই। বুঝি নেমেছে ওই জলধর, দেখে মনে শঙ্কা পাই॥ ওই যে ইন্দ্রধনু তায়, দেখ বিজোরী খেলায়, বকপাঁতি কিবা তাহে শোভা কব কায়, কিবা গরজয়ে সঘনেতে চল নাগো ফিরে যাই॥

ক্রমশঃ—দীন রসিক লাল দে।

সৎপ্রসঙ্গ।

—:০:—

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

চ। তুমি যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের কথা বলিলে, উহা কি প্রকার?

র। শ্রবণ বা অধ্যয়নের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে, পরে সেই জ্ঞানানুযায়ি কার্য্য করিয়া উহার অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুভব করার নাম বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান। রেলের টিকিট কিনিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে যেমন গম্যস্থানে যাওয়া যায় না, অধিকন্তু অর্থ নষ্ট ও মন কষ্ট হয়, সেইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সাধন পথে অগ্রসর না হইলে কেবল শক্তিক্ষয় ও অশান্তি বৃদ্ধির কারণ হয় মাত্র, সুতরাং ইহা অজ্ঞানের অপেক্ষা অনিষ্টকর জানিবে। বাইবেলে আছে "The letter Killeth and the spirit giveth life" অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রের বাক্যগুলি জানিয়া জ্ঞানাভিমানি হইলে অশান্তিময় মৃত্যুর পথ, ও ঐ বাক্যের ভাব লইয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিলে শান্তিময় জীবনের পথ সুগম হয়। ফলতঃ সাধনের দ্বারা শাস্ত্রোপদেশগুলিকে জীবনে প্রতিফলিত করিয়া নিজস্ব করিতে না পারিলে অপরোক্ষ জ্ঞানের আনন্দাস্বাদ পাওয়া যায় না, পরের ধন নাড়াচাড়া করার ন্যায় কেবল পরিশ্রম সার হয় মাত্র। বৃক্ষকে মাটির উপরে ফেলিয়া রাখিলে যেমন ক্রমে উহা শুষ্ক হইয়া কীটাদির আলয়ে পরিণত হয়, কিন্তু রোপন করিলে উহা শিকড়ের দ্বারা মৃত্তিকার রস আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রমে ফল-ফুলে সুশোভিত হয়, সেইরূপ মনকে কেবল শাস্ত্রের শ্লোকগুলির উপর ফেলিয়া রাখিলে বৃথা অভিমানের তাপে উহা অন্তঃসারহীন হইয়া ত্রিতাপের আলয় হয়; কিন্তু সাধনের দ্বারা মনকে শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইলে সে, জ্ঞান-শিকড়ের দ্বারা উহার ভাব-রস আকর্ষণ পূর্ব্বক শক্তি সম্পন্ন হইয়া ক্রমে ভক্তি-বিশ্বাসাদি আধ্যাত্মিক ফলফুলে সুশোভিত হয় জানিবে।

ভাই! মূল্যবান দ্রব্য যেমন সিন্দুকাদি আবরণের মধ্যে রক্ষিত থাকে এবং ঐ দ্রব্য পাইতে হইলে চাবীর দ্বারা ঐ আবরণ খুলিবার আবশ্যক হয়; সেইরূপ শব্দ-রূপ আবরণের মধ্যে শাস্ত্রের ভাব-সম্পত্তি আবরিত থাকে, সাধন-রূপ চাবীর

দ্বারা আবরণ উন্মোচিত না হইলে উহা লাভ করা যায় না, অথবা নারিকেলের শাঁস জল খাইতে হইলে যেমন অস্ত্রের দ্বারা উহার ছোব্ড়া খুলিতে হয়, সেইরূপ শাস্ত্র নিহিত ভাবরস আস্বাদ করিতে হইলে সাধনের দ্বারা উহার শব্দাবরণ ভেদ করা আবশ্যক।

চ। বুঝিলাম যে প্রকৃত ও অভ্রান্ত সাধন, জ্ঞান লাভের পরে আরম্ভ হয়, কিন্তু জ্ঞান ত প্রথমেই লাভ হয় না, অতএব অজ্ঞান অবস্থায় কিরূপ সাধন আবশ্যক?

র। আগুন জ্বালিতে হইলে প্রথমে পাখার দ্বারা বাতাস করিতে হয়, কিন্তু ঐ অগ্নি প্রবল হইলে যেমন উহা আপনা হইতে বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান লাভের জন্য প্রথমতঃ অহঙ্কারের দ্বারা বৈধীকর্ম্ম করিয়া ভগবদ্‌কৃপার আবাহন করা আবশ্যক, পরে জ্ঞান লাভ হইলে তাঁহার কৃপাশক্তি পরা-ভক্তিরূপে ঐ জ্ঞানকে রাগমার্গে—পূর্ণতার অভিমুখে চালনা করিয়া ক্রমে চৈতন্যে পরিণত করিয়া দেয়।

ভাই! বায়ু সর্ব্বব্যাপী হইলেও অগ্নিকে উদ্দীপিত করিবার জন্য যেমন স্থান বিশেষে পাখার চালনা করিয়া উহার স্ফুরণ করিতে হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের কৃপা সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহার মোক্ষপ্রদ বিশেষ কৃপা লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ অহঙ্কারের দ্বারা ব্যাকুল ভাবে হৈতুকী ভক্তিযুক্ত সাত্ত্বিক কর্ম্ম করা আবশ্যক। কোন বিশেষ স্বার্থ-সিদ্ধির হেতুতে শ্রীভগবানকে ভক্তি করাকে হৈতুকী ভক্তি বলে, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে ইহার দুইটী স্তর, পার্থিব সম্পদাদির হেতু থাকিলে স্থূল ও জ্ঞান বিশ্বাসাদি পারমার্থিক সম্পদ লাভের হেতু থাকিলে সূক্ষ্ম শব্দবাচ্য হয়; ফলে স্থূল-স্তর ছাড়াইয়া এই ভক্তি সূক্ষ্ম-স্তরে পৌঁছিলে তবে সংশয় ধূমকে অপসারিত করিয়া জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, অগ্নির পরিমান বৃদ্ধির সহিত যেমন তদ্বারা আকর্ষিত বায়ুর পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ অগ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম হৈতুকী ভক্তির দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ হইলে উহা ভগবল্লাভের উপায় স্বরূপ পরা-ভক্তিকে আকর্ষণ করে ও তদ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও শুদ্ধ হইয়া ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে; এবং এই জন্যই ব্যাসদেব বলিয়াছেন:—"ভক্তিযোগেন বিজ্ঞানং সম্যক্ শুদ্ধ্রং প্রকাশতে" ফলে জ্ঞান শুদ্ধ ও পূর্ণ হইলেই চৈতন্যে পরিণত হয় জানিও।

ভাই! অগ্নি জ্বালিবার জন্য পাখার বাতাস করিবার সময় যেমন হস্ত চালনা ও ধুমোদ্গার জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বে অহঙ্কারে রজ-স্তমের মলিনতা থাকায় এই সময়ে একটু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তবে সাধকের তীব্রতা থাকিলে গুপ্ত ধনের জন্য মৃত্তিকা খননের ন্যায় তিনি এই কষ্টের মধ্যেও ভবিষ্যৎ সুখের মোহিনী-মূর্ত্তি দেখিতে পান, ফলে ইহা অগ্রে বিষমিব হইলেও পরিণামে অমৃতোপম হইয়া নিত্যানন্দ লাভের কারণ হয় জানিও, "সর্ব্বারম্ভাহি দোষেন ধুমেনাগ্নি রিবাবৃতাঃ" এই ভগবদ্বাক্যটি স্মরণ রাখিও।

মলিন অহংকারের সংস্রবে জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় মন সীমা বিশেষে আবদ্ধ থাকিয়া দুঃখ পায়, কিন্তু জ্ঞানোদয়ে অহঙ্কার পরিশুদ্ধ হওয়ায় যখন মন মুক্তভাবে নির্ব্বিশেষ-লক্ষ্যে—স্বরূপের-অভিমুখে ধাবমান হয় তখন পরা-ভক্তির আবির্ভাবে জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিয়া চৈতন্যরূপে এই গতি বা যোগ অব্যাহত রাখে, এই সময়ে অহঙ্কার চৈতন্য শক্তির যন্ত্র স্বরূপে পরিণত হওয়ায় বৈধাবৈধ কর্ম্ম কিছুই থাকে না; অনুরাগ ও ভাবের দ্বারা সাধনাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়ায় হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি স্থায়ী হয়।

চ। তাহা হইলে সাধনের প্রথমাবস্থায় কি কেবল জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে?

র। লক্ষ্য না বলিয়া উপলক্ষ্য বলিলেই ভাল হয়, কেননা কেবল জ্ঞানই যাহার লক্ষ্য তাহার জ্ঞানে বদ্ধ হইয়া অধঃপতিত হইবার ভয় থাকে, কিন্তু ভগবল্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া জ্ঞানকে উপলক্ষ করিলে সে ভয় থাকে না; মনেকর বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ধনী হইবার জন্য তুমি বিলাত যাইতেছ, এখানে বিলাত যাওয়া উপলক্ষ্য, বিদ্যা শিক্ষা লক্ষ্য ও ধনী হওয়া সেই লক্ষ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। অতএব ফল লাভ করিবার জন্য তোমাকে প্রথমতঃ উপলক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে ও পরে লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া ফল লাভ করিতে হইবে, কিন্তু যদি তুমি বিলাত যাওয়া রূপ উপলক্ষ্যকেই লক্ষ্য বলিয়া মনে কর অর্থাৎ বিলাত গেলেই বড় লোক হইব ভাবিয়া অতি কষ্টে জাহাজ ভাড়া ও কিছুদিনের খোরাক মাত্র সংগ্রহ করিয়া বিলাত যাও, তাহা হইলে যেমন ধনী হওয়া দূরে থাকুক, বরং শীঘ্রই দারিদ্র-যন্ত্রনাকে পূর্ণরূপে আহ্বান করা হয় মাত্র, সেইরূপ কেবল জ্ঞানকেই লক্ষ্য মনে করিলে সাধক জ্ঞান-ভূমিতে শক্তি সম্মানাদির মোহে আবদ্ধ হইয়া

পড়ে, ও পরিণামে অভিমানের দ্বারা অভিভূত হইয়া অবিদ্যার নিম্নস্তরে অধঃপতিত হয়। কিন্তু যিনি নিত্যানন্দ ফল লাভ করিবার জন্য ভগবল্লক্ষ্য স্থির রাখিয়া জ্ঞানের পথে অগ্রসর হন, তাঁহার সঙ্গে ভগবদ্ কৃপার চাপ্ রাস থাকায় জ্ঞান তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, বরং আপন ভাণ্ডারি-স্থিত বিবেক বৈরাগ্যাদি অমূল্য রত্ন সকলে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইবার সাহায্য করে জানিও।

ভাই! অন্নাদি যেমন পাক করিয়া আহার না করিলে তৃপ্তি ও পুষ্টি লাভ হয় না, বরং অজীর্ণাদি রোগে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হইতে হয়, সেইরূপ সাধনার দ্বারা জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ করিয়া চৈতন্যে পরিণত করিতে না পারিলে, ভাবের ক্রিয়া স্থায়ী বা যোগসিদ্ধি হয় না, বরং অভিমানাদি রোগের আবির্ভাবে মন অসুস্থ হয়। জলাশয়ে বারি থাকিলেও যেমন বায়ুর সংযোগ ভিন্ন তরঙ্গ উত্থিত হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে ভগবদ্ভাব থাকিলেও শুদ্ধ জ্ঞানের সংযোগ ভিন্ন তাহার বিকাশ ও ক্রিয়া হয় না।

শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অতএব সাধনের দ্বারা এই সচ্চিদানন্দ ভাবে ভাবিত না হইলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। সতে-অস্তিত্ব, চিতে-ভাতি ও আনন্দে-প্রিয় বোধ হয়; প্রথমতঃ সৎসঙ্গাদির দ্বারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা হৃদয়ঙ্গম হইলে জ্ঞানোদয় হয়, পরে সাধনার দ্বারা এই জ্ঞান শুদ্ধ হইলে হৃদয়ে চিৎ শক্তির বিকাশ হওয়ায় সাধক ভাতি—অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে তাঁহার প্রকাশ উপলব্ধি করেন, এই সময়ে মায়া জনিত ভ্রম-জ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় তিনি শ্রীভগবানকেই একমাত্র প্রিয় বোধে অনুরাগের আকর্ষণে সেই আনন্দের উৎসাভিমুখে ধাবমান হন এবং প্রতি পদক্ষেপে আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি দ্রুতবেগে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইয়া কৃতার্থ হন। অতএব প্রথমে সৎ, মধ্যে চিৎ ও শেষ আনন্দ। ফলে অনুলোম বা বিলোম যে পথ দিয়াই সাধক অগ্রসর হউক না কেন, মধ্যে চিৎ বা শুদ্ধাজ্ঞান সংযুক্ত না থাকিলে এই ত্রিভাবের সমাবেশ ও সিদ্ধি লাভ হয় না জানিও।

ভাই! প্রথমতঃ শাস্ত্র অধ্যয়নাদি কর্ম্ম জ্ঞান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় ও জ্ঞান লাভের পর শাস্ত্র অধ্যয়নাদি করা কেবল সেই প্রিয় হইতেও প্রিয় বস্তুকে লাভ করিবারও আনন্দময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য। গাড়ি করিয়া অগ্রসর হওয়ার মত

এই সময়ের সাধনায় ক্লেশ নাই, বরং শাস্ত্র নিহিত ভাব রসের আস্বাদ পাওয়ায় হৃদয় আনন্দের স্রোতে প্লাবিত হইতে থাকে, এবং এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং মিদমুক্তং ময়ানঘ
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃত কৃত্যশ্চ ভারত।

অর্থাৎ হে ভারত! এই যে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমাকে বলিলাম, বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা অবগত হইয়া কৃতার্থ হইবেন।

ক্রমশঃ
শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রেমের উচ্ছ্বাস।

[মহার্ণব নীরে বটপত্র স্থায়ী শিশুরূপী
শ্রীভগবানের চিত্র পট সন্দর্শনে লিখিত]

(গীতিকা)

একবার হের রে নয়ন।
মহার্ণব নীরে বটপত্র পরে, শিশুরূপী হরি—
ক'রেছে শয়ন ॥

মরি কি নেহারি শৈশব মূরতি!
চৌদিকে ঝলকে স্বরূপের ভাতি,
হেরি জাগে হৃদে অপরূপ প্রীতি,
বিমোহিত হয় মম প্রাণ মন।
শ্যাম অঙ্গে ওই শোভা কি সুন্দর!
লোহিত অপাঙ্গ কিবা বিম্বাধর,

কম্বু গ্রীবা আর নাশা মনোহর,
বদনেতে হাস্য নয়ন রঞ্জন॥
কি শোভন ভুরু কর্ণ সুবিস্তৃত,
কি গভীর নাভি অতি সুশোভিত,
বদন মণ্ডলে প্রতিভা স্ফুরিত,
মার্কেণ্ড ঋষির তপোলব্ধধন॥
বিশাল উরস কিবা সুবলিত,
মৃণাল সুভুজ কিবা সুগঠিত,
নাভি কণ্ঠ দেশ ত্রিবলী অঙ্কিত,
কি চাঁচর কেশ মানস মোহন॥
মুকুতার মালা বিরাজিছে গলে,
বলয় শোভিছে শ্রীকর যুগলে,
কটীতে কিঙ্কিণী মধুরে উজলে,
পৃষ্ঠেতে ঢুলিছে পৃষ্ঠ আবরণ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল হয় আন্দোলিত,
শ্রীপদে মুকুর হয় মুখরিত,
শিরোদেশে কিবা চূড়া বিমণ্ডিত,
ভালেতে শোভিছে তিলক মোহন॥
হে'রে আঁখি অন্য দিকে নাহি চায়,
মনে হয় সাধ ধরি এ হিয়ায়,
প্রতি-অঙ্গ-সিক্ত লাবণ্য ধারায়,
অনিমিষে সুধু করে দরশন॥
আহা মরি মরি! কার এ দুলাল!
বিশুষ্ক হৃদয় হ'ল যে রসাল,
মধুর মিলনে হ'ল লালে লাল,
মুখপদ্মে পাদপদ্ম সুশোভন।
বদন কমলে চরণ কমল,
সেজেছে সেজেছে সেজেছেরে ভাল,

রাঙা পা দু'খানির গৌরব কেবল—
বাড়াতে বুঝিবা এভাব ধারণ।
পাদপদ্ম হ'তে বহে সুধাধারা,
বিন্দু পানে যার ভক্ত মাতোয়ারা,
(এ ভাব) বুঝিতে না প্যারি হই আত্মহারা,
দূর হ'তে পাপী করি নিরীক্ষণ।
মায়া শিশুরূপে স্বয়ং ভগবান,
পুরাতে আসিলে ভক্ত মনস্কাম,
দেখায়ে অপূর্ব্ব মূরতি সুঠাম,
করিলে নবীন ভাবের স্ফুরণ।
চিত্রপটে হেরি' এ চিত্ত ফলকে—
গাঁথিয়া রাখিনু বিপুল পুলকে,
কভু যেন আর সংসার কুহকে,
নাহি ভুলি ওই রাতুল চরণ।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

প্রাণের গোরা।

—:০:—

(চিত্রপটে)

(১)

সেই কি আমার, প্রাণেরই গোরা,
দাঁড়ায়ে রয়েছে ওই।
মরি মরি কিবা, মধুর মূরতি,
জগতে তুলনা কই?

উপমা নাহিরে; কষিত সে সোণা,
মেঘের বিজুরী, না হয় তুলনা,
চম্পকের দাম, নব গোরচনা,
নহে গোরারূপ সই।
মরি মরি কিবা, মধুর মুরতি,
জগতে তুলনা কই?

(২)

রাতুল চরণে, সোণার নুপুর,
আহা মরি কিবা শোভা।
দ্বাত্রিংশ চিন্, তাহাতে বিরাজে,
জগজ্জ'ন মনোলোভা॥
কটি তটে বেড়া, সোণার ঘুঁঘুর,
বাজিতেছে কিবা, মধুর মধুর,
কোটি কাম জিনি, সুন্দর মুরতি,
জগতে তুলনা কই?
সেই কি আমার, প্রাণেরই গোরা,
দাঁড়ায়ে রয়েছে ওই॥

(৩)

আজানুলম্বিত, সুবলিত বাহু,
তাহাতে সোণার বালা।
নখোপরে যেন, কোটি শশধর,
জগত করিছে আলা॥
মুকুতার মালা, দুলিতেছে গলে,
সোণার কুণ্ডল, শ্রবণ যুগলে,
মরি মরি কিবা, মধুর মুরতি,
জগতে তুলনা কই?
সেই কি আমার, প্রণেরই গোরা,
দাঁড়ায়ে রয়েছে ওই॥

(৪)

মাথার উপর, চাঁচর চিকুর,
মালতির মালা তায়।
শ্রীমুখ-মণ্ডলে, অলকা তিলকা,
মরি কত শোভা পায়॥
নয়নে বহিছে, প্রেমেরই ধারা,
নাচিছে কাঁদিছে, পাগলের পারা,
সেই কি আমার, প্রাণেরই গোরা,
দাঁড়ায়ে র'য়েছে ওই।
মরি মরি কিবা, প্রেমের মূরতি,
জগতে তুলনা কই?

(৫)

কে আছে দয়াল, গোরাচাঁদ সম,
বলি হরি হরি বোল।
যাচিয়া যাচিয়া, প্রেম বিলাইয়া,
আচণ্ডালে দেয় কোল॥
কিছু নাই তাঁর, মান অভিমান,
সকলেরে গোরা, করে সম জ্ঞান,
সেই কি আমার, প্রাণের প্রতিমা,
দাঁড়ায়ে র'য়েছে ওই।
এমন গোরার, কি দিব উপমা,
জগতে তুলনা কই॥

দীন—শ্রীবিষ্ণুপদ দে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণ।

—:•:—

(১)

কে বলে তোমায় অনাথশরণ—
পতিত পাবন, করুণাময়।
শুনিয়া তোমার নিঠুর বচন,
দুঃখেতে হৃদয় ফাটিয়া যায়॥

(২)

সর্ব্ব-ধর্ম্ম ত্যজি এসেছি কাননে,
রাঙ্গা পা দু'খানি পূজার আশে।
বাঞ্ছাকল্পতরু হইয়ে কেমনে,
বলিলে ফিরিয়া যাইতে বাসে॥

(৩)

ভুবনমোহন রূপেতে তোমার,
আর কুলনাশা বাঁশীর স্বরে।
করেছে হরণ মানস মোদের,
কেমনে ফিরিয়া যাইব ঘরে॥

(৪)

হৃদয়ে জ্বলিছে মদন অনল,
শুনিয়ে তোমার মধুর গান।
অধর অমৃত করিয়ে সেচন,
জুড়াও মোদের তাপিত প্রাণ॥

(৫)

সুষমার খনি রাঙ্গা পা দু'খানি,
হেরেছি যে দিন এ বৃন্দাবনে।

সেই দিন হ'তে গৃহবাস হরি !
প্রাণ-পাশ প্রায় লাগিছে মনে ॥

(৬)

এভব সংসার সকলি অসার,
পতি সুত বন্ধু দুঃখের হেতু।
কমলা সেবিত ও দু'টী চরণ,
দুস্তর ভবাব্ধি পারের সেতু ॥

(৭)

যে চরণ লাগি শিব ব্রহ্মা আদি,
দেব বৃন্দ সদা ধ্যান-নিরত।
সেই পদযুগ পাইয়ে সম্মুখে,
কেমনে ত্যজিব বলহে নাথ !

(৮)

গোলোক ত্যজিয়ে এসেছ ব্রজেতে,
ব্রজজন-দুঃখ করিতে নাশ।
মোরা ব্রজবালা তোমারি আশ্রিতা,
কেন না পুরাবে মোদের আশ ॥

(৯)

করুণা করহে করুণা সাগর,
স্থান দাও তব রাতুল পদে।
দাসী ভাবে মোরা সেবি, ও চরণ,
র'ব ডুবি সদা আনন্দ হ্রদে ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

কঃ পন্থা।

—:০:—

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যখন বসিবার ইচ্ছা হয়, তখন যেমন বসিবার স্থানটা দেখিবার জন্য একটু চঞ্চল হইতে হয়, সেইরূপ মানুষ সংসারের ঝন্‌ঝাটের মধ্যে মনটাকে খুব খাটাইয়া একবার স্তম্ভিত হইয়া স্মরণ করে—বুঝিবা সবটা উল্টা হইয়া গেছে, জীবনের আগাগোড়া সমস্ত ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। এখন তাহার সকল গতিরোধ করিয়া জীবনটাকে একটু সুস্থির করিবার জোগাড় দেখি। কিন্তু কেমন করিয়া এই শান্তিটুকু লাভ করা যায়, কি করিলে মনটা বেশ হাত পা ছড়াইয়া নিঃশঙ্কোচে আরাম লাভ করে, তার অনুসন্ধান করিতে মানুষের যে আলস্য আসে, তাহা দিন দিন স্বভাবে গঠিত হইয়া উঠে। তাই যতদিন আমরা জীবনের কাজগুলি অভ্যাসের বশে উদ্বিগ্ন চিত্তে গোঁজামিল দিতে থাকি, ততদিনই আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া মনকে আদৌ ব্যতিব্যস্ত করিতে ইচ্ছা করি না। একটী ভগ্নোন্মুখ গাড়ী না হয় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া এক ক্রোশ কোন ক্রমে চালাইলাম কিন্তু তাহার চাকা বারম্বার খুলিতে থাকিলে, হয় তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়, নতুবা ধুলায় কাদায় তাহাকে ভারস্বরূপ স্কন্ধে আশ্রয় দিয়া পথের হাসি তামাসা কুড়াইয়া লাঞ্ছিত হইয়া ঘরে ফিরিতে হয়।

এই যে গমনশীল জগৎ ইহার চারিদিকে যা কিছু দেখিতে পাও তাহার মধ্যে মানুষের জীবন বেশী গতিশীল দেখিতে পাইবে। এই যে মহান্ সৃষ্টি-সমুদ্র নব অভ্যুদয় ও প্রলয়ের ঊর্ম্মি দুলাইয়া অনন্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা আস্ফালন করিয়া ছুটিয়াছে, তাহার মধ্যে যতটুকু চেতনার বিকাশ আছে ততটুকুই বেশী চঞ্চল এবং বেশী স্বাধীনতার তেজে আপনাকে রোধ করিয়া রাখিতে না পারিয়া বহু হইতে বহুতর হইয়া যাইতেছে। যাহা সরল তাহা জটীল হইয়া পড়িতেছে এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম অবস্থার পরিস্ফুটন হইতেছে। মানুষ নাকি সৃষ্টির উচ্চতম বিকাশ তাই মানুষের শরীর এবং মন উভয়েরই যে প্রকার চাঞ্চল্য ও শক্তির বিকাশ হইতেছে তেমন আর অন্য কোন

জীবেই পরিলক্ষিত হয়না। তাই মানুষ শারীরিক দুঃখ নিবারণের জন্য যত-দূর পারে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহাতেই সকল অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়া থাকিতে না পারিয়া মানসিক এবং আত্মার (আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) সর্ব্ব প্রকার দুঃখ নিবারণের জন্য পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। আমরা শৈশবে, যৌবনে বেশ ছোট খাট সুখের কোণে অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করি মাত্র, কিন্তু জীবনের একদিন প্রতি দিবসের অভ্যস্ত ছোট আমোদ আহ্লাদ মেলা মেশা সম্ভোগ প্রভৃতি সকলটাই যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। সকল জিনিষের যেমন একটা শেষ আছে দেখিতে পাই, তেমনি নিজেরও একটা শেষ আছে, মনে পড়ে, ও সেই শেষটা কেমন ধারা জানিতে যে কৌতুহল হয় তাহার সান্তনা করিতে গিয়া আমরা অনেক কথা অজ্ঞাতসারে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলি।

তাই অসমাপ্ত গৃহ কার্য্যের ভাবনা গুলি তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে যখন পরিশ্রমাক্লিষ্ট কপোলে হস্ত রাখিয়া সুদূর আকাশের শূন্য পানে চাহিয়া বিচার করি তখন হয়ত একবার মনে হয় ছি! ছি! করিতেছি কি? এত প্রশস্ত আকাশ এমন উদার পৃথিবী এই উজ্জল আলোকের ভিতর আমার এই যে অল্প পরিসর মনের অন্ধকার এটুকু লইয়া আমার কি হইবে এ টুকু অন্ধকার লইয়া আমার বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। তখন আলস্য ভরা মন্থর প্রাণে অনুতাপের ঝঙ্কারে কবির লেখায় বলিতে থাকি।

"ঘাটে বসে আছি আনমনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময়,
এ বাতাসে তরী ভাসাবনা,
তোমা পানে যদি নাহি বয়।
দিন যায় ওগো দিন যায়
দিন মণি যায় অস্তে,
নাহি হেরি বাট দূর তীরে মাঠ
ধূসর গোধূলি ধূলিময়।
ঘরের ঠিকানা হ'লনা গো।
মন করে তবু যাই যাই।

ধ্রুব তারা তুমি যেথা জাগো,
সে দিকের পথ চিনি নাই।
এতদিন তরী বাহিলাম,
বাহিলাম তরী যে পথে,
শতবার তরী ডুবুডুবু করি,
সে পথে ভরসা নাহি পাই।
তীর সাথে হের শত ডোরে,
বাঁধা আছে মোর তরীখান,
রসি খুলে মোরে কবে দেবে,
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ!
কোথা বুক জোড়া খোলা হাওয়া,
সাগরের খোলা হাওয়া কই,
কোথা মহাগান ভরিদিবে কাণ,
কোথা সাগরের মহাগান!"

তবে আমার এই যাত্রার যখন উদ্দেশ্য খুঁজিতে যাই, যখন জিজ্ঞাসা করি কি জন্য, কেন? তখন একটী সদুত্তরের জন্য বড় গোল পড়িয়া যায়। চারিদিকে চাহিয়া দেখি সকলেই আমার ন্যায় সংসারের এক একটা কাজ লইয়া সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। এত বড় দিন রাত্রের মধ্যে কতটুকু উপেক্ষিত সময়ে তাচ্ছিল্যে অবহেলায় আমাদের অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া যথার্থ পথের ঠিকানা করিতে যাই? দেখিতে পাই রাত্রি আসিলেই নিশ্চিন্তে নিদ্রা এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই ভবিষ্যৎ লুপ্ত ও বর্ত্তমান সুখের পশ্চাতে একান্ত চিত্তে অনুধাবন। তাই যদি কখনও মনে হয় এই দৈনন্দিন নিষ্ফল কার্য্য কলাপের অতিরিক্ত কোন চিন্তা আছে কোন বিষয় আছে যাহাতে আমাদের মনের একান্ত সংযোগ আবশ্যকীয়, কোন কার্য্য আছে যাহার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি গুলি একত্র করিতে হইবে তাহা হইলে সেই ক্ষণিক চিন্তা আমার চারিদিকের মায়ার ভাব লহরীতে, ঝড়ের মুখে একখণ্ড সাদা মেঘের মত উড়িয়া যায়। হায় কি পরিতাপ! তখন কি মনের এই ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখিয়া প্রাণ সকাতর চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠেনা যে :—

"হে মঙ্গলময়! পথ কোথায় বলিয়া দাও"

কথায় বলে দূরের বস্তু সুন্দর দেখায়। একথাটা কিন্তু সব বিষয়ে খাটে না। আমাদের পার্থিব চক্ষু ও স্থূল জগতের বস্তু সমুদায় সম্বন্ধে ঐ কথা গুলা প্রয়োগ হইয়াছে। তা না হইলে যাঁহারা বলেন বিধাতা যে আমাদের অনেক দূরে আছে সেটা তাঁহার সৃষ্টির একটা সৌন্দর্য্য, এই কথা গুলা এত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতনা। আমার মনে হয় আমি যতই সৃষ্টি কর্ত্তা হইতে দূরে যাই ততই আমার সব রকমের কল কব্জা খারাপ হইয়া পড়ে, আত্ম দর্শন আর্শির ছায়ায় নিজের চেহারাটা নিতান্ত কদাকার ও মলিন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই ভাবনা ভাবিতে গিয়া মন অকস্মাৎ আমি জিনিষটাকে এত নাড়া চাড়া করে যে হটাৎ ঐ আমির রহস্য পূর্ণ অনন্তের মধ্যে হারাইয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধির এমন একটা ভাগ করা স্বভাব আছে যে এই আমিকেই দুই ভাগ করিয়া কতকটা ইন্দ্রিয় ভোগের কর্ত্তৃত্বে ফেলে, আর কতকটা কি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার জন্য বাহিরে ভিতরে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাই সে দ্বন্দ্ব রচনা করিয়া ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সুন্দর কুৎসিৎ ইত্যাদি হতভাগ্য দুই মুখ গুলা তরবারি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া জীবন পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেই পুরাতন করুণ-সুর তাহার সকল কর্ম্মে সকল ধর্ম্মে সকল চিন্তায় দুলিতে থাকে——এ দুইটার মধ্যে কোনটা—এসন্দেহের মিমাংসা কোথা, সত্য জানিবার পথইবা কোথা, তাইবলি কঃ পন্থা।

এমন একটা সূত্র সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে যেটা এই দ্বন্দ্বের ভিতর মালার সুতার ন্যায় ইহাদের ঘনাইয়া একখানা করিয়া দিতে পারে। সে সুতাটা সে দেখিতে পায়না তাই এত আলগা ভাবে সে আজ জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু ঐ যে যত দ্বন্দ্ব গুণ সমস্ত একত্রী ভূত করিয়া ভগবানের অঙ্গে প্রতি-ফলিত করা হয় তাহাতে ব্যবহার জীবনে স্থূল মনের কার্য্যকলাপে বড়ই অসঙ্গত হইয়া যায় ও আমাদের ধারণার বাহিরে চলিয়া যায়। কাজেই তাহাকে ধরিতে গিয়া আকাশ কুসুম চয়ন করিতে যাওয়া হয়; অগত্যা আমার মত স্থূল বুদ্ধির যে কয় জন আছেন তাঁহারা "হা হতোস্মি" করিয়া তত্বানুসন্ধানে বিরত হইয়া পড়েন, কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের আশৈশব অভ্যস্ত আলস্য ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা আভাব পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠেন তাঁহারা কোন্

পথে গেলে সেই পুরাতন পুরুষটীর বাটী পঁহুছিতে পারিবে তাহার জন্য বহুল চেষ্টা করিয়া থাকেন।

রাম, শ্যাম, যদু, বেড়াইতে বেড়াইতে যখন সুদূরে মেঘ রেখার ন্যায় শূন্যে একটী মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইল তখন ঐ চূড়াকে মেঘ অথবা শূন্য ভ্রম করিয়া রাম অনুসন্ধানে বিরত রহিল, শ্যাম উহা জানিবার কোন উপস্থিত আবশ্যকতা না দেখিয়া বাটী ফিরিল, কেবল যদু অন্ততঃ একটু কৌতুহল নিবারণের জন্য, (সত্য জানিবার জন্য না হউক) ক্রমশঃ মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাঞ্ছিত কোন দ্রব্য পাইল। তেমনি যেরূপ মনোবৃত্তিই থাকুকনা কেন লক্ষ্য স্থির হইলে, উদ্দেশ্যের একটা সীমা পরিলক্ষিত হইলে, কোন্ পথে অগ্রসর হওয়া যায় একটা মহা ভাবনা আসিয়া আচ্ছন্ন করে। তখন জিজ্ঞাসা করে যদু ত এ পথ দিয়া যায় নাই ঐপথে গিয়াছে রাম ত যাইলনা আর শ্যাম কত কথা বলে। এ নানা মতে দাঁড়াই কোথা, কঃ পন্থা।

এইরূপ উৎকণ্ঠিত-চিত্ত-বৃত্তির বিভিন্নরূপ প্রবৃত্তি অনুসারে নানারূপ পথের ও সৃষ্টি হইয়াছে বটে ; যথাঃ— ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম কিন্তু তবু এদেশ ওদেশ নানা স্থানের নানা প্রকার বিচিত্র ধর্ম্মের ও আচার ব্যবহারের শতধা প্রকার দেখিয়া একের মধ্যে না আসিয়া মন বহুর মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। তাই সকল ধর্ম্মেই পথান্বেষীকে একটী মাত্র উপদেশে আবদ্ধ করিয়াছে। যদিও এই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের সাধারণ একটা সত্যও উপদেশ, বিলাতের Free thinkerদের (স্বাধিন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের) তত অনুমোদিত হয় না, তবু বুঝিয়া লইতে হইবে যে ঐ জাতীয় যে কয়টা মানুষ আছে তাহারা পৃথিবীর লোকের ও ধর্ম্মের কাছে একমুঠা, কাজেই নগণ্য। সকল ধর্ম্মেই পথান্বেষীকে একজন পথের সন্ধান জানে এমন লোকের আশ্রয় লইতে হয়। এটা কিন্তু অত্যন্ত সহজ কথা, তবু এই কথাটাই আমাদের বুঝিতে ও এই টুকু উপদেশের আশ্রয় লইতে অনেকখানি সময় দেরী পড়িয়া যায়। বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে গুরুমহাশয়ের বেত্রের ছাপ পৃষ্ঠে এক আধটা ফেলা দরকার, ইহা কেউ অস্বীকারও করেন না কিম্বা কেউ জানেন না এমনও নহে, কিন্তু আমাদের দেশে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্য ভাষায় একটু উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন তিনিই একজন স্বয়ং প্রবর্ত্তকের মত হয়েন, কিন্তু

ন্যায় জ্যোতিষ ইত্যাদিতে মনের সরল অনুসন্ধানটী এমন হারাইয়া ফেলেন ও জটীল করিয়া তুলেন যে, তাঁহাদের আধ্যাত্ম অবস্থাটী ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় পথ কোথায় বলিয়া চিৎকার আজকাল শোনা যায়না। যাঁহারা পথের সন্ধান জানেন তাঁহারা জীবের উন্নতি কল্পে দুএক কথা বলিয়া মানুষকে ফিরাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু আমাদের অভ্যস্ত আলস্য ও ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষার অভিমান এমনি ভাবে আমাদের অধিকার করিয়া চক্ষের সাম্‌নে দাঁড়ায় যে আমরা বাস্তব অবাস্তব পার্থক্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলি। স্বীকার করি কতকগুলা অযোগ্য মিথ্যাবাদী পথের সন্ধান না জানিয়াও পথ দেখাইব বলিয়া কতকগুলা অন্ধকে গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছে তা বলিয়া আমরা যদি যথার্থ দার্জ্জিলিং যাইব স্থির করি তবে কেন ই, আই, আর এর রেল পথে টিকিট কিনিতে যাই। সে দিন একটী বিখ্যাত পথ প্রদর্শক আমার পুস্তকাগারে শব্দকল্পদ্রুম হইতে হ্রীং বীজের অর্থ দেখিতে বলিলেন, কেননা তাঁহার কোন শিষ্য উহার অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে। যে জিনিষ অভিধানে পাওয়া যায় তাহার জন্য যদি পথ প্রদর্শক আবশ্যক হয় তবে আমরা কত অলস ভাবিয়া দেখুন আর যিনি অভিধানের বলে ও দোহাই দিয়া অন্ধের চক্ষু খুলিতে চান তিনি হয়ত টোলের পণ্ডিত হইতে পারেন, নতুবা গ্রন্থকার হইতে পারেন, আমার বিদ্যালাভের সহায় হইতে পারেন কিন্তু আমার ভিতর যিনি আমিরূপে বসিয়া আছেন তাঁহার কাছে যাইবার রাস্তা অভিধানে নাই, বিদ্যায় নাই, তাহা জানিতে হইলে তোমার যেমন করিয়া হউক টিকিটের ঘরের সন্ধান রাখিতেই হইবে।

তবেই দেখুন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের একটী পোল হইতে সাড়া আসিতেছে কিন্তু অপর পোলে আসিয়া এমন একটা দুর্ভেদ্য আবরণে ধাক্কা খাইতেছে যে সে ঠিক কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। কাজেই পূর্ব্বে যেমন মানুষ পথ কোথায় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইত ও ব্যাকুল হইয়া ষ্টেসনে হাজির হইত তাহারা গাড়ী ফেল হইত না আর আমরা যেতে হবে যেতে হবে করি বটে কিন্তু ষ্টেসনের ধারেও জুটী না। মোট কথা পথ প্রদর্শকের অভাব হয় না অভাব যাত্রীর। ই, আই, আর ট্রেনগুলা লোক হোক্ আর নাই হোক্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে হুস্ হুস্ করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করিতেছে, তুমি যদি যেন

সাহেবদের তোষামোদ করিয়া ভিড় ঠেলিয়া ছুটা ছুটী ব্যাকুলতা স্বীকার করিয়া কিছু পয়সা দিয়া একখানি টিকিট জোগাড় করিতে পার তবেই গাড়ীর নিরাপদ বক্ষে আশ্রিত হও। কিন্তু এদিকে পথ কোথায় বলিয়া জানিবার জন্য একটী যারও চিত্ত ব্যাকুল হইল না আর তুমি আমি ঘরে বসিয়া দিল্লি ফরক্কাবাদ দর্শন করিব এ আশা ও বড় অসামঞ্জস্য। তাই প্রাণে প্রাণে আমাদের দেশে কঃ পন্থা প্রশ্ন উঠুক অনুসন্ধান উঠুক আলস্য ত্যাগ হইয়া যাক্। আজ নবরবির অভ্যুদয়ে ঘরে ঘরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সোৎসাহে শয্যা ত্যাগ করিয়া আপন পদে নির্ভর করিয়া দাঁড়াক্ আজ অপৌরুষের মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আবার আমাদের দেশ পবিত্র হোক্ পুণ্য হোক শুধু সেই পুরাতন কথা বারম্বার স্মরণে আসুক উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ম্ম ও ভক্তি।

—:o:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সর্ব্বজীবে বলিয়া প্রথমত মানিয়া লই। "জীবে দয়া" একথায় দয়া প্রকাশকের প্রাধান্য সূচিত হয়। সুতরাং এবচন ধরি না। উহাতে নিজের নীচতা বোধ তিষ্ঠে না। জীবে দয়া শুধু মহা প্রেমিকের অধিকারে। কিন্তু গীতা বলেন :—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং।
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেক ত্বমা স্থিতঃ।
আত্মোপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ॥

প্রচলিত কথা :—

"যত্র জীব তত্র শিবঃ"।

সর্ব্বজীবের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানকে দেখা কিম্বা তাঁহার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রশংসিত, আমি তুমি ও উচ্চবাক্যে অতি ভাল বলিয়া প্রশংসা করি। সর্ব্বজীবে ঈশ্বর দর্শন হইলে নিজের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন বরং আরও আগে হয়। এ সূত্রে "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি" ইত্যাদি বচন সুসঙ্গত প্রতীত হয়। কিন্তু "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে" একথার তাৎপর্য্য বিনষ্ট হয়। "তৃণাদপি" শ্লোক ও অতিশয়োক্তি মধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্তু এ সব যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখামৃতধারা। সাধকের হৃদয় তন্ত্রীতে একবার অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া সিদ্ধান্তের ধ্বনি মুখরিত করা যাউক, উপস্থিত বিরোধের ভিতর দিয়া অবিসংবাদিনী কোন মৌলিক-ধারা মৃণাল সূত্রবৎ প্রবাহিত আছে কিনা পরীক্ষা করা যাউক, শান্তের সমতলে যিনি সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দেখেন, তিনি নিজের মধ্যে ও তাহাই দেখেন; সুতরাং নিজকে হীন মনে করিবার হেতু দাঁড়ায় না। "আমি"—সরোবরের তরঙ্গ এ অবস্থায় শান্ত, সব একই সমতলে অবস্থিত। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্নতা সহকারে দাস্যরূপ অগস্ত্য ঋষির গণ্ডূষে জল কমিয়া নামিলে, তদবস্থ জীব নিজকে বড়ই হীন ও ক্ষুদ্র মনে করিতে থাকে। সমদর্শন শান্তরতির ফল, আত্মদৈন্য দাস্যরতির ফল। অতএব নিজকে হীন মানা জীবের এক উত্তমাবস্থা। এখন মানিলাম ভক্ত নিজকে হীন অমানী মানেন, ইহা অতি উত্তম; ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার বর্ণে বর্ণে তৎপ্রমান পাই ঃ—

'ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি মুক্তি নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।"
"হরি হরি মোর করম অতি অভাগী।"

ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" এবং সাধনা ও সিদ্ধি ভক্ত-বৈষ্ণব হৃদয়ের আদর্শ পরিস্ফুট চিত্র। উহার অনুশীলন দ্বারাই সকল সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়। ঠাকুর মহাশয়ের দৈন্য, কাকুতি, কৃপাভিক্ষা সমস্তই সজ্জন সমক্ষে কিন্তু সর্ব্বজীব সদনে নহে। সুতরাং এসব পর্য্যালোচনায় সুন্দর হৃবোধ হয় যে, সাধু সজ্জন বৈষ্ণবের নিকটেই আত্মহীনতা দর্শাইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বজন অপাত্রতা দোষে এককালে উপেক্ষনীয়।

তাঁহার ভক্তের সঙ্গ তার সঙ্গে যার সঙ্গ,
তার সঙ্গে না হইল কেন বাস।
কি কব দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥
সতত অসত সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন।

ভক্ত ও বৈষ্ণবসঙ্গ ভিন্ন সমস্তই অসৎসঙ্গ বলিয়া গণ্য। সাধুসঙ্গ মহিমা আরও প্রমাণ সহ প্রকটিত করা যাউক, ঃ—চৌষট্টি ভক্তঙ্গ মধ্যে প্রধান এই পাঁচটী ১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন, (৩) ভাগবত শ্রবণ, (৪) মথুরাবাস (৫) শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।

কৃষ্ণ ভক্তি এসব পুণ্য কর্ম্মের অমৃত ফল।

(১) সাধুসঙ্গ।

নৈষাং মতিস্তাব দুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থা পরমাযদর্থঃ
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনাণাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্ত মহাজনগণের পদরজঃ পরমার্থ বলিয়া গ্রহণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তি-কর কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শের আশা নাই।

দর্শনস্পর্শনালাপ সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপিচ পুক্কশম্॥

কৃষ্ণ ভক্তের ক্ষণিক দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাসাদি সাক্ষাৎ মহাপাতকিকেও পবিত্র করে।

সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তি ফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥

পুনশ্চঃ—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে॥

কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মূল হয় সাধসঙ্গ।

সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতিফলে সৎসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গ ঘটে; আবার ভগবদ্ভক্ত সঙ্গগুণেই ভক্তি উপজাত হয়।

সৎসঙ্গরূপ চন্দ্র কিরণ স্পর্শ বিনা ভক্তি কুমুদ প্রস্ফুটিত হয় না। ভক্তি বিনা জীবের গতি ও হয় না। সুতরাং সাধুসঙ্গ জীবের একান্ত আবশ্যক। পক্ষান্তরে আবার অসাধুসঙ্গ ও নিতান্ত পরিহেয়। ভক্তঙ্গ মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ, বহির্মুখ সঙ্গত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন:—

সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

চন্দন সঙ্গে সেওড়া ও চন্দন হয়। আবার দেখুন্ প্লেগ রোগের বিষ কোন দেহে উৎপন্ন হইলে, তৎসঙ্গ দোষে অপরকে ও আক্রমণ করে। অসাধু সঙ্গের বা অভক্ত সঙ্গ দোষে এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটে। যেমন অগ্নি হইতে তেজ, গন্ধ দ্রব্য হইতে গন্ধ সতত ছড়ায়, তদ্রূপ প্রতিঘটস্থ ভাব তাহার গুণ বিস্তার করিতেছে। অতএব কামদুষ্ট মানুষের নিকট বাস করিলে তচ্চিত্তগত কাম অধিকার করিবে, কারণ প্রত্যেক ভাব বা বৃত্তিরই বৈদ্যুতিক ঝলক আছে, সেইটা স্পর্শ দ্বারা সঙ্গীকে তদ্বিভাবিত করে। ভক্তি পুষ্পবৎ সুগন্ধ বিস্তার করে; বিষয় বিষ্ঠাবৎ দুর্গন্ধ বিস্তার করে। ঘ্রাণে তৎপদার্থের রেণুরাশি নাসারন্ধ্র দিয়া আঘ্রাণ কারির রক্তে প্রবিষ্ট হয় এবং তদনুরূপ ক্রিয়া জন্মায় কালিস্পর্শে দেহ কাল হয়, বহির্ম্মুখ জন সঙ্গে চিত্ত মলিন হয়, অশুদ্ধ হয়। অশুদ্ধ-চিত্ত-পাষাণ উদ্ভেদ করিয়া ভক্তির কোমলাঙ্কুর বাহির হইতে পারে না, অথবা একবার সঙ্গগুণে অঙ্কুরিত হইয়া থাকিলে তাহা কুসঙ্গি সঙ্গ তাপে তৎক্ষণাৎ ঢলিয়া পড়ে।

ভক্তি পিপাসুজনের অবশ্যবর্জ্জনীয় এই বহির্মুখ সপ্তবিধ, যথা:—

(১) নাস্তিক ও মায়াবাদী, (২) বিষয়ী, (৩) বিষয়ি সঙ্গপ্রিয়, (৪) যোষিৎ (৫) সঙ্গী, (৬) ধর্ম্মধ্বজী, (৭) কদাচার মূঢ়বদ্ধি অন্ত্যজ।

এখন আমার প্রধান বক্তব্য বিষয়ে হাত দিই। পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রবচন গুলির এস্থলে পুনরুক্তি সঙ্গত, নচেৎ মনের ভাব পরিস্ফুট হইবে না।

শান্তরতির—(১) "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" (২) "নিরহঙ্কার" (৩) "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যঃ।"

দাস্য রতির—

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"

একদিকে গেল এসব বিশ্বোদার উপদেশ. অপর দিকে থাকিল "সৎসঙ্গ সৎসঙ্গ" চীৎকার, এত বাছাবাছি। এর মীমাংসা কি, তাৎপর্য্য কি? এ সকল সূত্রানুশীলনে নিষ্পাদিত হয় যে কেবল অন্তরঙ্গ সমাজেই আপনাকে হীন জ্ঞান করিতে হয়, তাতে ভক্তির উল্লাস ঘটে। "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পষ্যতি যঃ" একথার তাৎপর্য্য এই যে যিনি ভক্ত তিনি বহির্মুখ জনের প্রতি ভক্তভাবে যদিও ঘৃণা করেন, তাহার সুখদুঃখে সহানুভূতি ও অভাব দেখিয়া দয়া প্রকাশ করিবে।

আবার ওদিকে থাকিল "অদ্বেষ্টা" ও "নিরহঙ্কারঃ" কিন্তুঅসৎসঙ্গ বর্জ্জনের উপদেশ থাকিল। যখন কাহাকেও আমি অসৎ শাব্যস্ত করিয়া ত্যাগ করি, তখন আমি নিশ্চয় তাহার প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষ প্রকাশ করি এবং চিত্তের উদ্রিক্ত অহঙ্কার দ্বারাই স্থির করি "অমুকে অভক্ত, আমি ভক্ত" কাজেই আমি এত বাছিতে যাইয়া জাহান্নামে গেলাম। আমাদের জাহান্নমে দিবার জন্যেই কি সনাতন ভক্তি শাস্ত্রের এ সব শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে? শ্রীগোস্বামি পাদগণের এমন কাজ? অনাদি শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া গোস্বামি পাদগণ কিন্তু ভক্তি লক্ষ্মীকে তুলিয়া শ্রীপাটে বসাইয়াছেন। ভবরোগের অমোঘঔষধ "নাম" ধন্বন্তরি উঠাইয়াছেন। সব হয়েছে স্বয়ং প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ইঙ্গিতে। সুতরাং সব সাচ্চা, নির্ভুল, খাটি, নিখুঁত। কিন্তু গীতা ও শ্রীভগবানের বাণী এখন কোন্ পথে বাখানি?

এ সব উপরে বালুর চড় কিন্তু তলে তলে ফল্গুমীমাংসা ঝলমল প্রবাহিত আছে:—কাহারও প্রতি ঘৃণাদ্বেষ প্রদর্শন পাপ বটে; অহঙ্কারের আশ্রয় করা গুরু পাপ বটে, সুতরাং এ সব পরিহার্য্য; পরিহার্য্য হেতুভেদ অন্য প্রয়োজনে, কিন্তু ভক্তি যে কর্ম্মের লক্ষ্য, ভগবল্লাভ যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য সেই কর্ম্মে

অহঙ্কার থাকুক্, ঘৃণা থাকুক, দ্বেষ থাকুক্, যে কোন ও পাপ, মহাপাপ থাকুক্ সে সব পাপ নয়, মহা পুণ্য!! কিন্তু উদ্দেশ্যটী ঠিক বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রীতি হওয়া চাহি। প্রয়োজনে আত্মসেবার কণামাত্র মিশ্রিত থাকিলে পুণ্য ও পাপে পরিণত হয়. পাপতো পাপ। তদৃষ্টান্ত যথাঃ—কোন স্বার্থ প্রণোদনে যদি দান ও করি, তা পাপ, কিন্তু যদি চুরি করিয়া দ্রব্য আনিয়া কৃষ্ণসেবা নির্ব্বাহ করিলে, তাহা পুণ্য। অনুস্বার বিসর্গ যেমন আশ্রয় স্থান ভাগী, পাপ পুণ্য ও শুধু উদ্দেশ্যের রঙ্ ধরে। সুতরাং বোধ হয় বিসংবাদিতার মীমাংশায় আমি কৃতকার্য্য হইলাম। অসৎ সঙ্গ পরিবর্জ্জনে ঘৃণাদ্বেষ অহঙ্কারাদি আপাততঃ যে সব দৃষ্ট হয়, সে সব উদ্দেশ্যের নির্ম্মলতা ও মহত্ব বা কৃষ্ণোন্মুখতা নিবন্ধন নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ এবং প্রশস্ত। উহা অহঙ্কার নয়, আত্মতত্ত্ব, উহা ঘৃণা নয়, রুচির প্রকর্ষ, উহা বিদ্বেষ নয়, বিষয়ে অরুচি। আর এক বিভ্রাট!—

সখি, ওই বিপিনে মুরলী বাজায়।
আমার মন, উচাটন,
হায়, ঘরে থাকা হ'ল যে দায়॥

একটী প্রাচীন সঙ্গীত।

এই হইল এক রকম, এহ'লো বাঁশীর গানে। কিন্তু ঘরের ভিতর যে গঞ্জনা! সে গঞ্জনায় ঘরে তিষ্টাদায়। আমার ভক্তি শিশুটীকে কোলে করিয়া কোথায় দাঁড়াইব, আশ্রয় লইব স্থান নাই। বুকের শিশুটীকে কোন রকম বাঁচাইয়া উঠিতে পারি এমন গতিক দেখি না আমার ভক্তির এত ও শত্রু। কংশের চর যেন সর্ব্বত্র ফিরিতেছে। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, ধর্ম্মের চূড়া, পালন করা বড় কঠিন। ঘরে থাকা দায়। কেন, দেখুন:— বহির্ম্মুখ লোক সঙ্গেই বাস করিতেছি। সাড়ে পনর আনা লোক বহির্মুখ, স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব প্রায়ই ভক্তিহীন সুতরাং এক প্রকার নাস্তিক। কেননা বিষয়ী? ভারত সন্তান গোরা হইলে ও কালা আদ্‌মি। আবার বিষয়ীর অন্ন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য অস্পৃশ্য।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

ইহা দাস গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন। সকলে বিষয়ী না হউক, প্রয়োজন বশতঃ বিষয়ী-সঙ্গ-প্রিয়-জন এক প্রকার সকলেই। তাহা হইলে পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি মহামান্য গুরুজনকেও উপেক্ষা করিতে হয়। হাটিতে বসিতে, সর্ব্ব কর্ম্মে যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ করিতে হয়। নচেৎ গৃহস্থ গৃহ রক্ষা করিতে পারেনা, এত বিচার করিলে শিবের ত্রিশূলে উঠিতে হয়। ত্রিতাপরূপ ত্রিশূল, আবার ত্রিশূল! কদাচার সম্বন্ধে কি বলিব, পান ভোজন ও বন্ধ হইয়া যায় পান "ভোজনেহপ্য প্রবর্ত্তনম্" ফেরোয়ারী আসামীর মত পলাইয়া ফিরিতে হয়। কদাচারে দেশ জাতি সমাজ এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। যে দিকে চাই, কেবল কংশের চর। যাই কোথা? প্রজল্প গ্রাম্য কথা বৈ লোক মুখে অন্যালাপ নাই, সর্ব্বদিকে কূট নীতির বাগুড়া ঘেরা। তোমার ভক্তি লইয়া থাকিতে হয়, গোলে না, ঐ ডোলে যাও, তথায় ও মশকদংশন (মশার কামড়)। এখন পন্থা কি? পন্থা, উপায়, গতি, নিস্তার, ভক্তি শিশুটীর প্রাণ বাঁচাইবার উপায়, একমাত্র ভগবৎ প্রসন্নতা। ভালমন্দ, সদসৎ, বিষয়ী অবিষয়ী তিনি চিনেন। তাই, অগতির গতি ভগবৎ প্রসন্নতা ইসার। তিনি যেমন সঙ্গ জুটাইয়া দেন তেমন সঙ্গেই বাস করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের অত বিচার করিয়া কূল পাওয়া যায় না। ভক্তি শিশুটীকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে, উনি কিছু বয়স্ক হইয়া কংসকে ও গলা টিপিয়া মারিবে ভক্তি যাহাকে এসব গলদ হইতে মুক্ত করিয়া নিয়া যান, তাহার অবস্থার চিত্রই ওসব শাস্ত্র বচন। ওসব আদর্শ সম্মুখে থাকা চাহি। নচেৎ কোন ক্রমেই ভক্তির প্রকর্ষ সাধিত হয় না। বড় হইলে ভক্তি নিশ্চয় সুমতির আনন্দ বিধান করিবেন। সংসার নিবিড় কাননে শাস্ত্র বিধি সমূহ মশাল স্বরূপ জানিবেন। বহু বহু বহির্ম্মুখ জন সঙ্গে থাকিয়া ও আমরা নির্লিপ্ত ভাবে ফাঁক তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারি এবং ঐ সব অমূল্য উপদেশ রত্ন ভাঙ্গিয়া ভক্তির পোষণ করিতে পারি। কারণ ভক্তি পোষণে ব্যয় বেশী।

ক্রমশঃ—

শ্রীকালীহর বসু।

ফাল্গুন মাস, ৭ম সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

ধিগশুচিমবিনীতং নির্দ্দয়ং মামলজ্জং
পরমপুরুষ! যোঽহং যোগিবর্য্যাগ্রগণ্যৈঃ।
বিধি-শিব-সনকাদ্যৈর্ধ্যাতুমত্যন্তদূরং
তব পরিজনভাবং কাময়ে কামবৃত্তঃ ॥

ছি ছি আমার আশাও তো কম নয়?—ও গো ও পরমপুরুষ! আমার আশাও তো কম নয়? ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি—চাই কি না তোমার দাসত্ব? অনন্ত-গরুড়াদি যাঁহার অপরিমিত পরিজন, তাঁহার কি আর দাসের কিছু অভাব আছে;—না, সেই সকল দাসের পাশে বসিবার আমার যোগ্যতাই আছে? বামন হ'য়ে চাঁদে হাত বাড়ানো, ছি ছি আমার আশাও তো কম নয়?

বলি হ্যাঁ গা, তুমি কি একটা যে সে সামগ্রী? যোগিজনের মধ্যে শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে যাঁহারা তোমার ভজনা করেন, তাঁহারাই হইলেন যোগীর শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠ যোগীদের যাঁহারা অগ্রগণ্য, তাঁহারাও ধ্যানযোগে তোমায় পাইয়া উঠেন না। অনেকের যাঁহারা উপাস্য দেবতা, সেই শঙ্কর বিরিঞ্চিও ধ্যানে তোমার নিকটে পঁহুছাইতে পারেন না। সনকাদি মুনিগণ—যাঁহারা ব্রহ্মচিন্তায় নিত্য নিমগ্ন, তাঁহাদের সমাহিত চিত্তও তোমার সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না। চিন্তামণি

তুমি সকলেরই চিন্তার অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। তুমি কি একটা যে সে সামগ্রী!! আর আমি? শাস্ত্র মানিতে হইলে আমার সঙ্গ করিতে নাই, ছায়াও মাড়াইতে নাই। আমি যে—লোক শাস্ত্র কিছুই মানি না, স্বেচ্ছাচারীর একশেষ। শাস্ত্র বলেন,—

"লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং ধর্ম্মশীলতা।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুর্য্যাত্তেন সঙ্গতিম্ ॥"

তবে?—তবে আমি কেমন করিয়া তোমায় বলি,—তুমি যজ্ঞীয় অন্নলোভী নির্ভীক কুক্কুরের মত বৃথা-সাহসী আমাকে "দূর দূর" করিয়া তাড়াইয়া না দিয়া পরিজনের মধ্যে পরিগণিত কর? ছি ছি, আমার আশাও তো কম নয়? ওগো ও পরম পুরুষ! আমার আশাও তো কম নয়?

ধিক্ ধিক্ শতেক ধিক্—আমায় যত বল ততই ধিক্! তোমার চাকুরি করিবার একট গুণও কি আমার আছে? নিত্য শুদ্ধ শান্তদোষ সিদ্ধ মহাপুরুষগণ—যাঁহারা তোমার কিঙ্করপদের প্রকৃত উপযুক্ত; তাঁহারাই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়? আমার না আছে দেহের শুদ্ধি, না আছে মনের শুদ্ধি, না আছে বাক্যের শুদ্ধি; আমি হইতেছি অশুচির একশেষ শাস্ত্রোক্ত সদাচারের তো ধার ধারি না, তখন দেহের শুদ্ধি হইবে কি প্রকারে? কুসংস্কার বলিয়া সেগুলাকে তো চিরকালই ঠেলিয়া রাখিয়াছি! সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক চিন্তাও তো নাই, তখন মনের শুদ্ধিই বা হইবে কিরূপে? বরং আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া এবং স্বাধীন-বুদ্ধির দোহাই দিয়া বরাবর তাহাদের অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছি। তার পর, পরচর্চ্চা পর-কুৎসা করিয়া-করিয়া, আর হরদম মিথ্যা কথা বলিয়াবলিয়া বাক্যের শুদ্ধিও বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। অমন রোচক সামগ্রীর লোভ তো সহজে সংবরণ করা যায় না, কাজেই বাক্যের শুদ্ধিতেও আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছি।

হইলাম না হয় অশুচি, একটু না হয় বিনয়ীই হই। অপর গুণ যত থাকুক আর নাই থাকুক, এক বিনয়েই সকলকে বশীভূত করিতে পারা যায়। দুঃখের কথা বলিব কি, সে গুণেও আমি বঞ্চিত, আমার মত অবিনীত

অবনীতে আর দুইটি নাই। কাহারাও নিকট মস্তক অবনত করাটাকে আমি আপনাকে অবমানিত করা বলিয়াই আবহমান কাল বুঝিয়া আসিয়াছি।

সুধু কি তাই? সকল ধর্ম্মের মূল হইল দয়া, অন্তঃকরণকে কোমল ও পবিত্র করিবার উপকরণ হইল দয়া; সেই দয়াতেও আমি একান্ত বঞ্চিত; আমার ন্যায় নির্দ্দয় আর দেখা যায় না। জীবের দুঃখ দেখিয়া একটি দিনও আমার প্রাণ কাঁদে নাই; তাহাদের দুঃখ দিতে বা হিংসা করিতে একটি দিনও আমি ইতস্ততঃ করি নাই। অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া ওটাকে আমি স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি।

অথচ সেই আমিই আবার এমন নির্লজ্জ এমন বেহায়া যে, নিজের যোগ্যতা বিচার না করিয়া; পরিণামে পরিহাসের কথা না চিন্তিয়া, পরম পুরুষ তোমার পরিচারক-পদ প্রার্থনা করিতে বসিয়াছি। ছি; ছি আমার আশাও তো অল্প নয়। ধিক্ ধিক্ আমায় শতেক ধিক্—যত বল ততই ধিক্!

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

রাজার নিকট কাঙ্গালিনীর প্রার্থনা।

রাজ রাজেশ্বর, দয়ার সাগর,
অনাথের নাথ তুমি।
বহু আশা করে তোমার দুয়ারে,
এসেছে এ অনাথিনী॥
কত দুঃখানলে, সদা হৃদি জ্বলে,
বল প্রভু কারে কব।
কে আছে এমন, দুঃখ নিবারণ,
ব্যথাহারী সম তব॥
তাই মর্ম্ম ব্যথা, হৃদয়ের কথা,
নিবেদিতে তব পায়।

এ ক্ষুদ্র অন্তর, উৎসুক আমার,
শুন প্রভু দয়াময় ॥
দুষ্ট রিপুদল, করি নানাছল,
সদা আসে মম পাশে।
প্রলোভন ময়, মধুর কথায়,
ভুলায় মনেরে শেষে ॥
অবোধ হৃদয়, বোঝে নাক হায়,
তাহাদের দুর্ব্বাসনা।
তাদের কুহকে, ভুলি আপনাকে,
তাদের ভাবে আপনা ॥
মোহ রিপু যেই, কি কুহকী সেই
অদ্ভুত কুহক তার।
অসত্য বস্তুকে, সত্য স্বরূপেতে,
দেখায় সে অনিবার ॥
তাই ভাবি সত্য অসত্যে আসক্ত,
হয় মোহাচ্ছন্ন মতি।
সে সুযোগ পেয়ে, অন্য রিপুচয়ে,
প্রবল হইয়া অতি ॥
দুর্ব্বল হৃদয়ে, সহজ উপায়ে,
করে শীঘ্র বশীভূত।
আনন্দে তখন, স্বকার্য্য সাধন,
করে তারা ইচ্ছামত ॥
কি যন্ত্রনা প্রভু, এমন তো কভু,
দেখিনি শুনিনি আর।
আসি মম পুরে, সব হল পরে,
নিজে আমি হৈনু পর ॥
তাদের অমতে, না পারি চলিতে,
এত তারা বলবান।

কোন শক্তি নাই, কিসে মুক্তি পাই,
কর প্রভু মোরে ত্রাণ॥
তুমি বিনা আর, আছে সাধ্য কার,
নাশিতে এ রিপুদলে।
তাদের তাড়না, আরত সহেনা,
রক্ষ প্রভু এ দুর্ব্বলে॥
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
শুনিয়াছি রাজ ধর্ম্ম।
নাশি দুষ্টগণে রক্ষি দীন জনে,
কর প্রভু রাজ কর্ম্ম॥
আর এক আশ, আছে শ্রীনিবাস,
পূর্ণ কর এবে মোর।
বড়ই দুঃখিনী আমি কাঙ্গালিনী,
নাশ দরিদ্রতা মোর॥
দাও হেন ধন, না কমে কখন,
ব্যয় করিলেও যাহা।
চাহি মনোমত, এই ধন যত,
দাও প্রভু মোরে তাহা।
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম, অনুরাগ হেম
আদি ধন কর দান।
দিয়া সেই ধন, পূজি ওচরণ,
নিত্য নিত্য এই কাম॥

শ্রীমতী নীলনলিনী দাসী।

কর্ম্ম ও ভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

"আপনাকে হীন মানা" সর্ব্বজীবে না ভক্ত সমাজে? এই প্রশ্নের যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে তাহা নির্দ্দোষ নয়। তাহার প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। কেবল ভক্ত গণ্ডীতে উহা সীমাবদ্ধ থাকিলে বৈষ্ণবের ভূষণ বিনয় দৈন্যের সুভঙ্গিম সুধা প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যায়। আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গদেব জাহ্নবী ঘাটে যাহার তাহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণ ভক্তি ভিক্ষা মাগিয়াছেন, শ্রীহস্তে তাহাদের সেবা করিয়া কতই ভাগ্য মানিয়াছেন। সে দিন শ্রীনবদ্বীপে সিদ্ধ ভক্ত রাজ জয় নিতাই শ্রীদেবেন্দ্র নাথ গলদশ্রু নয়নে গললগ্নী কৃতবাসে কুকুর বেশী বৈষ্ণব গণে মহা প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়াছেন। বিনয় নির্ব্বিশেষ অসীম সিন্ধু উহাতে ভক্ত ভাক্ত সব ডুবিয়া যায়। পাষাণ গলাইবার সোহাগা বিনয় বটে, বিনয় মন মাথার টোপ নয় যে, একবার মাথায় দিলাম, আবার খুলিয়া রাখিলাম। উহা মস্তকের শিখা স্বরূপ, সতত মস্তকে বিরাজ করে! মুখ চিনিয়া কেহ বিনীত হয় না। যে কাঙ্গাল, সে আপামর সর্ব্বসকাশেই কাঙ্গাল, নত। পাপীর সংসর্গে পড়িলেও বিনয় দৈন্য কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? "এই ব্যক্তির মত চলিবার, আচরণ করিবার, মুক্তি হেন জীবের শক্তি নাই "এই ভাবিয়া অতি বিনয়ের সহিত আমরা সরিয়া পড়িতে পারি। যাঁহার হৃদয় কাঁদ কাঁদ দ্রবীভূত, সে সকলের নিকটেই দীনাবনত পাশব বৃত্ত নর ও তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ভাল মানুষ হয়। সুতরাং দীনজন অজাতশত্রু, তাঁহার শত্রু নাই। নিঃশত্রু জনের ভক্তি পথে কণ্টক থাকে না।

"সৎ বা অসৎ সঙ্গ বলিতে এক সৎ অপর অসৎ বুঝায়। সুতরাং যুগপৎ সদসৎ সঙ্গ ঘটে। সৎসঙ্গ ও অসৎ সঙ্গতাই অভিন্ন কথা। "সৎসঙ্গে সৎ হয়," "অসৎসঙ্গে অসৎ হয়" এসব কথার মর্ম্ম অন্যরূপ বুঝি সৎসঙ্গে সৎ বা অসৎ হয়, একথা খাঁটি। অর্থাৎ অসজ্জন সৎ হয় বা সজ্জন অসৎ হয়। যাঁহার টান বেশী তাঁহার দল টিকে, দৈন্যেরই জয়লাভ হয়।

কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য, যাহা অতি সারবান্, যাহা শ্রীমদ্ভাগবত গাহিয়াছেন, তাহা এইঃ—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না জন্মে, যে পর্য্যন্ত মৎ কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মে সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম সকল অবশ্য করণীয়। শ্রদ্ধা জন্মিলেই কর্ম্ম জঞ্জাল বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শুভ কর্ম্মের বিরাম ঘটে। অতঃপর ভগবৎসেবামূল কর্ম্ম প্রবাহ স্বতঃই চলিতে থাকে। বাচালতা ভয়ে এখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। কথায় কথায় প্রবন্ধ অনেক বাড়িয়া পড়িল।

সমাপ্ত।

শ্রীকালীহর বসু।

সৎপ্রসঙ্গ।

—:০:—

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

চ। তুমি বলিতেছ যে মন জ্ঞান ভূমিতে উন্নীত হইলে বিবেক বৈরাগ্যাদি লাভ হয়, কিন্তু তাহা হইলে সংসারে থাকা হয় কিরূপে?

র। তোমাকে পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তোমার সন্দেহ দূর হইতেছে না কেন? ভাব ভেদে আশ্রম ভেদ হয়, স্থান ভেদে হয় না, ফলতঃ সংসারাদি আশ্রম সকল ভাব বাচক জানিও, জীব যাবৎ অজ্ঞানের স্তরে অবস্থান করে, তাবৎ মোহ ভ্রমে তাহার জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় সে অনিত্য বাসনার দাস মাত্র, বিষ্ঠা-পূর্ণভাণ্ড সিন্দূরের মধ্যে রাখিলেও যেমন তন্মধ্যস্থ বিষ্ঠা আতরে পরিণত হয় না সেইরূপ, এ সময়ে সে যেখানেই থাকুক বা যে আশ্রমই অবলম্বন করুক না কেন, তাহাকে পূর্ণ সংসারী বলিয়া জানিও, পরে সচ্চিন্তা, সৎকর্ম্ম ও সাধু সঙ্গের ফলে জ্ঞান লাভ করিলে যখন তাহার আপনার

ও সংসারের স্বরূপ বোধ হয়, কেবল তখনই সে ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিয়া চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ সম্ভোগ করে, ভোগ কর্ম্ম সন্ন্যাসের অন্তর্গত এবং প্রকৃত জ্ঞানীরাই এই কর্ম্মসন্ন্যাসের অধিকারি, রূপ রসাদি বিষয় পঞ্চ অজ্ঞানীগণেরই ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিয়া বিপথে লইয়া যাইতে পারে। অবসাদ গর্ভ ক্ষণস্থায়ী সুখ প্রদান করিয়া ভ্রমান্ধ জীবগণেরই সর্ব্বনাস করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীগণের অনিষ্ট করিতে পারে না, ভাব রূপ তৈলের দ্বারা সিক্ত থাকায় তাঁহাদের চিত্তে আসক্তির আটা লাগে না। চতুর মক্ষিকা যেমন আপনার পাখা দুইটি সাবধানে রাখিয়া মধু পান করে, সেইরূপ তাঁহারা জ্ঞান ও ভাব অব্যাহত রাখিয়া বিষয় ভোগ করেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মন অজ্ঞানে উপভোগ, জ্ঞানে ভোগ চৈতন্যে সম্ভোগ করে, ভোগে উপভোগের অতৃপ্তি গর্ভ মোহ বন্ধন নাই, পরিণামে তৃপ্তি প্রসব করে বলিয়া ইহা মোক্ষের সোপান স্বরূপ জানিও ভাবে রূপ রসাদির আস্বাদন করাকে ভোগ বলে, অবিদ্যাই জীবের কর্ম্মচক্র ঘুরাইয়া শুভাশুভ ফল প্রদান করে কিন্তু জ্ঞান লাভের পর যখন অবিদ্যা এই চক্র ত্যাগ করে, তখন হইতেই ভোগের আরম্ভ হয়, চাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছাড়িয়া দিলেও যেমন উহার পূর্ব্ববেগ প্রশমিত হওয়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া তবে স্থির হয়, সেইরূপ জ্ঞানীগণ অবিদ্যার হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইলেও সঞ্চিত বাসনার ক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত বিষয় ভোগ করেন, গন্ধের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া মক্ষিকা যেমন ভাণ্ডস্থিত মধুপান করে সেইরূপ তাঁহারা ভাবে বহির্জ্জগতের বিষয় ভোগ করিবার সময় উহাতে যে চিৎসত্তার আভাস পান, সেই আভাসই তাঁহাদিগকে অন্তর্জ্জগৎস্থিত চিদানন্দের উৎসাভিমুখে আকর্ষণ পূর্ব্বক সম্ভোগ প্রদান করে, ফলতঃ সংসারের স্বরূপ জ্ঞান হইলে তাহাতে আর মোহ জনিত আসক্তির আকর্ষণ থাকেনা, সুতরাং জ্ঞানীগণ সহজেই এই সংসারের পরপারে যাইতে সক্ষম হন, তুমি বোধ হয় মরুভূমি মধ্যস্থ মরিচীকার বিষয় শুনিয়াছ, যাহারা মরুভূমি ও মরিচীকার তত্ত্ব জানিয়া ও সঙ্গে ছত্র ও জল লইয়া উহা পার হইবার জন্য অগ্রসর হন তাঁহারা মরুভূমির তাপে অবসন্ন ও মরিচীকার দ্বারা আকর্ষিত ও প্রতারিত হন না, বরং মরুভূমিতে ঘাসের মত এক প্রকার ক্ষুদ্র লতা জন্মে, উহার তলদেশ হইতে বালি সরাইলে সরবতের ন্যায় সুস্বাদু বারি পূর্ণ এক প্রকার বৃহৎ ফল পাওয়া

যায়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে জল থাকিলেও সুবিধা মত উহা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, সুতরাং মরিচীকার শোভা তাঁহাদিগের বড় মনোরম বলিয়া বোধ হয়, ফলে এইরূপে মিথ্যার সত্যবৎ প্রকাশ বৈচিত্র দেখিয়া বিস্ময়যুক্ত আনন্দ ভোগ করিতে করিতে তাঁহারা যেমন গান্তব্য স্থলাভিমুখে অগ্রসর হন, সেইরূপ সংসার ও মায়ার তত্ত্ব অবগত থাকায় জ্ঞানীগণ যখন উহা অতিক্রম করেন তখন তাঁহাদের প্রত্যেক কর্ম্মে ভগবদ্ভাব অব্যাহত থাকে বলিয়া তাঁহারা সংসারে আসক্ত ও মায়ার-লীলা-বৈচিত্রে মুগ্ধ হন না বরং তাহার শোভা দর্শন ও অঘটন-ঘটন-শক্তি অনুভব করিতে করিতে সুখে অগ্রসর হন এবং আবশ্যক মত মরুভূমি-জাত ফলের মধ্যস্থ সুমিষ্ট বারি পানের ন্যায় সংসারস্থিত রূপরসাদির অন্ত-র্নিহিত চৈতন্য সত্তার সংসর্গ জনিত আনন্দ ভোগ করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করেন, নচেৎ মরুভূমির তত্ত্ব না জানিয়া উহা পার হইবার চেষ্টা করিলে যেমন তাপদগ্ধ ও পিপাসিত প্রাণে মরিচীকার দ্বারা আকর্ষিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, সেইরূপ বিবেক বৈরাগ্যহীন অজ্ঞান মানবের বহির্ম্মুখীন দৃষ্টি বিষয় পঙ্কের বাহ্য আকারে নিবদ্ধ থাকায় তাহারা উহার অন্তর্নিহিত রসমাধুর্য্য ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, অতৃপ্ত প্রাণে ভ্রান্ত লক্ষ্যের উদ্দেশে ছুটাছুটি করে ও শেষে অশান্তিময় জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তনে পতিত হইয়া যন্ত্রণা পায় মাত্র, ফলতঃ সমুদ্র হইতে রত্নলাভ করিতে হইলে যেমন প্রথমতঃ তাহার উপায় জানিয়া পরে তদুপযোগী পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধকাম হওয়া যায়, নতুবা ডুবিয়া মরা সার হয় মাত্র, সেইরূপ এই ভৌম-নরক হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া পরে ভাবা শ্রয়ে বিষয় ভোগ করা কর্ত্তব্য, নতুবা অধঃপতন অনিবার্য্য হয় জানিও, ভাই! ভোগ বৃক্ষেই মোক্ষফল ফলে, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, ও বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভোগ হইতে তৃপ্তি ও তৃপ্তি হইতে মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া যেন উপভোগ কে ভোগ বলিয়া ভুল করিও না, মনে রাখিও যে বিচার ও ভাব যুক্ত বিষয় রসাস্বাদন করাকে ভোগ বলে, মৃত্তিকা ও জলের যোগে বীজের ন্যায় জ্ঞান ও ভাবের যোগেই এই ভোগ বীজ তৃপ্তির আকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে মোক্ষফল প্রসব করে, ফলে ভোগ ভিন্ন প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, যে মূঢ় সাময়িক আবেগ বশতঃ ভোগের

পূর্ব্বেই অহংকারের দ্বারা ত্যাগের অভিনয় করে, পরিণামে তাহাকে কপট ও মিথ্যাচারী হইয়া অধঃপতিত হইতে হয়, অতএব সংসার রূপ ভৌম-নরক হইতে উদ্ধার হইতে হইলে জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ভাবে বিষয় ভোগ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ভাই! ভোজনের পূর্ব্বে খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ ও সুখকর বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ভোজনান্তে যেমন উহা ভাল লাগেনা, সেইরূপ ভাবাশ্রয়ে বিষয় ভোগ করিবার সময়ে বিষয় নিহিত চিদাভাস তাৎকালীন সুখের কারণ হইলেও সাধক যখন সেই আভাস অবলম্বন পূর্ব্বক স্বরূপ চৈতন্যের আনন্দ রসাস্বাদ করিতে সক্ষম হন, তখন বিষয় সুখ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, সুতরাং এই সময়ে ত্যাগ আপনা হইতে সিদ্ধ হয় জানিও নচেৎ ঃ—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে (গীতা ৩।৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আসক্তিযুক্ত চিত্তে বিষয় স্মরণ করে, সেই আত্মবঞ্চনা কারীকে মিথ্যাচারী বলা যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

অমৃত প্রসাদ।

(পাগল হরনাথ)

১। ভালবেসে যে না কাঁদে তার ভালবাসা ভালবাসাই নয়; সোণায় যেমন সোহাগা, প্রেমের তেমনই কান্না; দুয়েই গলায় ও বিশুদ্ধ করে।

২। মায়া শূন্য স্থানই কৃষ্ণের আলয়, অতএব, যেখানে কৃষ্ণনাম হয়, সেখানে তিনি নিশ্চয়ই থাকেন, কেননা নাম শুনে মায়া পলায়ন করে, অতএব যাঁহারা সদা নাম করেন, তাঁহারা কৃষ্ণ রাজ্যেই বাস করেন।

৩। মানুষ যত দিন প্রকৃত হীরা না চিনিতে পারে, ততদিনই সামান্য কাচকেই হীরা মনে করে, তারই আদর যত্ন করে এবং তাহাকেই মূল্যবান

মনে করে; তার অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকে, একবার হীরা চিনিলে আর তার কাচ কুড়াইতে ইচ্ছা হয় না।

৪। সামান্য মদ একজনকে মাতাল করে, কিন্তু একজন কৃষ্ণপ্রেমী জগৎকে মাতাইতে পারেন।

৫। জীবের প্রতি প্রেম ভালবাসা একটু একটু বাড়াইতে বাড়াইতে কৃষ্ণ প্রেম আসিবে, সাধারণ প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম শিখাইবার জন্যই ভ্রান্ত জীবকে প্রভু সংসারে নিজ হইতে পর, পরে পরকে ভাল করিবার জন্য সম্বন্ধ স্থির ক'রে দিয়াছেন।

৬। যখন কেবল সম্বন্ধটী ছাড়ে তখন ঐ ভালবাসাই বিশ্বপ্রেম হয়।

৭। সাপ থেকে দূরে থাকাই ভাল; সাধুর বিচার করিবেন না, যত দিন না সাপুড়ে হবেন, ততদিন কোন সাপকেই ধরিতে যাবেন না।

৮। মুসলমান যতই যত্নে মুর্গী পালুক না কেন, এক দিন না যেমন একদিন তার গলাতে ছুরী বসায়, তেমনই যতই মায়ার নিজের হই না কেন মায়া কিন্তু কখনই দয়া ক'রে ছাড়িয়া দেয় না।

৯। বিচার বুদ্ধির অনুসরণ ক'রে যাঁরা প্রভুকে লাভ করিতে চান তাঁরাই প'ড়ে হাবুডুবু খান, অন্ধ হইয়া যাঁরা কৃষ্ণের শরণ হন, তাঁরা আর কোন পরীক্ষাতে পড়েন না, পড়িলেও যিনি পরীক্ষক তিনি পাশ করিবার উপায় দেখাইয়া দেন।

১০। তুমি শূদ্র, আমি ব্রাহ্মণ এ চিন্তা কোন কাজের নয়, এ চিন্তা আমার নিকট নাই আমার "জাত খেয়ে রেখেছে ঘরে গৌরাঙ্গ গুণমণি"।

১১। কৃষ্ণ কিনিবার একমাত্র মূল্য লালসা, সেই বস্তুটী দিন দিন বৃদ্ধি করুন, অচিরেই কৃষ্ণ হস্তগত হবেন, কোথাও লুকিয়ে থাকৃতে পারবেন না। বিরহিনীর স্বামী অনুরাগ যেমন, স্বামী সোহাগিনীদের সোহাগের কথা শুনে দ্বিগুণ বাড়ে, তেমনই যদি কৃষ্ণ অনুরাগিনী হইতে চান, বিরহিনীদের মত যাঁরা স্বামী সোহাগে গ'লে রয়েছে তাঁদের সঙ্গ করুন, দেখিবেন আপনিও তাঁর প্রেম পাইবেন, যেখানে গেলে স্বামীর কথা শুনিতে পাবেন, সেইখানেই যাবেন আর যাঁর সঙ্গে স্বামীর কথা শুনিতে পাবেন, তার সঙ্গই সদা প্রার্থনা করিবেন।

১২। পথের পথিকের সঙ্গ ব্যতীত গৃহবাসীর সঙ্গে পথের কথা কহিতে যাইও না, তাহাতে সুখের বদলে দুঃখই পাবার সম্ভাবনা।

১৩। চারে মাছ আসিবার পূর্ব্বেই যেমন জল আলোড়ন ও চতুর্দ্দিক সামান্য বিচলন হইয়া শীকারীকে মাছের আগমন জানাইয়া দিয়া খুসী করে, তেমনই ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণচন্দ্র আসিবার আকুলতা আসিয়া ভক্তকে আনন্দে নিতান্ত কাতর করে, ইহারই নাম পূর্ব্বরাগ।

১৪। যারা একবার গৌর বলেছে, যারা জলে নামিয়াছে, একদিন না এক দিন মাছ ধরেই উঠ্‌বে, অতএব সাবধান, সামান্য মাত্র ভেখ্‌ধারী সাধুকেও কদাচ ঘৃণা করিবে না।

১৫। সাধুর ভাল মন্দর বিচার আপনি করিতে যাইয়া আইনকে আপনার উপর আনা মূর্খতা মাত্র। বিচারের ভারটা বিচারককেই দেওয়া ভাল।

১৬। ঔষধ খেলেই ফল পাওয়া যায় না, ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, তেমনি নামরূপ মহৌষধির সেবনের সঙ্গেও কতকগুলি নিয়ম পালন আছে, যত্নে সেগুলি পালন করিলেই ভবরোগ নিবারণ হইয়া জীব কৃতার্থ হয়।

১৭। সেই চতুরে হাত এড়াইতে হইলে বেশী চাতুরীর আবশ্যক। তাই দেখে চণ্ডীদাস বলেছেন "কানুর সঙ্গে পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই। যদি যাইবি দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে, দাঁড়াবি পূরব মুখে"। এ কেমন বাবা, "এতে স্থির থাকিবে যে, কৃষ্ণ পাবে সে।"

১৮। হাতে আয়না পেয়ে যা'রা চাঁদ নেবার কান্না ছাড়ে না, তারা মার খায়, তাতেও ভুলে না শেষে পাইয়াই থাকে। তাই বলি বাবা, যারা কৃষ্ণ চান, তারা বেশ চারিদিকে পাকা না হলে কখনই মনের মত পান না।

দীন—রসিকলাল দে।

প্রার্থনা।

—:০:—

মম, মলিন চিত্ত, ভুলেছে সত্য,
মত্ত মায়ারি ঘোরে।
তব, মধুর মূর্ত্তি, লাবণ্য ভাতি
পরাণেতে নাহি স্ফুরে॥
মোর, সদা এ অন্তর, হের অনুর্ব্বর,
না আছে রসের লেশ।
শান্তি বিলুপ্ত, তাপেতে তপ্ত
বিশুষ্ক, বিবর্ণ বেশ॥
আমি, শুনেছি শুনেছি তুমি রসময়,
রসিক নাগর বর।
ওহে, আকুল আহ্বানে ডাকিলে তোমারে,
রহিতে না পার থির॥
মম, মরমের কথা, হৃদয়ের ব্যথা,
প্রাণের আকুল ধ্বনি,
তব, শ্রবণ বিবরে, পশিয়াছে যদি
হে বরেণ্য গুণ মণি!
তবে, কোমল পরশ, যোগেতে সরস
কর এ কঠোর প্রাণ।
ঘোর, আঁধারেতে ঢাকা অন্তর মাঝে
কর হে আলোক দান॥
নাথ, এ বিদগ্ধ চিত, কর পরিণত
কুসুমিত মধু কুঞ্জে।
উহা, হউক শোভিত, প্রেমের প্রবাহ
আর, ভাবের প্রসূণ পুঞ্জে॥

পরে, সে কুঞ্জ কাননে, হে কুঞ্জ বিহারি ?
তুমি এস, তুমি এস।
আর, নাগরীর সনে মধুর মিলনে,
হৃদয় জুড়িয়ে বস ॥
আমি, সখীর অনুগা হইয়ে, অদূরে
অলক্তক রাগ ল'য়ে।
তব, মঞ্জীর ভূষিত রাঙ্গা পা'য় পানে
থাকি, তৃষিব নয়নে চেয়ে ॥

দীন হীন—শ্রীরসিকলাল দে।

শ্রীঅদ্বৈতের প্রতিজ্ঞা।

—::—

(১)

"হরিনামে" নিষ্ঠাহীন,
দেখি সবে নিশি দিন,
প্রভুর পরাণে কত ক্ষোভ অশ্রু ক্ষরিছে।
"হরেকৃষ্ণ হরি হরি"
সঘন হুঙ্কার করি,
সুনীল নলিন আঁখি সদা দেখি ঝরিছে!

(২)

চন্দন তুলসী দলে,
পবিত্র জাহ্নবী জলে,
শ্রীবিষ্ণু শ্রীপাদপদ্ম স্মরি নিত্য সঁপিছে!
হা প্রভু তোমায় কবে,
প্রকট দেখিব ভবে,
জগৎ তরিয়া সবে হরিনাম জপিছে!"

(৩)

পাষণ্ড পাতক বাণী,
শুনিয়া আমার প্রাণি,
দারুণ শোকের দাহে দিবানিশ জ্বলিছে।
শুন বিশ্ব বাসিগণ,
শুন ভক্তাভক্ত জন,
শ্রীঅদ্বৈত প্রাণগণ এ প্রতিজ্ঞা করিছে ;

(৪)

হরিকে আনিয়া ধামে,
মাতাইব প্রেম নামে,
এ বিশ্ব মেদিনী মনে মুহু মোর জাগিছে ;
সাধন ভজন ভবে,
এ মোর সার্থক তবে,
সার্থক মানিব, যবে সবে প্রেম মাগিছে !

(৫)

বিশ্ব পাপ তাপ যাবে,
সবে হরিগুণ গাবে,
হরির প্রেমের ভিক্ষা সবে ভবে যাচিছে ;
মিছা মায়া পরি হরি,
সবে কবে "হরি হরি,"
হরি বোলে প্রেমরোলে সকলেই নাচিছে !

(৬)

দ্বেষ হিংসা শোক দিয়া,
প্রেমেতে পূরিবে হিয়া,
মূর্ত্তিমান্ হরি প্রেম বিশ্বমাঝে বহিছে ;
সুধাভরা "হরিনাম,"
মাতাইবে মর্ত্ত্যধাম,
প্রেমের তরঙ্গে মুহুঃ মন প্রাণ মোহিছে ;

(৭)

তবে এ শান্তির ধাম,
এ মোর "অদ্বৈত" নাম,
সার্থক মানিব ; মোর মন প্রাণ জানিছে !
অমোঘ শান্তির জল,
সিঞ্চিয়া সকল স্থল,
মহামঙ্গলের ধ্বনি চতুর্দ্দিকে হানিছে !

শ্রীহরি চরণ দে,

উপদেশামৃত।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীল পাগল হরনাথ ঠাকুরের উক্তি)

যৌবনকালে স্ত্রী বিয়োগ হইলে সে সময়ে স্ত্রীর অভাব কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারা যায় না, কিন্তু সেই যৌবনকালের অভাব বৃদ্ধ বয়সে বিশেষরূপ অনুভূত হয়, তবে Exception ও আছে।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব, যতদিন পূর্ণ যৌবন থাকে, বৃদ্ধ বয়স আসিতে আরম্ভ হইলে মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। তবে যৌবনে মনুষ্যত্বকে পাকা করিতে পারিলে, বৃদ্ধ বয়সে উহার খুব কম হ্রাস হয়।

মা ও পৃথিবী এই দুই সমান, পৃথিবী যেমন খননকারীর অনিষ্ট করে না, মা ও তেমনি পুত্রের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল কামনা করেন না। কোন গাছ শূন্যে রাখিলে এবং তাহাতে জল ঢালিলে যেমন সেই গাছ কোনরূপে বাঁচেনা, তেমনি মাকে ভক্তি করিতে উপেক্ষা করিলে কোন রকমে তাহার মঙ্গল হয় না।

সকল সাধন ও ভজনের সময় যৌবনকাল, যৌবনকাল হ'চ্চে পূর্ণিমার চাঁদ। কলার বৃদ্ধি ও হ্রাসের মধ্য অবস্থা হ'চ্চে পূর্ণিমার চাঁদ। controlling

power অর্থাৎ সাধন শক্তি এই পূর্ণিমার অবস্থায় পূর্ণ থাকে, পরে ক্রমশ কমিতে থাকে, এই জন্যই যৌবন কালই সাধন ভজনের সময়। যৌবনের সময় একবার কৃষ্ণ বলিলে আর তার বিনাশ হয় না। কৃষ্ণ ও সেই যৌবন-যুক্ত লোককে সাদরে গ্রহণ করেন।

মনের ন্যায় তরল পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই, সেই জন্যই সদা চঞ্চল। মনকে স্থির রাখিবার উপায় নাম লওয়া। অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে যেমন সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া চঞ্চল হয়, মনও তেমনি সেই সময়ে চঞ্চল হয়, এই জন্যই একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতিতে উপবাস করিবার বিধি। উপবাস যে দিন করা যায় সে দিন নাম করিতে কেমন আনন্দ হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ।

ঈশ্বর অপ্রাকৃত দেহ বিশিষ্ট হইলেও আমাদের নিকট আসিবার সময় তাঁহাকে প্রাকৃত অবস্থাপন্ন হইতে হইবে, নচেৎ আমাদের সন্মুখে কখনই আসিতে পারিবেন না। আবার অপ্রাকৃত দেখিতে গেলে, সেই সময় আমাদিগকেও ভাবময় দেহ বিশিষ্ট হইতে হইবে, তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা, দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।"

সুখ দুই প্রকারের (১) যেমন নেশা ক'রে আনন্দ করা (২) আর অন্য লোককে নেশা করিয়ে আনন্দ বা সুখ অনুভব করা। রসগোল্লার ঢেঁরীর বা স্তূপের কাছে ব'সে থাকার চেয়ে ময়রার কাছে ব'সে থাকা ভাল, কারণ রসগোল্লা ফুরিয়ে গেলে আর রসগোল্লা পাওয়া যাইবে না, কিন্তু ময়রার কাছে ব'সে থাকলে যখন ইচ্ছা রসগোল্লা খাইতে পাওয়া যাইবে।

সেইরূপ ঐশ্বর্য্যের কাছে থাকার চেয়ে ঐশ্বর্য্যের মালিকের নিকট থাকা ভাল।

প্রভুর সহিত পিরীত রাখিলে একদিন না একদিন কৃতার্থ হওয়া যাইবে।

পৃথিবীর সমস্তই দ্রব্য ভাবে পূর্ণ, সেই ভাব সকল উদ্দীপন করিতে ভক্তির আবশ্যক।

প্র। কামিনী ভাল কি মন্দ ?

উ। যাহারা সাঁতার দিবার ইচ্ছা করে, তাহাদের একটী কলসী বগলে লওয়া ভাল, এমন কি যে সাঁতার জানে, তাহারও কলসী লওয়া নিরাপদ, সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সাঁতার জানে সে কিয়ৎ-দূর সাঁতার দিয়া কলসী বহার কার্য্যকে নিন্দা করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারে কলসী বহায় অন্যায় হয় নাই, বরং তাহা ধরিয়া সাঁতারের ক্লান্ত দূর করিতেছে। আমাদের মতন দুর্ব্বল লোকের ভবনদী পার হবার ইচ্ছা থাকিলে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক বিবাহ করা উচিত।

প্র। মৃত্যুর পর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, বাপ, মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ থাকে না?

উ। মৃত্যুর পর ভবনদীর স্রোতে ইচ্ছা থাকিলেও পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে ও কেহ কাহার খবর রাখিতে পারে না, তখন আবার নূতন নূতন সঙ্গী মিলে। তবে প্রকৃত ভালবাসা দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিলে, স্রোতে আর বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তাহারাই কেবল জন্মে জন্মে একত্র ভ্রমণ করিতে থাকে, এই ভাল বাসায় আবদ্ধ হওয়া সংসারে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্ভব নয়। আদান প্রদানে ভালবাসার সম্পূর্ণ পুষ্টি সাধন হয়, আর এই ভাল-বাসায় প্রভু বাঁধা থাকেন।

প্র। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়ে কি?

উ। ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সকল স্থানেই পড়ে, যেমন সূর্য্যের আলো, চিত্ত শুদ্ধ না হইলেও প্রভুর প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়ে, তবে সে ব্যক্তি বা অপরে সেই প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না। যে গরীব, পুকুর পরিষ্কার করিতে পারে না বা অবস্থায় কুলায় না, তাহার পক্ষে পুকুরের মোয়ান কাটিয়ে দেওয়া ভাল, মোয়ান্ কাটালে বেনো জল ঢুকিবে ও শেওলা ইত্যাদি পচিয়া জল পরিষ্কার হইবে, তখন পরি-ষ্কার জলে প্রতিবিম্ব পড়িলে সকলেই দেখিতে পাইবে। অতীব নরাধম রূপ পাপীর মনরূপ পুকুরে বদগুণ রূপ শেওলায় পূর্ণ থাকিলে প্রবল ইচ্ছারূপ মোয়ান্ কাটিয়ে দয়াল নিতাইর দেওয়া নামরূপ বেনো জল প্রবেশ করাইলেই জল আপনি পরিষ্কার হইবে, তার কোন সন্দেহ নাই। এই হ'চ্চে পাপী জীবের সরল পথ।

"মহা প্রভুর প্রলাপ" এই খানি কিরূপ? যেমন গাছ হইতে তোলা ফুলের শোভা, আর "চৈতন্য চরিতামৃত" কিরূপ? যেমন গাছে ফুল ফুটিয়া আছে, তাহার শোভা।

প্র। প্রভুর সম্বন্ধে পরস্পর আলাপ করা অপেক্ষা নিজে নিজে নাম করা কি ভাল নয়?

উ। প্রভুর সম্বন্ধে কথা কহা আর কিছুই নয় যেমন বাসর ঘরে জেগে কেহ গান, কেহ গল্প ইত্যাদি করে, কারণ সকলেই সাবধান থাকে পাছে তাহারা ঘুমাইয়া না পড়ে। নিজে নিজে যখন নাম করিতে ভাল না লাগে, সেই সময় তাঁহার-বিষয় আলোচনা করা ভাল।

প্র। যিনি ভাবে বিভোর, তিনি বহিরঙ্গ দেখিলে ভাব সম্বরণ করিতেন কি করিয়া?

উ। যেমন বৌরা স্বামীর সহিত আলাপ করিবার সময় অপর লোক দেখিলে ঘোমটা টানে সেইরূপ।

প্র। যে একবার প্রভুর চরণে শরণ লয়, সে কেন আবার তাঁহার নিকট হইতে দূরে যায়?

উ। প্রভুর সহিত একবার পিরীত করিয়া যদি কেহ পুনরায় অন্যায় কার্য্য করে, তাহাহইলেও তার আর বিচ্ছেদর কখনই সম্ভাবনা থাকে না। স্ত্রী স্বামীতে বিচ্ছেদ হইলে, স্ত্রী যেমন স্বামীর কথা শুনেনা বরং স্বামীর যাহাতে অসন্তোষ হয়, সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে এও ঠিক্ তেমন। আমারা দেখিতে পাই কেহ কেহ বিচ্ছেদ অবস্থায় আজন্ম কালই এইরূপ স্বামীর অসন্তোষ জনক কার্য্য করিতেছে, কিন্তু প্রভুর পক্ষে বিশ ত্রিশ বৎসর পলক মাত্র, হয়তো এরূপ পলক বাদে স্বামী আবার স্ত্রীকে নিকটে লইয়া বুকে ধরিলেন, তাই তাঁহার সহিত একবার পিরীত হলে আর তার বিনাশ থাকে না।

উর্দ্ধরেতা না হইলে উজানে যাওয়া যায়না। উজানে না গেলে বংশী ধ্বনী শুনা যায় না, বংশী ধ্বনি না শুনিলে প্রেম আসে না। উর্দ্ধরেতাঃ দুই প্রকারে হওয়া যায় এক প্রকার, মস্তিস্কের দ্বারা, অন্য প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা।

প্র। যদি উর্দ্ধরেতা হওয়া আবশ্যক, তবে বিবাহ করার দরকার কি?

উ। কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই বিবাহের উদ্দেশ্য নয়, প্রণয় বা ভালবাসা শিক্ষা করিবার জন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে হয়, ভালবাসার উৎপত্তি স্থান হচ্চেন প্রকৃতিরা, তাই ভালবাসা শিক্ষা করিতে হইলে স্ত্রী-রূপ গুরুর প্রয়োজন। তাঁহাদের নিকট হইতে ভালবাসা শিক্ষা হইলে তবে সেই ভালবাসায় প্রভুকে বাঁধা যাবে।

প্র। যদি বিবাহের উদ্দেশ্য ছেলের জন্ম দেওয়া না হয়, শাস্ত্রে কে ন আছে?

উ। যে, কৃষ্ণ-বশ করিবার ভালবাসা, স্ত্রীর নিকট হইতে শেখে, তার ছেলের প্রয়োজন থাকে না, সে হচ্চে বিধি আইনের বাহির, তার শ্রাদ্ধ তর্পণের প্রয়োজন কি? তবে যে বিধি আইনের অধীন, তার পুত্রের আবশ্যক।

প্র। আমরা তো উর্দ্ধরেতা নই বা হ'তে পারবনা, তাহলে কি আমরা উজান যাইতে পারিব না?

উ। যদি উচ্চ পর্ব্বতে উঠ্‌তে অসমর্থ হই আর প্রবল ইচ্ছা থাকে যে, ঐ পর্ব্বত শিখরে উঠ্‌ব, তাহলে একদিন না একদিন পর্ব্বতে উঠ্‌ব তার কোন সন্দেহ নাই। ইচ্ছা বলবতী হইলে ফলবতী হহতে অধিক বিলম্ব লাগে না। উর্দ্ধরে-তা হবার লালসা থাক্‌লে এক দিন না এক দিন দয়াল নিতাই উর্দ্ধরেতা করিয়া উজান বহাইবেনই।

প্রভু আমাদিগকে সকল জিনিষ দিয়া থাকেন, যে যখন যাহা চাহে তিনি সেই সকলি দেন, কিন্তু একটী জিনিষ তিনি দিতে পারেন না সেটী হচ্চে "প্রেম।" কারণ প্রেমের কপি বা নমুনা তাঁহার নিকটে নাই, তবে যে প্রেমের প্রার্থনা করে, তিনি তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লন ও তখন প্রেম দেন। কাহাকেও প্রেম লইয়া তাঁহার নিকট হইতে আসিতে দেন না।

সাধন সিদ্ধের ও কৃপা সিদ্ধের তারতম্য। যখন কেহ প্রভুর নিকট হইতে তাঁহার ভাণ্ডারের চাবি পায় ও ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য পরীক্ষা করিতে করিতে প্রভুর নিকট হইতে সেই সকল দ্রব্যের গুণও মূল্য জানিয়া তটস্থ হইয়া বিচারের পর কোন জিনিষ ইচ্ছামত প্রার্থনা করে, তাহারই নাম সাধনা ইহাতে সিদ্ধ হইলেই তাহাকে সাধন সিদ্ধ বলে।

আর প্রভুর ভাণ্ডারে প্রবেশ করিব না, কোন দ্রব্যের বিচার করিব না কেবল প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, হে প্রভু! তুমি যে দ্রব্যটী তোমার ভাণ্ডারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেইটীই আমাকে দাও, ইহারই নাম ভিক্ষা ও ইহাতে সিদ্ধ হইলে কৃপাসিদ্ধ বলে।

তিলক সেবা ও মালা ধারণ আর কিছুই নয় জাতীয় চিহ্ন মাত্র, তিলক মালা ঝোলা এই তিন বৈষ্ণব নিসানা।

তিলক সেবা ও মালা ধারণের আবশ্য। যেমন কোন ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-পবীত দেখিয়া নীচ্‌ জাতীয় লোকেরা ব্রাহ্মণের সম্মান দিয়া থাকে; এইরূপ

অনবরত সম্মান পাইতে পাইতে যেমন সেই ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হয় বাস্তবিক ব্রাহ্মণের নিয়ম পালন করিতে, ঠিক্ সেইরূপ বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ করিতে করিতে কখনও না কখন সত্য সত্য বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা হইবে। তিলক সেবা মালা ধারণে লাভ ছাড়া লোক্‌সান নাই।

গীতাতে চারি প্রকারের ধর্ম্ম আছে, কিন্তু সরল পথে, ভাবে যে ধর্ম্ম অন্বেষণ করিয়া থাকে তাহাতে কোন দোষ হয়না। একজন পথিক যাইতে যাইতে সন্ধ্যা হইলে, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্য্যোগ করিয়া আসিলে সে যেমন যথা তথা সরাইএর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে ও লোকে তাহার ব্যাকুলতায়, যথার্থ সরাই প্রার্থী বুঝিয়া, তাহাকে সরাই এর কথা বলিয়া দেয় ও সেই পথিক সরাই পায়। এই সরাই এর কথা যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা তর্ক কখনই হইতে পারেনা। তবে যে বাটী হইতে বাহির হইবার পুর্ব্বে কোথায় সরাই আছে, কোন্‌টা ভাল ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে তাহাকে তর্ক করা বলে।

ভারতবর্ষ ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল, কেন্দ্রস্থলে থাকায় সম্যক আলোক উপলব্ধি হয় না, যত দূরে যাওয়া যায়, ততই এর আলোর বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তাই আমেরিকা প্রভৃতি দেশ বাসীরা ভারত বর্ষের ধর্ম্মের এত প্রশংসা করিতেছে। হরি-হর নামে একজন চৌকীদার একটা কয়েদী লইয়া অন্য কোন জেলে যাইতেছিল, পথে সেই কয়েদিকে বসাইয়া সে আহ্নিক করিতে বসে, এমন সময় সেই কয়েদি সুবিধা বুঝিয়া পলায়ন করে। কয়েদি ছাড়া অপরাধে হরিহর অভিযুক্ত হয়। হাকিম হরিহরকে জিজ্ঞাসা করেন;—তুমি কয়েদি ছাড়িলে কেন? তাহাতে সে বলে, সে ছাড়ে নাই "হরিহর" ছোড়াই দিয়া। দ্বিতীয় দিন বিচার হইবে এমন সময় সেই পলাতক কয়েদি আগ্রা আদালতে আসিয়া আত্ম-সমর্পন করে। হাকিম তাহার ফিরিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কয়েদি বলে, সর্ব্বদা বন্দুক হাতে চৌকীদার ধরিতে আসিতেছে, ইহা, সে শয়নে স্বপনে দেখিতেছিল ও এ কয়দিন কোনরূপ শান্তিতে ছিলনা, শেষ বিবেচনার পর আত্ম সমর্পন করিতে হাজির হইয়াছিল। কয়েদির দুই বৎসরের স্থলে ছয় মাস জেল ও হরিহর নামক চৌকীদারের উচ্চ পদ লাভও পরে পেন্সিয়ান হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

দীন—রসিকলাল দে।

শিবরাম।

——:০:——

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

আমরা অবলা কুলেরি বালা, বিকির সময় বয়ে গেল হ'ল অবেলা, পথে বড় প্রমাদ হ'ল বল-গো কোথায় দাঁড়াই !! যদি গো হেথায় রাত্রি হ'য়ে যায়, কাছে নাই কেউ অন্তরঙ্গ হবে কি উপায়, শিবরাম কয় ঐ নবমেঘ অন্তরঙ্গ হবে রাই ॥"

শ্রীমতীর ধাঁধাঁ ভাঙ্গিয়া দিয়া বড়াই উত্তর দিতেছেন,—

"জলদ নয় গো জলদ বরণ। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা বুঝি শ্রীনন্দ নন্দন॥ এই অনুমান মনে মেঘ থাকে গগনে, এ মেঘ হ'লে তরুতলে থাকিবে বা কেনে ; (হাঁ গো) মেঘে কোথায় বাজায় বাঁশী কে শুনেছে আর কখন॥১॥ ইন্দ্র ধনুর প্রায়, চূড়া দেখা যায়, পীতাম্বর বিজোরীর মত অঙ্গেতে খেলায় ; (আর) বক পাঁতির মত, হৃদয়ে দেখি চন্দন॥ মেঘ শব্দ নয় বলি, ঐ বাজে মুরলী "জয় রাধে শ্রীরাধে" ঐ বনমালী ; দ্বিজ শিবরাম বলে গান ছলে হবে মিলন ॥৩॥"

শিবরাম রচিত রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক অনেক গান আছে। সমস্ত গুলি প্রকাশ করিতে "ভক্তি"র ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। যৎ কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম মাত্র। বৃদ্ধাবস্থায় শিবরামের মন সংসারের অনিত্যতা চিন্তায় ব্যস্ত, তাই তিনি তদবস্থায় মনের ভাব "তত্ত্ব-সঙ্গীতে" প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত তত্ত্ব সঙ্গীতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। জীবনের শেষ দিন ত নিকট হইয়া আসিতেছে, প্রবৃত্তির পথ ছাড়াইয়া, প্রাণ, পবিত্র নিবৃত্তির পথ ধরিয়াছে। পার্থিব বস্তুর উপর মায়া বিদূরিত হইয়াছে, সংসারের মরীচিকাময়ী নেশার ঘোর ছুটিয়াছে। অনুতপ্ত হৃদয় শিবরাম প্রাণ ভরিয়া গীত ধরিলেন।

"না ভজিলি কেন শ্রীগুরু চরণ ? জেনেও তা জানিস্ না রে মন,॥ গেল

সুখের দিন, হল তনুক্ষীণ, দিন দিন দিন গণি শমন॥ দারা সুত ধনে সদা অনুগত, গুরু দত্ত ধনে হইলি বঞ্চিত, চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইব কত; আজ বাদে কাল হবে যে মরণ। ভাল থাওয়া ভাল বস্ত্র পরিধান, তুচ্ছ কর্ম্মে অতি উচ্চ করি, জ্ঞান,' ভক্তি পথে হলি অন্ধের সমান, গুরু বই কে আছে ভবের তারণ? পরিণামে পাবি কত না যন্ত্রনা, সাধু সঙ্গে তার না কৈলে মন্ত্রনা, আমার হ'য়ে কর্‌লি আমায় প্রবঞ্চনা শিবু বাবু হ'ল জন্মেরই মতন।"

"এমন কে দয়াল আছে? ও মন হেথা সেথা করিস্ মিছে॥ হরি গতি দাতা, ভব পারের কর্ত্তা, নৌকা ল'য়ে ঘাটে বসে রয়েছে। স্তনে বিষ ল'য়ে পুতনা তাহারে, পান করাইল বধিবার তরে, তবু মাতৃগতি হরি দিয়েছে। হিরণ্য কশিপু দৈত্যের প্রধান, অগ্নিকুণ্ডে ফেলে আপন সন্তান, প্রহ্লাদ ডাকে হরি কর পরিত্রাণ, হরি গিয়ে তারে কোলে করেছে। বলি রাজা দেখ দৈত্য অধিকারী, তার ভক্তি জোরে বদ্ধ হ'য়ে হরি, গোলক বিহারী হাতে গদা করি, বলীরাজার দ্বারী হ'য়েছে॥ ধ্রুবের যখন অতি অল্প বয়ঃক্রম, হরি আরাধনে কত্তে নারে শ্রম, বৈকুণ্ঠ উপরে নিজে ত্রিবিক্রম, নিজ হাতে পুরী গ'ড়ে দিয়াছে॥ যে বা ভজে পুজে ডাকে হরি নাম, যেমন চায় হরি দেন মোক্ষধাম, সে তিনে বঞ্চিত হল শিবরাম, কপাল গুণে সে যে ফাঁকে পড়েছে॥"

"করে যে হরি ভজন। ওতার কি কাজ আছে অন্য সাধন॥ ত্রিজগতের গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু হরি করেন তার অভীষ্ট পূরণ। হরি পরিহরি নানা দেবে মতি, ইহ পর কালে সে পায় দুর্গতি, মনে জেন সেই নিতান্ত দুর্ম্মতি, গঙ্গাতীরে কূপ কাটেরে যেমন। মণি-মালা ত্যজি কাষ্ঠমালা পরে তুলসী ত্যজিয়ে নিমের আদর করে, শিবু বলে আমি চিন্তে নারি তারে, মধু ত্যজি করে গরল ভক্ষণ॥"

সাবধান এই ভবের হাটে। ওরে গেঁঠেল চোর গেঁঠেরী কাটে॥ সঙ্গে আছে ধন, করিয়ে যতন, গোপন ক'রে বেঁধে রাখ্‌বি পেটে। হাটে সবাই বলে আপন আপন বোল, বেচা কেনায় দেখ হ'য়েছে মহা গোল, কাণে লাগে তালা, বিষম উচ্চরোল, ভুয়ো গণ্ডগোলে শ্রবণ ফাটে॥১॥ দেখে শুনে নিবি পেলে ভাল ফল, ফিকির ক'রে যেন বনায় না পাগল, দোকান পেতে আছে বড় বড় খল, পড়িস্ নাকো যেন ঘোর সঙ্কটে॥২॥ জন পাঁচ ছয় আছে চেনা চোর, মিছা মিছি তারা লাগায় ফের্‌ঘোর, লোকে করে বশ দেখাইয়া

জোর, কার সাধ্য তাদের ফাঁকিতে আঁটে ॥৩॥ ভাল দেখে সঙ্গী ক'রে নিবি ভাই, কুলোকের সঙ্গে কথা কৈতে নাই, শিবু বলে আমার থাক্‌তো যদি তাই, কাল, চৌকীদার ধরে কি জটে।"

ক্রমশঃ

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

দুটী গান।

—:০:—

(১)

(খাম্বাজ।)

আহা মরি মরি কিরূপ মাধুরী নেহারি আজি নয়নে।
তোমার, কৌপীন কটীতে ধারণ জয় শ্রীহরি বোল বদনে ॥
অঙ্গে লাবণ্য কিবা ঝলকে, পুলকিত চিত প্রতি পলকে,
পাপীর বিস্তার করিতে ভুলোকে, এলে নররূপে ভুবনে ॥
কণ্ঠিমালা গলে দোলে, মোহন তিলক শোভিছে ভালে,
ভাবে গদ গদ লুটি ধরাতলে, বিতরিছ প্রেম যতনে ॥
ত্রিলোক তলে তুমি হে ধন্য, ভকত সম্পদ শ্রীচৈতন্য,
দেহি কৃপা বিন্দু তোমার পুণ্য-পদাশ্রিত ললিত মোহনে ॥

(২)

(প্রসাদী)

প্রেম-বিনা কি মিলে সে ধন ?
প্রেম-ময়ের রাজ্যে ব'সে কর না কেন প্রেম-উপার্জ্জন ॥
ওরে, জ্ঞান প্রদীপে ভক্তি বত্তিতে, দেনা ঢেলে প্রেমের তৈল এখন,—
আপ্‌নি জ্বল্‌বে আলো, ঘরে কেবল, পুলকে পুরিবে মন ॥
সৃষ্টি ধরের সৃষ্টি খানা নয়ন ভ'রে দেখ্‌ না কেমন ;—

মরি কি কৌশলে, প্রেম শৃঙ্খলে, বেঁধে হায় রে কর্‌ছে পালন ॥
প্রেমের হাসি, প্রেমের কান্না প্রেম দাতারই নিদর্শন—
ওরে, প্রেমের বাজার, বড়ই মজার, লাভ দ'রে লয় চতুর যে জন॥
প্রেমই সত্য, প্রেমই নিত্য সেই রসতে মজনা মন।
নেয়ে খেয়ে চল্‌না ধেয়ে দেখ্‌বি যদি যুগল চরণ ॥

শ্রীললিত মোহন মণ্ডল।

আত্মোপদেশ।

কত দিন রহিবে ঘুমায়ে মন
বুঝি মোহ ঘুম ভাঙ্গিবে না।
দিনে দিনে দিন যে ফুরায়ে এলো,
এখনও হ'ল না চেতনা ॥
আশার ছলনে ভুলি' হৃদি পটে,
আঁকিছ কত সুখ কল্পনা।
নিরাশা তরঙ্গ আসিয়ে নিমেষে,
মুছিবে সকলি তা জাননা ॥
তখন সম্বল শূন্য হৃদি খানি,
জীবন কেবলি বিড়ম্বনা।
তাই কহি মন, থাকিতে সময়,
পাথেয় সঙ্গে ল'তে ভুলোনা ॥
ষড় রিপু দাস কদাচ হইয়ে,
নশ্বর সুখেতে মজিও না।
যত দিন আছ ভবে হরি বল,
মন, ঘুচিবে ভব যাতনা ॥

বড়ই সুমধুর বোল হরি বোল,
প্রাণ ভরে বারেক ডাকনা।
যা'বে রে ঐ নামে সুধা ধারা ব'য়ে
কর দেখি, মন, আরাধনা॥
শয়নে, স্বপনে আর জাগরণে,
হরি বলতে কভু ভুলোনা।
অঙ্গে লেখ হরি, হৃদে জপ হরি,
ঘুচে যাবে ভবে আনাগোনা॥

শ্রীচুনীলাল চন্দ্র।

শ্রীকৃষ্ণচরণে।

——:ː০——

ওরে মন প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণচরণে,
রুচির সুরুচি শ্যাম, বৃন্দাবন লীলাধাম,
অগোচর যোগী ঋষিগণে।
বৃক্ষলতা আদি যত, সকলেই আছে নত,
সর্ব্ব অভিমত হন হরি,
হরি বই মিছা সব, নিষ্ঠ ইষ্ট সে কেশব,
মূলাধার তিনি সকলেরি।
অপূর্ব্ব মোহন বেশ, প্রথম পক্ষের শেষ,
চন্দ্র যেন উদয় গগনে,
সেইপদ বাঞ্ছাকর, অবিশ্রান্ত রূপ হের,
প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে।
চরণে নূপুর সাজে, রুনুঝুনু শব্দে বাজে,

শব্দ শুনি স্তব্ধ অলিকুল।
তাহাতে মগরা রাজে, কিবা অপরূপ সাজে,
তুলনায় অতিব অতুল॥
রম্ভা তরু জিনি উরু, সাজে কটী কি সুচারু
নীল মেঘে চাঁদ পীতধড়া।
পীতবাসে ক'রে বাস, কিঙ্কিণীটি সুপ্রকাশ,
চাঁদ ভূষা তার কার বেড়া॥
কটীপরে মেরু প্রায়, তাহে চিহ্ন শোভা পায়,
ভৃগু চিহ্ন দয়াময় গুণে।
হেন দয়াময়ে মন, কর সদা আরাধন,
প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥
ভুবাহু বাঁশরী ধরা, বাঁশী স্বর পুরে ধরা,
রাধা রাধা স্বরে প্রাণ হরে।
একে সে মোহন বাঁশী, বাজাইতে কালো শশী,
সুধা মাখা রাধা নাম স্বরে॥
বাহুতে বলয় ভাল, কেমাহি বলয় ভাল,
ভাল তাঁর নয় কোন খানে।
গোলোকের প্রাণধন, লীলায় করিয়া মন,
লীলা স্থান কৈল বৃন্দাবন॥
দয়া কর দয়াময় তব পদে বাঞ্ছারয়,
অসার সংসার তোমাবিনে।
ওরে মন এই ভাব, সদা ঐ পদ পাব,
প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥
গলে বৈজয়ন্তি হার, হারে মনি পরিহার,
পড়ে বক্ষে শোভে চমৎকার।
বিদ্যুতের আভা প্রায়, কালোমেঘে শোভা পায়,
দেখ মন শোভার ভাণ্ডার॥
নীলপদ্ম মুখ শোভা, পক্ক বিম্বাধর আভা,

দন্তপংক্তি মুকুতা ঝলকে।

দুই হনু জিনি ভানু, দেখিলে পুলকে তনু,

নয়ন না ফেলায় পলকে॥

শুক চঞ্চু নাসা প্রায়, কঞ্জ চক্ষু শোভা পায়,

তারকা ভ্রমর মধুপানে।

ওরে মন মধুকর, হেন মধু পান কর,

প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥

গৃধিনী নিন্দিত কর্ণে, শোভিত সুবর্ণ বর্ণে,

কুণ্ডল ঝলকে জ্যোতিসার।

মুখ চন্দ্র সুপ্রকাশে, অলকারাহুতে গ্রাসে,

অর্দ্ধগ্রাস শোভার সুসার॥

শিখি পুচ্ছ চূড়া শোভা, তায় মুক্তা মনো লোভা,

বামদিকে লক্ষিছে সদাই।

কি কব বর্ণনা আর, চিত্র যাঁর চমৎকার,

বামে শোভে রসবতী রাই॥

এমন কি দিন পাব', হেন রূপ নিরখিব,

নীলকান্ত জড়িত কাঞ্চনে।

রে ইন্দ্র প্রপঞ্চ ছাড়, সদা ঐ পদে পড়,

প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে॥

দীন—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য।

সোণার ফুল।

গোপী ভাব কল্প, লতিকার শিরে,

একটী সোণার ফুল;

ফুটিয়া কেমন, শোভিছে সুন্দর,
নদীয়া জাহ্নবী কুল!
ফুলের সৌরভে, ভুবন ভরিয়া,
উঠিছে, মঙ্গল রোল,
মধু পান লোভ আশে, মধুর পিয়াসে,
মাতিছে মধুপ কুল।
করণিকা যেন, মর-কত-মণি,
সেণার কউটা মাঝে।
ভুবনে অতুল, অপ্রাকৃত ফুল,
মরি! কি সুন্দর সাজে!!
যে দেখে এ ফুল, হারায় সে কুল,
আকুল হইয়া মরে।
কুলের কামিনী, ত্যজি কুল খানি,
অকুলে ডুবিয়া পড়ে॥
দেবগণ আসি, মানবের বেশে,
দেখয়ে ফুলের শোভা॥
কোন্ বিধি জানি, গড়িল এ ফুল,
জগ জন মনোলোভা॥
কাঙ্গাল বিজয়, মনো দুঃখে কয়,
গুরু হয়ে অনুকুল;
কবে এ দীনের, হৃদয় কাননে,
ফুটাবে সোণার ফুল!!

বৈষ্ণব দাসানুদাস,　　শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

৺গোসাঞিরাম।

—:০:—

সাধুর জীবন এক অতুল সৌন্দর্য্যময় অমৃত প্রস্রবণ। কল্পবৃক্ষ সকল ইহার উপর চন্দ্রাতপ ও ছায়া রচনা করিয়া আছে এবং ফলদানে অতিথির তৃপ্তি সাধন করিতেছে। তৃষিত জীব এই প্রস্রবণ বারি গণ্ডুষে পান করিয়া তৃপ্ত হয়না প্রাণের পিপাসা৷ তাহাতে তাহার মজেনা; তাই এককালীন উহাতে ঝাঁপ দিয়া ডুবে। "সুখ সুখ" সবে খুঁজেন, কিন্তু কেহই সুখের মুখ দেখিতে পাননা তাহার সন্ধান পাননা। সুখ যে সাধুর জীবনাকাশের চাঁদ, তাহা যিনি জানেননা তাহার তন্ন তন্ন "তল্লাস পাণ্ডশ্রম মাত্র। আমি অধম, বামণ হইয়া সে চাঁদে হাত দিতে বহুদিন প্রয়াস পাইতেছি চাঁদ ধরিতে পারিনা, কিন্তু তাহার অমৃত কিরণ কণা লাভে এককালে বঞ্চিত নহি। তাই বলিয়া ভক্তের জীবনানুশীলনে সময় সময় চিত্ত বেশ ধাবিতহয়!

ঢাকা বিক্রমপুরের মধ্যে হাঁসাড়া একখানি বহুজনাকীর্ণ সুন্দর বড়গ্রাম। উহাকে নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। ইহাতে বড়বড় বিদ্বান চাকুরিয়া অনেক আছেন। ভদ্রলোক সংখ্যা বেশি হইলেও একপ্রকার সর্ব্বজাতিরই প্রদর্শনীক্ষেত্র হাঁসাড়ার আলামগাজী ও আলামগাজীর দীঘি দেশপ্রসিদ্ধ বটে। আলামগাজী একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার দরগা অদ্যাপি বিদ্যাবান ও সুসেবিতা। কিম্বদন্তী এইযে আলামগাজী সাহেব একরাত্রি মধ্যে উক্ত দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ মাইল। এই দীঘির পূর্ব্বপারে ৺গোসাঞিরামের আখড়া।

রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে গোসাঞিরাম বাউলের জন্ম হয়। হাঁসাড়াই ইহার জন্মস্থান। ইনি কখনও দারপরিগ্রহ করেন নাই। উপনয়নকালে তিনি যে যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, উহাই তাঁহার জীবনব্রত হয়। কুমার গোসাঞিরাম যজ্ঞোপবীত ধারণের পর ২।৩ বৎসর নানাস্থানে অজ্ঞাত ভাবে পর্য্যটন করেন, ইহা তাঁহার অসামান্য বা দৈব শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট। ১১ বৎসর বয়সে তিনি নিজাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং একখানি আশ্রম স্থাপন

পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। আশ্রম কি, ভিক্ষাবৃত্তি কি, মানব জীবনের সারলক্ষ্য কি, তত্ত্ব কি, এসব কথা যেন এই জন্মসিদ্ধ বালক অবগত; তাই বালকে ধর্ম্মের আচরণ, তাহাও শোভনীয়। উপনয়নের পর পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি কভু ব্যক্তি বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই বা অন্য দ্বারা প্রতিপালিত হন নাই। তিনি রীতিমতে শিক্ষাদিও প্রাপ্ত হন নাই। ইনি বালকদেহেই যে একজন সুশিক্ষিত যুবক বা বৃদ্ধ বাস করিতেন তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। গোসাঞিরাম সম্বন্ধে এসব বৃত্তান্ত বাস্তবিকই অলৌকিক ও বিস্ময়কের সন্দেহ নাই। তাঁহার জ্ঞান শিক্ষাদি পূর্ব্বার্জ্জিত ছিল। বিদ্যা বুদ্ধিতত্ত্বাদি সব তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ ছিল। যাঁহারা পূর্ব্ব জন্ম মানেননা তাঁহারা গোসাঞিরামের আখ্যায়িকা পাঠে বেশ সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারিবেন এমন আশা করি। অনেকগুলি লোক তাহার দৈবশক্তি প্রভাব দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত হন। তৎসূত্রে তাঁহার স্থাপিত কুটীরাশ্রম পাটমন্দির বা আখড়ায় পরিণত হয়।

গোসাঞিরাম সাধনাসিদ্ধ নহেন কোন মহতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে কোন সম্প্রদায় মধ্যে ধরা যায় না। তবে, লোকে তাঁহাকে বাউল বলিত। তিনি স্বভাব ও ব্যবহার দ্বারা ক্ষেপা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি লোককে "শালা" কি "কাউয়া (কাক) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহা ক্ষেপার এক লক্ষণ। বয়স যখন ২০ বৎসর, তখন তিনি এক ধেপোনিকে আখড়ায় আশ্রয় দিয়া রাখেন। তাহাকে তিনি "মা-তারা" ভাবিতেন। কালে প্রতিবেশী বালাকুড়ির সহিত এই রজকীর আসক্তি জন্মে। তাহাতে গোসাঞিরাম বিরক্ত হইয়া কুড়িকে অভিশাপ দেন "তোর কুষ্ঠরোগ হউক্"। বালাকুড়ির পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবেই হইল। গোসাঞিরাম বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন এই তহার এক প্রমাণ।

গোসাঞি বাউল জীবনে অনেক বড় বড় মহোৎসব করিয়াছেন। তদ্ব্যয় কিভাবে সঙ্কুলণ হইয়াছিল, তাহা কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহার মহোৎসবে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ প্রচুর অরক্ষিত ভাবে ছড়ান থাকিত; কাক ও কুক্কুর তাড়াইবার প্রয়োজন থাকিত না কারণ তাঁহারই সিদ্ধপ্রভাবে কাক কুক্কুরাদিকে অবশিষ্ট না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহারা নিজে প্রসাদাদি স্পর্শ দ্বারা উৎপাত করিতনা। কাক কুক্কুরাদি ইত্তর জন্তুর সেবার্থেও তিনি মহোৎসব করিতেন।

তিনি সর্ব্বজীবে অসাধারণ রূপে সমদর্শী ও দয়ালু ছিলেন। কাকাদির জন্য মহোৎসব করিতে কাহাকেও বড় দেখা যায় না। এই অশিক্ষিত ক্ষেপা বাউল তা করিতেন।

আজ প্রায় ১২৫ বৎসর অতীত হইল, অনুমান ৫০ বৎসর বয়সে তিনি দেহ রাখিয়াছেন। জীবন ভরিয়া তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য অটল ছিল। তাঁহার চরিত্র অতীব নির্ম্মল ছিল। প্রতিবেশী কি আগন্তুক মেয়েদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক মাতৃ-ভাব ছিল।' মেয়ে দিগকে সতত "মা" বলিয়া তিনি সম্বোধন করিতেন। তিনি শৈশবে যে শিশু, চির জীবন সেই শিশুই ছিলেন। তাঁহার যৌবন ও বার্দ্ধক্য মাত্র দেহের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি দুগ্ধবতী প্রসুতি মেয়েদের পাইলে বলপুর্ব্বক তাহাদের স্তনদুগ্ধ পান করিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেন। তাঁহার এই রূপ আচরণে কেহই বিরক্ত হইতেন না কি তাহাদের বা তাহাদের আত্মীয় স্বজনের চিত্তে কোনরূপ পাপভাব আসিত না বরং যুবতী গণ নিজদিগকে অতিভাগ্যবতী ও ধন্যা মনে করিতেন। যুবতীগণ বাৎসল্য প্রেমে তাঁহাকে পুত্র পাইয়া সুখে বিভোর হইতেন! গোসাঞিরাম যেন জগতের পুত্র!—বাৎসল্য প্রেমের কি অনুপম নিদর্শন! গোসাঞিরাম! তুমি কি গোসাঞিরাম?—না, আমরা বলি তুমি ব্রজগোপাল! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মালিনীদেবীর স্তন পান করিতেন। আমাদের বিশ্বাস, সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ তোমার এই পবিত্র দেহে প্রকাশ পাইয়া আবার সেই লীলার প্রচার করিয়া গেলেন।

গোসাঞি বাউলের পদে সতত নুপুর পরা থাকিত এবং হাটিতে নাচিতে উহা মধুর "রুনুঝুনু" বাজিত তাহাতে ভক্ত বৃন্দ বড় আনন্দ লাভ করিতেন এবং গোপাল ভাব তাহাদের চিত্তে জাগরিত হইত।

গোসাঞিবাউল ভবিষ্যত সব হৃদয়ে জানিতে পারিতেন। ছিটু মোল্লানামক জনৈক প্রতিবাসী তাঁহার একখানি কাপড় চুরি করিয়াছিল। শিষ্যগণ চোরকে ধরিয়া প্রহার করাতে বাউল গোসাঞি বলিলেন, "আরে, ওকে মারিস্‌নে, ও যে মরা। বস্তুতঃ কয়েক বৎসর পরে খুনের অপরাধে ছিটু মোল্লার ফাঁসি হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীহর দাসবসু।

ভক্তি।

চৈত্র মাস, ৮ম সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

অপরাধসহস্রভাজনং

পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।

অগতিং শরণাগতং হরে!

কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎকুরু ॥

দূর কর দুরাশায়,—অত উচ্চ আশা না হয় না-ই করিলাম,—তোমার দাস-পদ না হয় মুখ ফুটিয়া না-ই প্রার্থনা করিলাম, তা বলিয়া কি প্রভু! তোমারও কিছু করিবার নাই? আমার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, আর বিচার কর, এই আমার প্রতি তোমারও কি কিছুই করিবার নাই?

অবশ্য, তোমার যদি ঐ কৃপা না থাকিত,—যে কাহারও অপেক্ষা করে না, কাহারও তোয়াক্কা রাখে না, অধিক কি তোমাকেও পাত্রাপাত্র কিছুরই বিচার করিতে দেয় না, সেই মহামহীয়সী কৃপা না থাকিত, তাহা হইলে আমি আর তোমার কাছে কিছুই বলিতে সাহসী হইতাম না। একাএকা না দেখিয়া, ঐ কৃপার সহিত তুমি একবার আমার প্রতি কটাক্ষপাত কর,—আমার অবস্থাটা হইয়া পড়িয়াছে কি?

দেখ, আমি বড় সহজে তোমার আমলে আসি নাই। নিজের ধন-জন শক্তি-সামর্থ্য প্রভৃতি থাকিতে কেহই বড় তাহা আসে না, আমিও আসি নাই।

ঐ সকলের গরবে তখন মেজাজ ভারি গরম, অপরাধ কাহাকে বলে, খেয়ালই ছিল না। তাই একধার হইতে সেগুলি সবই করিয়া ফেলিয়াছি। হিংসা বল, মিথ্যা কথা বলা বল, পররমণীর সঙ্গ বা পরের সামগ্রী চুরি করা বল এ সকল করিতে আর আমার কিছুই বাধে নাই। ক্রমে মাত্রা বেশী হওয়ায় থলী ভারি হইয়া গেল। আর তখন আপনাকে সাম্‌লানো ভার। তখন পড়্‌তো পড়্‌—একেবারে ভীষণ ভবসাগরের অগাধ সলিলে। কি করি, যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। সেইখানে পড়িয়াই হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। যত চেষ্টা করি ব্যর্থ হইয়া যায়। অথচ অবিশ্রান্ত তরঙ্গের উপর তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত। নিজেরও আর শক্তি নাই। অপর কাহারও সাহায্য পাইবার আশা নাই। তখন মাথার টনক নড়িল। তোমার কথা মনে পড়িয়া গেল। অনুতাপের তীব্র তাপে প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আর থাকিতে পারিলাম না। বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলাম—হায় কেন তোমার দাসত্ব ছাড়িয়া বিষয়ের দাসত্ব করিতে গিয়াছিলাম? অমনি যেন মোহন বেশে তুমি আমার পাশে আসিয়া গেলে। আর আমিও আমার অবসন্ন দেহ মন বচন সকলই তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। অনেক ঠেকিয়া—হাড়েহাড়ে দাগা পাইয়া তবে আমি তোমার আমলে আসিয়া গেলাম। এখন সেই আমি, তোমার সম্মুখে অসাড় আড়ষ্ট দেহে ভয়াবহ ভবসাগরেই পড়িয়া রহিয়াছি। এ দেখিয়া তুমিই বল, তোমার কি কিছু করিবার নাই? তোমার ঐ প্রফুল্ল নয়নে একটু তোমার কৃপার প্রলেপ দিয়া দেখিয়া বল, এ গতিহীনের প্রতি তোমার কি কিছু করিবার নাই?

দেখ, এ সংসারে যাঁহারা সাধু-সজ্জন বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও কখনও শরণাগতকে উপেক্ষা করেন না, সে পিতৃহত্যাপাতকে পাতকী হইলেও উপেক্ষা করেন না, আর সেই সাধুদের আরাধ্য তুমি, কি বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিবে বল দেখি? এ কথা আমার কল্পনার জল্পনা মনে করিও না; ইহা সেই প্রাচীন প্রসিদ্ধ পদ্যেরই অনুবাদ মাত্র। সেটাও তোমায় শুনাইয়া দিই—

> "শরণঞ্চ প্রপন্নানাং তবাস্মীতি চ যাচতাম্।
> প্রসাদং পিতৃহন্তৃণামপি কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥"

আর এক কথা, তুমি যদি আমার প্রতি করিবার কিছু না-ই দেখিতে পাও, তবে তোমারওই যে "হরি" বলিয়া নামটি, ও নামটি যে তোমায় ছাড়িয়া দিতে

হইবে, সঙ্গেসঙ্গে শাস্ত্রের কথাকেও মিথ্যা বলিতে হইবে? কেন, তাহাও বলি। শাস্ত্র তো তোমারই শাসনবাক্য, সে তো আর মিথ্যা হইবার নয়? সেই শাস্ত্র শতসহস্র স্থানে তোমার ওই দু'আঁখরে নামের কত মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোথাও বলিয়াছেন—

"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।"

আবার কোথাও বলিয়াছেন,—

"হরণাদেব দুঃখানাং হরিরিত্যভিধীয়তে॥"

এমনও কোথাও দেখিতে পাই,—

"পরমাপদমাপন্নো মনসা চিন্তয়েদ্ধরিম্॥"

হরি হে, এ সকল কথা কবির উক্তি কিম্বা অতিস্তুতি বলিয়া উড়াইয়া দিব, না, ঐ ধরণের অপর কিছু মনে করিব, তুমিই বলিয়া দাও। তোমার নাম, তোমারই শাস্ত্র, তুমি না বলিলে ইহার উত্তর অপরে কে বলিতে পারিবে বল?

তা তুমি উত্তর দাও আর না-ই দাও, তুমি যখন 'হরি', তখন আমি তোমায় জোর করিয়াই বলিতে পারি, মহাপাপী মহা অপরাধী হইলেও জোর করিয়া বলিতে পারি, আমি যখন তোমার নাম লইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি, তখন আমার প্রতি তোমার কিছু কর্ত্তব্য আছেই আছে। সে কর্ত্তব্য যে কি, তাহা কিন্তু আমি বলিতে পারিব না। তোমার কর্ত্তব্য তুমিই জান,—তুমিই কর। আমি কেবল এইটুকুই বলিয়া রাখি, আমার দুঃখ দূর করিয়া—পাপতাপ প্রশমিত করিয়া তোমার কাজ নাই। বিষ্ঠার কীট আমি বিষ্ঠাতেই পড়িয়া থাকিতে প্রস্তুত, তুমি কেবল ইহাই কর,—আমার উপর আমার যে 'আমার'—নামের মোহরটি মারা আছে, সেইটি উঠাইয়া দিয়া তোমার তরফের একটি 'আমার'-নামের মোহর মারিয়া দাও, আর আমি 'আমার' বলা ছাড়িয়া দিয়া 'তোমার তোমার তোমার' এই মহামন্ত্র আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করি। তা তুমি বলিবার অধিকার না দিলে তো আর আমি ও কথা বলিতে পারিতেছি না, তাই এই প্রার্থনা। হরি হে! তোমার আর কিছু করিয়া কাজ নাই, তুমি কৃপা করিয়া কেবল আমাকে 'আমার' বলিয়া মানিয়া লও।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

ভক্ত ও ভগবান।

—:o—

"প্রাণেশ্বরী! তোমাকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসি, তুমি আমার হৃদয়ের আলো ও জীবনের শান্তিরূপিনী, মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার বিরহ আমার পক্ষে অসহ্য।"

এইরূপ সম্বোধন করিতে করিতে যোদ্ধৃবেশধারী এক সুন্দর যুবা পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, পত্নী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছিলেন তিনি স্বামীর বাক্য শুনিয়া মৃদুহাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! তোমার ভালবাসা সমস্তই মৌখিক, যদি প্রকৃতই আমায় ভাল বাসিতে, তবে আমার বাসনা পূর্ণ করিতে বিলম্ব করিতে না।

যুবক কহিলেন প্রিয়ে! তোমার কোন বাসনাপূর্ণ করিনাই কি; ধন, জন, মান, স্বামীসোহাগ প্রভৃতি রমণীর কোন্ প্রার্থনীয় বস্তু তুমি না পাইয়াছ?

যুবতী কহিলেন নাথ! এ সকলতো ক্ষণস্থায়ী সম্পদ, আমি চাই যাহাতে তুমি নিত্য সম্পদের অধিকারী হও, তোমার মার্জ্জিত চিত্তে যাহাতে শ্রীভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে, আমাদের এ মিলনে যেন বিচ্ছেদ না হয় অনন্তকালের জন্য যেন আমরা শ্রীভগবানের নিত্য সংসারে স্থান পাইয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করি। প্রিয়তম! যদি তুমি সাধনপথে অগ্রসর হইয়া কখন ভগবৎ প্রেমের আস্বাদ পাও তখন বুঝিবে যে, সে আনন্দের নিকট এই ক্ষণস্থায়ী মোহজনিত আবেশ কত তুচ্ছ।

যুবক একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দেখ! রাজকার্য্যে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া একটু বিশ্রাম ও আনন্দ লাভের জন্য তোমার নিকট আসিলাম, কোথায় তুমি হাসিমুখে একটু আলাপ করিবে, তাহা না করিয়া কেবল কতকগুলা নীরস বাক্য প্রয়োগে আমার মনে বেদনা দিতেছ।

স্বামীর বাক্য শুনিয়া পত্নী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

যুবকের নাম "অঙ্গদ রায়" এই মহাতেজস্বী বীর পুরুষ মহারাজার খুল্লতাত

ও রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, শত্রুর নিকট কৃতান্ত সদৃশ হইলেও এই সরল প্রাণ ও সংসার সর্ব্বস্ব যুবক পত্নীকে বড়ই ভালবাসিতেন, পরমা সুন্দরী প্রিয়তমার রূপ ও প্রণয়ের মোহে সদাই আত্মহারা থাকিতেন।

তাঁহার পত্নী যে কেবল সুন্দরী ছিলেন তাহা নহে তিনি সাধ্বী ও পরমা বৈষ্ণবী, স্বামীকে যে ইষ্টদেবের সহিত অভেদ মনে করা উচিত তাহা তিনি জানিতেন, ও সেইজন্য স্বামীর মধ্যে সেই জগৎ স্বামীর প্রকাশ দেখিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু হায় ! তাঁহার আশা মিটিত না, অনিত্য বাসনার মোহে তাঁহার স্বামীর চিত্ত আবরিত থাকায় তাহাতে দেবভাবের বিকাশ হইত না, তিনি কায় মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন যাহাতে তাঁহার স্বামীর এই পশুভাব দূর হয়, কিন্তু রূপমুগ্ধ স্বামীর ইন্দ্রিয়ানলে আপন দেহ আহুতি দেওয়া ভিন্ন আর কিছু করিতে পারিতেন না বলিয়া দুঃখিত থাকিতেন।

সাধ্বীর প্রার্থনা বিফল হইবার নহে, শ্রীভগবানকি ভক্তের শুদ্ধ বাসনা পূরণ না করিয়া থাকিতে পারেন ! ফলে একদিনের একটী ঘটনাচক্রের আঘাতে অঙ্গদের মোহজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, তাঁহার নবজীবন লাভ করিবার সূচনা হইল।

অনেকদিন পরে গুরুদেব আসিয়াছেন, অঙ্গদের স্ত্রী ভগবদ্ বুদ্ধিতে ভক্তি ভরে তাঁহার সেবা করিতেছেন এমন সময় তাঁহার স্বামী রাজসভা হইতে বাড়ীতে আসিলেন, আসিয়াই অন্দরের মধ্যে পরপুরুষ দৃষ্টে ক্রোধে অন্ধ হইলেন, যেখানে কাম সেইখানেই ক্রোধ ও সন্দেহ, কামান্ধ অঙ্গদ এ পর্য্যন্ত তাঁহার পত্নীর বাহ্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন, কিন্তু মনের অভ্যন্তরে যে কি অমূল্য রত্ন সকল নিহিত আছে তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। সুতরাং তিনি সেই সাধ্বীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। গুরুদেবও বাদ গেলেন না সেই মহাপুরুষকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিবার সময়ে অঙ্গদ তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন যে,—"কেবল লোকলজ্জা ও কলঙ্ক প্রকাশের ভয়ে তোমার রক্ত দর্শন করিলাম না কিন্তু সাবধান ! এমন অসম সাহসের কার্য্য আর কখনও করিও না।"

এই বিষম ব্যাপারে অঙ্গদ পত্নীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল তিনি মূঢ় স্বামীর অধিকৃত দেহ ত্যাগ করিয়া অসৎ সঙ্গও গুরুর অপমান জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত

করিতে সংকল্প করিলেন, পূর্ব্বদুস্কৃতির ফলস্বরূপ সেই ভীষণ মনস্তাপের অবসান করিবার জন্য মনকে ইষ্টদেবের চরণে সংযুক্ত পূর্ব্বক আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মর্ম্ম বেদনা প্রসূত অশ্রুজলে ভক্তপ্রাণে শ্রীহরির পাদপদ্ম সিক্ত হইতে লাগিল।

কাষ্ঠের সর্ব্বস্থানে অগ্নি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকিলেও যেমন ঘর্ষন স্থানে প্রকাশ পায়, সূর্য্যরশ্মিতে অগ্নি অব্যক্তভাবে থাকিলেও যেমন সপ্রস্তরে কেন্দ্রিভূত হইলে ব্যক্ত হয়, সেই ব্যাকুলতার দ্বারা ভক্তের চিত্ত তরঙ্গ গুলি কেন্দ্রাভিমুখিন হইলেই সেই চৈতন্য স্বরূপে সর্ব্বব্যাপি শ্রীভগবান জ্যোতীঘন রূপে ভক্তের ভাবও বাসনানুযায়ী আকার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় মন্দিরে অবিভূর্ত হন, অঙ্গদ পত্নীর নির্ব্বেদ ভাবাপন্ন মন বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহিত হইয়া ভগবন্মুখীন হইবামাত্র অন্তরে সেই সর্ব্বতাপহারী চিন্ময়মূর্ত্তির বিকাশ হইল। আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল, ফলে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান তাঁহাকে অভয় ও প্রত্যাদেশ দান পূর্ব্বক তাঁহার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে পত্নীর অবস্থা দেখিয়া স্ত্রৈণ অঙ্গদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, যাঁহার অতুলনীয় রূপে ও মধুর হাস্যে তাঁহার প্রাণ মন সুশীতল হইত সেই নয়নের আলোক ও হৃদয়ের আনন্দ স্বরূপিনী সুন্দরীর প্রাণত্যাগের সংকল্প শুনিয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, সেই ভীষন সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য তিনি পত্নীকে কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। তখন তিনি আকুল প্রাণে বলিয়া উঠিলেন, প্রাণেশ্বরী! বল আমাকে কি করিলে তুমি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে, কি করিলে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় হাসী মুখে আমাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব, ক্ষত্রিয় আমি, কখনই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।

সাধ্বী এতক্ষণ স্বামীর কাতরতা দেখিয়াও ধৈর্য্যবলম্বনপূর্ব্বক প্রকৃত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষনে সেই সময় উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, স্বামীন! তুমি ত আমাকে চাও না আমার এই নশ্বর দেহটাকে তুমি চাও অতএব পার্থিব সম্বন্ধে যখন এই দেহটায় তোমায় অধিকার আছে তখন এই দেহটাই তুমি রাখ আমি আমার অভিষ্ট স্থানে চলিয়া যাই; কেননা আমি তোমার পাশবভাব

দেখিতে চাই না। তোমাতে আমার অভিষ্ট দেবের প্রকাশ দেখিয়া তোমার পূজা করিতে চাই, যদি আমার সে বাসনা পূর্ণ হয় যদি তুমি আমার গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চেষ্টা কর—তবে আমি এ প্রাণ রাখিব নতুবা আমার আশা ত্যাগ কর।

নিরুপায় হইয়া অঙ্গদ স্বীকার করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ যথোচিত অনুনয় বিনয় সহকারে গুরুদেবকে আনাইলেন ও পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, গুরুদেব অক্রোধ পরমানন্দ মহাপুরুষ ছিলেন তিনি সানন্দ চিত্তে অঙ্গদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, উপদেশাদিদ্বারা তাহার চিত্ত নির্ম্মলও পাপ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক বীজ রোপণ করিলেন ক্রমে শ্রদ্ধা বারি সেচনে ও জ্ঞান তপনের তাপে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যত বর্দ্ধিত হইলে লাগিল, শ্রীভগবানের নাম রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়ায় অঙ্গদের হৃদয় প্রেমানন্দে ততই আপ্লুত হইতে লাগিল, অবশেষে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া সহধর্ম্মিনীর সহিত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের সেবাও গুণগানই তাঁহাদের প্রধান ব্রত হইল।

এতদিনে অঙ্গদ পত্নীর বাসনা পূর্ণ হইল, স্বামীর এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। আর অঙ্গদ ও এত দিন তাঁহার স্ত্রীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই, এক্ষণে জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ হওয়ায় তাঁহার আভ্যন্তরিন সৌন্দর্য্য ও সাত্তিক জ্যোতী দৃষ্টে আত্মহারা হইয়া আপনাকে ধন্যও কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার সৌভাগ্য বলেই এরূপ দেবীরূপা পত্নীর সঙ্গলাভ হইয়াছে, সুতরাং এতদিনে তাহাদের মিলন সুখের হইল, সংসারে থাকিয়াও তাঁহারা অহরহ অপার্থিব আনন্দের আস্বাদ পাইতে লাগিলেন।

একই বিদ্যুত শক্তি লোহে সঞ্চারিত হইলে যেমন সম ও বিষম ভাব ধারণ পূর্ব্বক ট্রামগাড়ী প্রভৃতিকে চালনা করে সেইরূপ শ্রীভগবানের অপরা শক্তি মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে সৎ ও অসৎ শক্তির জননী হইয়া জগত পরিচালনা করে। আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই শক্তিদ্বয়ের বিভিন্নতা না থাকিলেও ব্যবহারিক ভূমিতে ইহারা বিপরীত ভাবাপন্ন। সৎশক্তি জীবকে উন্নত করিয়া সংসার চক্রের পারে যাইবার সাহায্য করে ও অসৎ শক্তি তাহাকে এই ভৌম নরকে

আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা পায়। অঙ্গদরায় সৎসঙ্গের ফলে সৎ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া মহাপথের পথিক হইলে অবিদ্যা তাঁহাকে আপন সীমার বহির্ভূত হইতে দেখিয়া বাধা দিবার জন্য কুহক জাল বিস্তার করিল তাঁহার অতুল শান্তি ও নির্ম্মল আনন্দে অশান্তির কালিমা ক্ষেপন করিতে উদ্যত হইল, সেই সময় রাজার সহিত অপর রাজার যুদ্ধ সংঘটন হওয়ায় তিনি অঙ্গদরায়কে সেনাপতি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অঙ্গদের আর সে দিন নাই, তাঁহার রজোগুণ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, কতগুলি নির্দ্দোষী প্রাণির জীবন নাশ করিবার প্রবৃত্তি তাহার কিরূপে হইবে? সুতরাং তিনি যুদ্ধের গোলযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কাতরভাবে রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কার্য্যের গুরুত্ব ও অঙ্গদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া রাজা তাঁহার এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না কেবল বারান্তরে আর যুদ্ধাদি ব্যাপারে তাঁহাকে জড়িত করিবেন না বলিয়া ভরসা দিলেন মাত্র।

অঙ্গদরাজবৃত্তিভোগী ও ক্ষত্রিয় সুতরাং কর্ত্তব্যের খাতিরে বাধ্য হইয়া তিনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, সংস্কার বশত যুদ্ধস্থলে তাঁহার স্তিমিত ক্ষত্রিয় তেজ উদ্দীপিত হইল তিনি ভীম বিক্রমে শত্রুগণকে পরাজয় পূর্ব্বক আততায়ী রাজার ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

লুণ্ঠিত দ্রব্য সকলের মধ্যে একটী বৃহৎ ও উজ্জ্বল হীরকখণ্ড ছিল, শ্রীজগন্নাথের শিরোভূষণ হইবার যোগ্যবোধে ভক্তবীর অঙ্গদ উল্লাসভরে উহা আপনার নিকট রাখিলেন ও অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

অবিদ্যার অনুচররূপী সহকারি সেনাপতির কিন্তু তাহা সহ্য হইল না, লুণ্ঠনের কিছু অংশ আত্মসাৎ করিতে না পারায় অঙ্গদের প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়া ছিল এই সুত্রে সে তাহা প্রয়োগ করিল, সে রাজার নিকট ঐ হীরক খণ্ডের বিষয় রঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়া তাঁহার লালসা বৃদ্ধি করিয়া দিল রাজা অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া হীরকটী লইবার ইচ্ছা করিলে তিনি বলিলেন মহারাজ! যে দ্রব্য ভগবানের জন্য রাখিয়াছি প্রাণ থাকিতে তাহা আমি অপরকে দিতে পারিব না।

রাজা সম্পর্কের খাতিরে অঙ্গদের সম্মুখে বিশেষ কিছু না বলিয়া ঐ হীরক খণ্ডটীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ প্রদান

করিলেন, ভাবগতিক দেখিয়া বুদ্ধিমান অঙ্গদ পূর্ব্বেই রাজার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন সুতরাং সেই রাত্রের মধ্যেই তিনি সহধর্ম্মিনী ও কতকগুলি বিশ্বাসী অনুচরসহ পুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে অঙ্গদের পলায়ন সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাকে ধরিবার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন, সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিয়া দিলেন যে, অঙ্গদ যদি সহজে হীরক খণ্ড অর্পণ করেন তবে তাঁহার গমনে বাধা দিবার আবশ্যক নাই নতুবা যেন বল প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্য উদ্ধার করা হয়। ইহাতে যদি তাহাকে নিহত করিতে হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই।

অঙ্গদরায় একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে স্নান আহ্নিকের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তিনি সেই সৈন্য দলের দ্বারা বেষ্টিত হইলেন; সৈন্যাধ্যক্ষ প্রথমত সম্মান সহকারে তাঁহাকে রাজ-আজ্ঞা নিবেদন পূর্ব্বক বলিলেন, মহাত্মন! আমি বহুদিন আপনার অধীনে কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে রাজাজ্ঞায় একখণ্ড হীরকের জন্য যদি আপনার সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে হয় তবে বড়ই দুঃখিত হইব, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ রত্নটী অর্পণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আপনার গন্তব্য স্থলাভিমুখে প্রস্থান করুন।

অঙ্গদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হতাশের তাড়ণায় অস্থির হওয়ায় তিনি প্রথমত কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, পরে একটু স্থির হইয়া ভাবিলেন যে, এই অগনিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলে কেবল প্রাণ ত্যাগ করা সার হইবে মাত্র, অথচ সংকল্প সিদ্ধ হইবেনা, কিন্তু প্রাণ থাকিতে কিরূপেই বা তিনি গোবিন্দের ধন অপরের হাতে অর্পণ করেন; ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে যখন কিছুতেই কর্ত্তব্য স্থির হইলনা, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া ধ্যান যোগে বিপদ-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন, ক্রমে তাহার বুদ্ধি স্থির ও অহঙ্কার স্তম্ভিত হইল, তিনি আপনাকে গোবিন্দ লীলার যন্ত্রবৎ অনুভব করিতে লাগিলেন; তাঁহার বোধ হইল যে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া লোক শিক্ষার জন্য গোবিন্দই এ খেলা খেলিতেছেন নতুবা কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য যাঁহার পদতলে সেই মহতোমহীয়ান শ্রীজগন্নাথকে তুচ্ছ একখণ্ড হীরক উৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তি তাহাকে কে দিল?

পারা যেমন তাপ পাইলে উর্দ্ধগামী হয় সেইরূপ তাঁহার ধ্যান যতই গাঢ় হইতে লাগিল, ভগবদ্ ভাবের তাপে তাঁহার মন স্তরে স্তরে ততই উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তিনি প্রাণে প্রাণে শ্রীভগবানের অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া নির্ভয় হইলেন, তাহার প্রতিধমনিতে শান্তির অমীয় লহরী খেলিতে লাগিল, ক্রমে যখন তাঁহার মন জ্ঞান ভূমির উচ্চ চূড়ায় উঠিল তখন তিনি অতঃচক্ষুর দ্বারা জ্যোতীর্ম্ময় চৈতন্য মণ্ডলের কেন্দ্র-স্থিত শ্রীভগবানের চিংঘন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন, আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল, তিনি উন্মত্তের ন্যায় ঐ জ্যোতী মণ্ডলের মধ্যে গমন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কি যেন এক অপার্থিব ভাবের অমিয় আবেশে বিহ্বল হওয়ায় তাঁহার গতি স্তম্ভিত হইল, তিনি বিভোর প্রাণে চৈতন্য মণ্ডলের তটে বসিয়া অতৃপ্ত নয়নে শ্রীভগবানের অপরূপ রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন, তাঁহার অন্তরে ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, কিন্তু হায়! বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি তখন তাঁহার ছিলনা।

ভক্তের ভাব মাধুর্য্য দৃষ্টে শ্রীভগবান মৃদু মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "অঙ্গদ! প্রিয়তম! কাহার সাধ্য আমার ভক্তের নিকট হইতে আমার ধন কাড়িয়া লয়! দাও,—যে হীরকখণ্ড আমার জন্য আনিয়াছ তাহা আমাকে দাও, ভক্তের প্রেম-উপঢৌকন আমার বড়ই প্রিয়", এই বলিয়া তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন।

অঙ্গদ আপন শীরস্ত্রাণের মধ্যে সেই হীরক খণ্ডটী লুকাইয়া রাখিয়া ছিলেন শ্রীভগবানকে হস্ত প্রসারণ করিতে দেখিয়া তিনি প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে ধীরে ধীরে উহা বাহির করিয়া যেমন তাহাকে অর্পণ করিলেন, যেন অমনি সেই অপার্থিব দৃশ্য মানস নয়নের অগোচর হইল, ও সঙ্গে সঙ্গে ভাব সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহার মন প্রকৃতি সীমার মধ্যে অবতরণ করিল, তিনি চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন যে সৈন্যগণ সকলে হায় হায় করিতেছে।

সৈন্যগণের কথোপকথন শ্রবণে তিনি বুঝিলেন যে, ভাবাবস্থায় শ্রীভগবানের হস্তে যখন তিনি হীরক খণ্ড অর্পণ করেন, স্থূল দৃষ্টিতে অপরে তাহা জলে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া হায় হায় করিতেছে। তখন অঙ্গদ সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিলেন, আমি শ্রীভগবানের জন্য সংঙ্কল্পীত বস্তু তাহার উদ্দেশ্য জলে ফেলিলাম। ইহা যদি রাজার প্রাপ্য হয় তবে তুমি তুলিয়া লইতে পার।

সৈন্যাধ্যক্ষ কিন্তু এঘটনায় বড়ই সন্তুষ্ট হইল, সে বহুকাল অঙ্গদের অধীনে কার্য্য করায় তাঁহার সৌর্য্য, বীর্য্য ও সরলতার জন্য তাঁহাকে মনে মনে ভক্তি করিত সুতরাং সহজে ঐ হীরক-খণ্ডটী না পাইলে যদি রাজাজ্ঞায় বাধ্য হইয়া বল প্রকাশ করিতে হইত তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিত, বিশেষত অঙ্গদ মহাবীর, সুতরাং যুদ্ধ সংঘটন হইলে অনেকগুলি প্রাণী হত্যা হইত সম্ভবত নিজেও নিষ্কৃতি পাইত না, কিন্তু এক্ষণে বিনা রক্ত-পাতে সামান্য পরিশ্রম মাত্র বিনিময়ে হীরক খণ্ডটী পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সে অঙ্গদকে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিতে দিল. সে ভাবিল যে, রাজা-ত অঙ্গদকে লইয়া যাইতে বলেন নাই, যাহা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন তাহাত এখন নদী গর্ভে, ক্ষুদ্র নদী বিশেষত যে স্থানে হীরকটী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছি, সামান্য চেষ্টাতে উহা উদ্ধার হইবে। অতএব অঙ্গদকে চলিয়া যাইতে দেওয়াই ভাল, কেননা রত্নটী উদ্ধার হইলে পুনরায় উহাতে তাঁহার লোভ জন্মিতে পারে।

তাঁহার মনের আশা কিন্তু মনেই রহিয়া গেল, বহু চেষ্টাতেও যখন হীরক খণ্ডটী মিলিলনা তখন দুইধারে বাঁধ দিয়া ও মধ্যের সমস্ত জল বাহির করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু তথাপিও যখন কার্য্য সিদ্ধ হইল না, তখন সে হতাশ হইয়া রাজার নিকট প্রত্যাগমন পুর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল, ফলে রাজার প্রথমে ক্রোধ ও পরে অনুসোচনা মাত্র সার হইল।

এদিকে অঙ্গদরায় দ্রুতবেগে পুরুষোত্তমাভিমুখে যাইতেছেন, দেহ চলিতেছে বটে কিন্তু মন গোবিন্দ চরণারবিন্দে সংলগ্ন, তিনি কখন ভাবিতেছেন হায়! আমার এ জাগ্রত সপ্ন কি সত্য; সত্যই কি শ্রীভগবান আমার তুচ্ছ উপঢৌকনটী গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা উহা জলে নিক্ষিপ্ত হইবার পরে রাজার লোকে উঠাইয়া লইয়াছে, না—না তিনি দয়াময়, ভক্তের নিবেদিত পত্র পুষ্প পর্য্যন্ত তিনি গ্রহণ করেন, তবে এ অধমের প্রাণের সাধ পুরণ করিবেননা কেন!

ফলে এইরূপে শ্রীভগবানের অপার দয়া ও অনন্তগুণরাশির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অন্তর সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হইল, তিনি মনে মনে বলিলেন প্রভো! তুমি অরূপ ও অব্যক্ত হইয়াও যখন ব্যাকুল ভক্তের সাধ মিটাইবার জন্য

রূপধারণ করিয়া ব্যক্ত হও, তুমি সর্ব্ব শক্তিমান হইয়াও ভক্তের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য "অহং ভক্ত পরাধীন" বাণী শাস্ত্র মুখে প্রকাশ করিয়াছ, প্রভো! তোমার করুণার অবধি নাই যাঁহারা কেবল তোমাকেই চায়, সেই অনুগত ভক্তগণের বিশ্বাস বৃদ্ধি করাত তোমারই কার্য্য। অতএব হে বাঞ্ছা-কল্পতরু! তুমি জ্যোতীবন রূপে যে সত্যই এ অধমের নিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিয়াছ তাহার প্রমাণ দেখাও; যেন আমি তোমার দারু ব্রহ্ম মূর্ত্তি শ্রীঅঙ্গে সেই রত্ন শোভা দেখিয়া ধন্য হই, এ দীন হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা পূরণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর প্রভো!

যেদিন অঙ্গদ পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইবেন তাহার পুর্ব্বরাত্রে শ্রীভগবান প্রধান পাণ্ডাকে সপ্ন যোগে কহিলেন "আমার বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে একখণ্ড হীরক আছে, আমার পরম ভক্ত অঙ্গদরায় তাহা আমাকে দান করিয়াছে, আগত কল্য প্রাতে সে পুরুষোত্তমে আসিবে, যাও অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মৎ সকাশে আনায়ন কর, সে নিজেই এই রত্নটী আমার মুকুটে সংলগ্ন করিয়া দিবে।"

তাহার পরে কি হইল হে বিশ্বাসী পাঠকগণ! তাহা কি আর বলিতে হইবে? অঙ্গদের আনন্দ উচ্ছ্বাস আপনারা মনে মনে অনুভব করুন। ভক্তের ভগবান কিরূপে ভক্তের মানরক্ষা ও বাসনা পূরণ করিয়া ছিলেন একবার পুরুষোত্তমে গিয়া তাহার প্রমান দেখিয়া আসুন। অঙ্গদ প্রদত্ত রত্নটী আজিও শ্রীজগন্নাথের মস্তকস্থিত মুকুটে শোভা বর্দ্ধন পূর্ব্বক ভক্ত ও ভগবানের অপার মহিমার সাক্ষ প্রদান করিতেছে, দর্শন করিয়া জীবন সার্থক ও ভক্তি বিশ্বাসের শ্রীবৃদ্ধি করুন এবং সেই সঙ্গে এই অধম লেখকেরও ভক্ত চরিত্র বর্ণনা করা সার্থক হউক।

শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

হতাশের আত্ম নিবেদন।

বলিবার কিছু নাই, শুধু বলি শুধু বলি,
নাথ দয়া কর মোরে।

আমি পাপী. আমি তাপী, আমি অপরাধী,

দয়া কর দারুণ সংসারে ॥

চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড, অন্তরে বিষের ভাণ্ড,

কোথা যাই, কোথা যাই, শান্তি কোথা পাই,

জুড়াব কোথায় কি প্রকারে।

এস নাথ, হৃদি সিংহাসনে,

ব'স ব'স যুগল মিলনে,

শোক দগ্ধ হিয়া খানি মোর,

প্রাণ নাথ! ওহে চিত চোর!

শান্ত হোক্, শান্ত হোক্, এস দয়া ক'রে।

দীন সখা. তুমি নাথ,

দীনে কৃপা দৃষ্টিপাত,

কর, কর এ অধম ডাকিছে তোমারে।

শুন নাথ, হৃদয়ের কথা,

বুঝ মোর মরমের ব্যথা,

কে বুঝিবে তোমা বিনা,

কে ঘুচাবে এ যাতনা,

সান্ত্বনার সুধা ধারা কে দিবে অন্তরে ॥

চোখা চোখা বাণে ক্ষত,

হইয়াছে দেখ কত,

নয়নেতে অবিরত তপ্ত অশ্রু ঝরে।

দেখিতে কি নাহি পাও থাকিয়া অন্তরে ॥

সব জান তুমি অন্তর্যামী,

সব দেখ সর্ব্ব চক্ষু তুমি,

তবে কেন দুর্নিবার

এ যন্ত্রনা হাহাকার,

উঠে হৃদে, ভবিষ্যের কি মঙ্গল তরে?

নীরব, নীরব, এবার,
বলিব না কিছু আর,
যা' মনে থাকে তোমার
তাই হোক্, পূর্ণ তাই হোক্, হে মুরারে॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

সৎপ্রসঙ্গ।

—ঃ০ঃ—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চ। বুঝিলাম যে, অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ ভিন্ন ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয়পূর্ব্বক সংসার সাগরের পারে যাওয়া যায় না, কিন্তু জ্ঞানলাভ না করিয়াও যদি কেহ শ্রীভগবানের নামাশ্রয় পূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাকে, তাহা হইলে কি তিনি দেখা দেন না ?

র। কোন নশ্বর কামনা সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল ভাবে ডাকিলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ্য করা যায় না। মুষ্টি ভিক্ষাকারিকে চাকরেই বিদায় করে, বাবু তাহাকে দেখা দেন না, কেননা এই যে ব্যাকুলতা, ইহা কামনার জন্য, ভগবানের জন্য নহে, ভগবানকে বিশেষ রূপে না জানিলে তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা আসিতেই পারে না, তবে যদি কেহ শ্রীভগবানকে জানিবার ও প্রত্যক্ষ্য করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অকপট ভাবে নামাশ্রয় করে তাহা হইলে ভগবদ্‌কৃপায় তাহার হৃদয়ে ভাব সঞ্চারিত ও বদ্ধমুল হইয়া ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে, এবং এই পূর্ণতাই ভগবল্লাভের কারণ স্বরূপ কিন্তু ইহাও জানিও যে নদী হইতে ক্ষেত্রে জল আনিতে হইলে যেমন পয়ঃ প্রণালীর উভয় পার্শ্বস্থ তৃণাদিতে রস সঞ্চার হওয়ায় উহারা পরিবর্দ্ধিত হয় সেইরূপ নামাশ্রয় পূর্ব্বক ব্যাকুল ভাবে শ্রীভগবানকে লাভ করিবার প্রয়াসী হইলে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতির পুষ্টি সাধন আপনা হইতে হয়, ভগবল্লাভের পথে ইহাদের সামঞ্জস্য আবশ্যক; অথচ কলমীসাকের একটি ডাঁটা ধরিয়া টানিলে যেমন দল সুদ্ধ হস্তগত হয় সেইরূপ হৃদয়ে প্রকৃত

ব্যাকুলতা থাকিলে সাধনার যে সূত্র অবলম্বন করনা কেন, ক্রমে দেখিবে যে ঐ এক সূত্রের সহিত সকল সূত্রই সংলগ্ন আছে। অতএব মূলে জল সেচন করিলে যেমন শাখা প্রশাখার পুষ্টি আপনা হইতেই হয়, সেইরূপ ভগবল্লাভের বাসনা রূপ বৃক্ষের মূলে ব্যাকুলতা রূপ বারি সেচন করিতে থাকিলে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম প্রভৃতি শাখা ও বিচার, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতি প্রশাখা গুলির সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রেম পুষ্পে সুশোভিত হয়, ভাই! শ্রীভগবান এই পুষ্পেরই ফল স্বরূপ জানিও।

চক্ষু কর্ণাদি অবয়ব সকলের সামঞ্জস্য না থাকিলে যেমন দেহের পূর্ণতা হয়না সেইরূপ জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির সামঞ্জস্য না থাকিলে সাধনার পূর্ণতা হয় না, সুতরাং সিদ্ধি কিরূপে হইবে? ফলে যখন জ্ঞানের দ্বারা স্বরূপ নির্ণয়, যোগের দ্বারা লক্ষ্য স্থির, কর্ম্মের দ্বারা শক্তি সঞ্চয়, ভক্তির দ্বারা লাভ ও ও প্রেমের দ্বারা আস্বাদ করিতে পারিবে, তখন জানিবে যে সাধন গত ভাব দেহের পূর্ণতা হইয়াছে এবং ভগবল্লাভ এই পূর্ণতা সাপেক্ষ জানিও।

ভাই! জ্ঞানের সাহায্যে পরিচিত না হইলে তুমি শ্রীভগবানকে চিনিতে পারিবেনা, এইরূপে যোগের সাহায্য ভিন্ন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে, কর্ম্মের সাহায্য ভিন্ন তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধণ করিতে, ভক্তির সাহায্য ভিন্ন তাঁহাকে আপনার করিতে ও প্রেমের সাহায্য ভিন্ন তাঁহার মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতে পারিবে না, অতএব নিশ্চয় জানিও যে, এই গুলির সামঞ্জস্য না হইলে ভগবল্লাভ হয় না, কেবল এই পূর্ণাবস্থা তিনিই লাভ করেন, যিনি শ্রীভগবানের জন্য আন্তরিক ব্যাকুল হন ও সৎসঙ্গাদির দ্বারা সেই ব্যাকুলতাকে পুষ্ট ও স্থায়ী করিতে চেষ্টা করেন।

কোন ধনী ব্যক্তি তাঁহার কোন দরিদ্র সেবকের কাতর প্রার্থনার ফলে তাহার বাটিতে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলে যেমন প্রথমত আপন ভাণ্ডার হইতে তাহার প্রয়োজন মত বৈটক্‌খানা সাজাইবার উপকরণাদি প্রেরণ করিয়া পরে তথায় উপস্থিত হন, সেইরূপ অন্তর্যামী শ্রীভগবান তাঁহার জন্য ব্যাকুল সাধকের হৃদয় মন্দির সাজাইবার জন্য প্রথমতঃ জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি অমূল্য উপকরণ সকল প্রেরণ পূর্ব্বক পরে তথায় আবির্ভূত হন, ফলতঃ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের এক একটি ভূতে যেমন অপর চারিটি ভূত আংশিক ভাবে মিশ্রিত থাকে সেইরূপ সেই চরম লক্ষে পৌছিবার উদ্দেশে জ্ঞানাদি যে উপায়ই

অবলম্বন করনা কেন, আন্তরিক হইলে তাহাতে অপর উপায় গুলির ভাব মিশ্রিত থাকিবেই, যাহাতে তাহা নাই তাহাকে হয় কপট নয় ভ্রান্ত বলিয়া জানিও।

চ। সেদিন চৈতন্য চরিতামৃতে দেখিলাম যে নামাভাসে মুক্তি হয়, ইহার অর্থ কি? নাম না করিয়াও যদি মনে নামের আভাস পড়িলে মুক্তি হয় তবে জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির স্থান কোথায়?

র। প্রকৃতরূপে নাম উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বে প্রাণে যে ভাবোদয় হয় তাহাকেই নামাভাস বলে, জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির সমাবেশে যখন নাম ও নামিতে অভেদ বুদ্ধি হয় তখনই নামে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উন্মেষ হয় জানিও, এবং এই শ্রদ্ধার পূর্ণতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা লাভ হইলে যখন সাধকের হৃদয়ে নামাত্মক নামীর ভাবোদয় হয় অথচ সেই ভাবের উচ্ছ্বাস নামের আকারে মুখ দিয়া নির্গত হয় না, তাহাকেই নামাভাস বলে এবং এই ভাবরূপ আভাসের দ্বারা সংস্কার বীজ সমূহের জনন শক্তি নষ্ট হয় বলিয়া সাধক প্রারব্ধ মাত্র ভোগ করিয়া মুক্ত হন, অগ্নি স্বীয় আভাসের তাপে (আঁচে) যেমন প্রথমতঃ আবরণ ও রোমগুলি দগ্ধ পূর্ব্বক পরে দেহ দগ্ধ করে সেইরূপ সাধকের সরল প্রাণে নামাভাস বা নামীর ভাবোদয় হইবামাত্র উহা প্রথমতঃ জন্ম মরণের কারণ স্বরূপ অভিমান ও সংস্কার সমূহ দগ্ধ পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি প্রদান করে ও পরে উচ্ছ্বাসিত ও ঘনীভূত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়।

ভাই! ভাবই নামরূপ শব্দের প্রাণ স্বরূপ, গুলিভরা আওয়াজের ন্যায় ভাবযুক্ত নামই ভগবল্লক্ষ্যে প্রযুক্ত হইলে সিদ্ধি লাভ হয় নচেৎ ফাঁকা আওয়াজের ন্যায় একটু চমকপ্রদ হয় মাত্র, ফলে ভাব লাভ করিবার জন্যই অপরাধবিহীন হইয়া নাম করিবার নিয়ম, কিন্তু তাহা বলিয়া আগে অপরাধ বিহীন হইয়া পরে নাম করিবার সংকল্প করা বড়ই কঠিন, উদ্দেশ্য ঠিক রাখিলে নামই সাধকের অপরাধ মালিন্য ধৌত করিয়া দেয়। অনেক গুলি-বারুদ নষ্ট করিবার পরে যেমন লক্ষ্য বেধ কারি লক্ষ্যে সিদ্ধি লাভ করে এবং এই সিদ্ধি যেমন আগ্রহ ও একাগ্রতার পরিমাণানুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে হয় সেইরূপ নামাশ্রয় কারীর সাধনা প্রথমতঃ ফল প্রদ বোধ না হইলেও আন্তরিকতা ও অকপটতার পরিমাণানুসারে উহাই পরে শিঘ্র বা বিলম্বে লক্ষ্য সিদ্ধির কারণ হয় জানিও, এই লক্ষ্য সিদ্ধি না হইলে নামের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না,

কিন্তু তথাপি যিনি ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক নাম সাধনা করেন, তিনি পরিশেষে সফল মনোরথ হন। পিত্ত রোগীর নিকট মিছ্‌রী তিক্ত বোধ হয় কিন্তু ঐ মিছ্‌রী ব্যবহারের দ্বারাই পিত্ত রোগ নষ্ট হইলে যেমন সে তাহার প্রকৃত আস্বাদ পায়, সেইরূপ ভগবল্লাভের উদ্দেশ্য ঠিক্ রাখিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নাম করিতে থাকিলে সেই নামই প্রথমতঃ সাধকের অপরাধ মালিন্য ধৌত করিয়া পরে তাহার নিকট আপন মাধুর্য্য প্রকাশ করে এবং এই মাধুর্য্য বোধ হইলে নাম স্মরণে বা শ্রবনে সাধক হৃদয়ে যে ভাবোদয় হয় তাহাকেই নামাভাস বলে ও এই আভাসের দ্বারাই সেই পরম বস্তুর সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া যখন সাধকের হৃদয় তরঙ্গায়িত হয় এবং সেই তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া নামের আকারে মুখ দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন আর ভগবল্লাভের বিলম্ব হয় না, ফলতঃ এই ভাবের আবির্ভাবকে নামাভাস বলে ও ইহার পূর্ণতায় নামাত্মক নামীর প্রকাশ হয় জানিও, নচেৎ অভাবের তাড়ণায় যাহার মন অলক্ষ্যে ছুটাছুটি করিতেছে, সে যদি কর্ণে একবার হরিনাম শুনিয়াই নামাভাসে মুক্ত হইয়াছি বলিয়া মনে করে, তবে তাহার বাতুলালয়ে বাস করাই কর্ত্তব্য। জ্ঞানেতেই যখন অভিমান প্রসূত কর্ম্মের ধ্বংস হয়, তখন জ্ঞানের ফল স্বরূপ মুক্ত হইলে কি আর সংস্কার মালিন্য থাকে? অনিত্যে বাসনা ও বৈধাবৈধ কর্ম্ম-সংস্কার থাকিতে "আমি মুক্ত" এই ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেই পারে না, তাথাপি যাহারা ভ্রান্ত বুদ্ধিতে মৌখিক মুক্ত হয়, তাহাদিগকে হয় প্রতারিত নয় কপট বলিয়া জানিও।

চ। নাম বা নামাভাস সম্বন্ধে তোমার যুক্তির প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই, কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতের একস্থানে হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন যে, জনৈক মুসলমান শূকরের দন্তাঘাতে হত হইবার সময় ভয়ে বারম্বার হারাম শব্দ উচ্চারণ করায় সেই নামাভাসে মুক্ত হইয়াছিল; ভাবকেই যদি আভাস বলা যায় তবে এখানে শূকরের ভাবে নামাভাস হইল কিরূপে?

র। ভাই! শূকরের ভাবে কখনই নামাভাস হইতে পারে না, ইহা অশাস্ত্রিয়। রাম বা রহিম একই শ্রীভগবানের নাম ভেদ মাত্র, সেই মুসলমান হয়ত সাধক ছিল, আল্লা নাম শুনিলে যেমন কোন হিন্দুভক্তের মনে আপন ইষ্টদেবের ভাবোদয় হয় সেইরূপ হারামের মধ্যে রাম শব্দ থাকায় সম্ভবতঃ তাহার

অন্তিম সময় হৃদয়ে শ্রীভগবানের ভাবোদয় হইয়াছিল এবং তাহাই তাহার মুক্তির কারণ। *

শাস্ত্র বা মহাজন বাক্যই ভগবদ্বাণী, কিন্তু বুঝিবার অধিকারী না হইলে কেহ ইহা বুঝিতে পারে না, পরিবেশক যেমন গৃহস্বামীর দ্রব্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে প্রদান করে, সেইরূপ যাঁহারা ভগবল্লাভ করিয়াছেন সেই সাধুগণ যন্ত্রবৎ নির্গুণ ভাবে শ্রীভগবানের অভয়বাণী লোক সমাজে প্রচার করেন; ভূতাবিষ্টগণ যেমন ভূতের কথা কয়, সেইরূপ এই সকল ভগবদাবিষ্ট মহাত্মাগণের মুখ হইতে যে সকল বাক্য নির্গত হয় তাহাকেই শাস্ত্র বাণী বলে এবং একমাত্র ভগবল্লাভার্থী সাধকগণই ভগবদ্‌কৃপায় এই বাক্যের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিতে পারেন, অকপট ব্যাকুলতা সহযোগে ভগবল্লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পথে জ্ঞান লাভ হইলে এই বাক্যের প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় এবং এই জন্যই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমান্ স্যাৎকৃত কৃত্যশ্চ ভারত! ১৫।২০

অর্থাৎ এই যে গুহ্যতম শাস্ত্র বাক্য বলিলাম, জ্ঞানবান ব্যক্তিই ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ধনি ব্যক্তির নিজ জন যেমন সম্বন্ধ বা প্রীতির সহযোগে ঐ ধনীর নিকট হইতে ধন লইয়া ভিক্ষুকগণকে প্রদান করে সেইরূপ প্রকৃত সাধকগণ একাগ্রতা ও সাত্ত্বিক অস্মিতা সহযোগে শ্রীভগবানের নিকট হইতে শাস্ত্রবাণীর অন্তর্নিহিত ভাবধন আহরণ করিয়া জিজ্ঞাসুগণের তৃপ্তি সাধন করেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত বক্তা ও জিজ্ঞাসুর সংখ্যা বড়ই অল্প, নশ্বর বাসনা অনিত্য স্বার্থের দ্বারা মনুষ্যত্ব আবরিত থাকাই এই অল্পতার কারণ, অজ্ঞ সাধারণ বা পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ শাস্ত্র নিহিত রত্ন সকলের আবরণটা লইয়াই নাড়াচাড়া করেন, ফলে যুক্তভাব না থাকায় তাঁহাদের কথিত অর্থ শ্রীভগবানের অপর বাণীর সহিত সামঞ্জস্য বা তাহার ফলের সহিত মিল থাকে না, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন "যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ আমি জীবের ভাবানুযায়ী ফল প্রদান করি, আবার একস্থানে বলিয়াছেন :—

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥ ৮।৬

অর্থাৎ মৃত্যুকালে যে যে ভাব চিন্তা করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে তাহার সেই ভাবানুযায়ী গতি লাভ হয়।

তবেই বিবেচনা করিয়া দেখ যে, হারাম বলিয়াও যদি অন্তরে রামের ভাবোদয় হয় তাহা হইলে সে অবশ্যই মুক্ত হইবে, কেননা শ্রীভগবান নিজে বলিয়াছেনঃ—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৮।৫

অর্থাৎ মৃত্যুকালে যিনি আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন।

এই বিজ্ঞান অনুসারেই রাম বলিয়াও যদি কাহারও হৃদয়ে হারামের ভাবোদয় হয় তবে তাহার শূকর যোনিতে জন্ম অনিবার্য্য জানিও। ফলতঃ বাক্যে কিছু আসে যায় না ভাবই লাভের মূল, তবে বাক্যের দ্বারা ভাবের উদ্দীপনা হয় ও ভাবের উচ্ছ্বাস বাক্‌প্রণালীর দ্বারা বহির্গত হয় বলিয়াই উহার মূল্য, কিন্তু এই মূল্য সকলে বুঝিতে পারে না, কিরাতগণ যেমন সিংহের দ্বারা বিচ্ছিন্ন গজ মস্তক হইতে নির্গত মুক্তার মূল্য বুঝিতে পারে না, সেইরূপ মোহ-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সদ্বাক্যের শক্তি কার্য্যকরী হয় না।

ভাবমূলক কম্পন হইতে উদ্ভূত হওয়ায় যখন শব্দ মাত্রেরই বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে, তখন ভগবদ্বাচক শব্দের নির্ব্বিশেষ শক্তি থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না, আন্তরিক আবেগ সহযোগে নাম সাধনা করিতে করিতে যখন সাধকের চিত্ত ক্ষেত্র মার্জ্জিত হয় ও উহাতে জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ হয়, তখনই সাধক নামের প্রকৃত শক্তি ও মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতে পারেন, নতুবা বধিরের নিকট যেমন শব্দের শক্তি কার্য্যকরী হয় না, জিহ্বা অসার হইলে যেমন আস্বাদ বোধ থাকে না, সেইরূপ চিত্ত অপরাধ বিহীন ও নির্ম্মল না হইলে তাহাতে নামাভাস বা নামীর ভাব সঞ্চার হওয়া অসম্ভব। প্রতিষ্ঠাদি লাভের জন্য ভাবের অভিনয় করিয়া আত্ম-প্রতারণা করা সহজ, কিন্তু প্রকৃত ভাব লাভ করিয়া আত্মোন্নতি করা ঈশ্বর কৃপা সাপেক্ষ জানিও, লোক মুখাপেক্ষী না হইয়া অকপট প্রাণে শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উৎসুক হইলে ঈশ্বর কৃপা লাভের বিলম্ব হয় না; নচেৎ যাহারা ঈশ্বরাদিষ্ট বাক্য অবহেলা করিয়া অহঙ্কার বশে সংসারে বিচরণ করে, নশ্বর আশক্তি ও বাসনার দ্বারা যাহারা পরিচালিত

তাহারা যদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শূকরকে হারাম বা বাড়ীর চাকরকে রাম বলিয়া নামাভাসে মুক্ত হইয়াছি বলিয়া মনে করে, তবে তাহা বাতুলতার পরিচায়ক মাত্র ; ইহারা ফলের লক্ষণ মিলাইয়া কর্ম্মের সিদ্ধি হইল কিনা তাহা দেখে না, অজ্ঞানতাকেই কৈফিয়ত দিবার পক্ষে যথেষ্ট মনে করিয়া আপন উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করে।

চ। ভাব ভিন্ন কি শব্দ শক্তির বিকাশ হয় না ?

র। শক্তি হইতে ভাব, ভাব হইতে কম্পন ও কম্পন হইতে শব্দের উদ্ভব। অতএব শব্দ মাত্রেই শক্তি, ভাব ও কম্পন আছে, তবে প্রয়োগ ভেদে এই শক্ত্যাদির অল্পাধিক্য হয়, কম্পন-যুক্ত ভাবের দ্বারা প্রকাশ হইলে শব্দের শক্তি পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হয় জানিও।

চ। শব্দ মাত্রেই যদি ভাব থাকে তাহা হইলে সিংহ গর্জ্জণে ভয় বা বংশীধ্বনিতে সর্প পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয় কেন ? আর ভাবানুযায়ী যদি শব্দ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয় তবে পুত্রের ভাবে নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ করিয়া অজামিলের উদ্ধার হইল কেন ?

র। সিংহ গর্জ্জণে ভীষণ ভাব ও বংশীধ্বনিতে মোহন ভাব নিহত না থাকিলে মনে ভয় বা মোহের সঞ্চার হইতেই পারে না, আর যে অজামিলের কথা বলিতেছ, তিনি প্রথমে নিষ্ঠাবান ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, মধ্যে পদস্খলন হওয়ায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে নারায়ণ নামক পুত্রের জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব্ব সুকৃতি বশতঃ আপন ইষ্টদেবকে মনে পড়ে, তখন তিনি সেই ব্যাকুলতা শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়া উদ্ধার লাভ করেন, ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হওয়ায় তাঁহার চিত্ত-মল ধৌত হইয়াছিল সুতরাং তাহাতে শব্দ শক্তি পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের উপাখ্যান আছে, তাঁহার গভীর অনুতাপ ও মৃত্যু কালীন স্তবাদি পাঠ করিলে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিবে। ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পাগল হরনাথ কথামৃত।

—:০:—

(শ্রীভাগবত চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্র। কোন কোন সাধুর মুখে পরের কুৎসা শুনা যায় কেন?

উ। দুটো একটা কাগি বগি ভস্ম ক'রে অভিমান হয়, এই অভিমান সামলান হ'চ্চে পুরুষত্ব।

কোন সাধু এক গাছ তলায় বসিয়া যোগাভ্যাস করিতেন, কোন দিন এক বক তাঁহার মাথায় বিষ্ঠা ত্যাগ করে, তাহাতে সাধু কুপিত হইয়া উর্দ্ধে বকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে সেই বক ভস্মীভূত হইয়া যায়, এই দেখিয়া সাধু ভাবিলেন, তবে ত আমি সিদ্ধ হইয়াছি? এই ভাবিয়া সেই সাধু গাছ তলা ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন, একদিন কোন গৃহস্থের বাটী আসিয়া ভিক্ষা চাহিলেন, তাহাতে বাটীর গৃহ লক্ষ্মী সাধুকে ভিক্ষা দিতে স্বীকার করিলেন ও তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এদিকে সেই গৃহলক্ষ্মী তাঁহার স্বামীর পদ সেবা করিতেছিলেন। সাধু ভিক্ষা দিতে বিলম্ব দেখিয়া ও সাধুদের ভিক্ষা স্বীকার করিয়া ফিরিতে নাই জানিয়া বার বার শীঘ্র ভিক্ষা দিতে বলিতেছিলেন, তাহাতেও ভিক্ষা না পাওয়ায় সাধু গৃহস্থকে শাপ দিবার ভয় দেখাইলেন। এই শাপ দিবার কথা শুনিয়া সেই গৃহলক্ষ্মী বলিলেন "ঠাকুর,

---

* এই প্রবন্ধটী, "উপদেশামৃত" নামে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু উহার স্নেহাস্পদ সংগ্রাহক ভাগবত বাবার অভিপ্রায় অনুসারে এবার উহা "কথামৃত" নাম ধারণ করিয়া বাহির হইল। বলা বাহুল্য, এরূপ নাম পরিবর্ত্তনে কাহার ও কোন আপত্তির কারণ নাই। 'ভক্তি'র কৃপাময় ভক্ত পাঠক মহোদয়গণ! অমৃত প্রসাদ স্বরূপ এই অপূর্ব্ব সংগ্রহের রস আস্বাদন করিয়া অনাবিল আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হউন এবং ভাগবত বাবার জয় ঘোষণা করুন।

একটা বক ভস্ম ক'রে অভিমান হ'য়েছে, এ আর কাগি বগি ভস্ম নয়, আমি সতী, তাহার উপর আবার স্বামী সেবা করিতেছি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, ভিক্ষা দিতেছি।

স্বামী সোহাগিণী হইলে যেমন গহনা চাহিতে হয় না, স্বামীই দিয়া থাকেন ও তাহার কথামত প্রণয়িনীকে সাজাইয়া থাকেন। সেইরূপ প্রভুর নিকট ঐশ্বর্য্য চাহিতে হয় না; না চাহিলেও তিনি সেই ঐশ্বর্য্য অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া থাকেন।

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

অর্থঃ—সমস্ত প্রকৃতি সম্ভূত বর্ণাশ্রমাচার-ধর্ম্ম অগ্রে অর্জ্জন ও আয়ত্ত করিলে সেই সকল ত্যাগ করিবার অধিকার হইবে, নচেৎ কোন জিনিষের মালিক না হইয়া তাহার ত্যাগের কথা বলা কেমন করিয়া সম্ভব?

রসগোল্লা যদি খাবার ইচ্ছা হয় তো ময়রার দোকানে গিয়া এক পয়সা দিয়া রসগোল্লা ক্রয় করিয়া খাও, কিন্তু যদি তুমি বল আমি ইক্ষু চাষ করিয়া গুড় করিব, গুড় হইতে চিনি করিব, গরু পুষিয়া ছানা করিব ও নিজে রসগোল্লা তৈয়ার করিব, তা হ'লে আর রসগোল্লা খাওয়া হইবে না। সেইরূপ কৃষ্ণচন্দ্রকে পাইতে হইলে কেবল নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া ও বিচার করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, কারণ যে ময়রা ভেঁদো গুড়েরে পাটালি করে, সে রসগোল্লা দিতে পারিবে না, যে ময়রা সত্যই রসগোল্লা ক'রে সেই ময়রাই কেবল তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে।

প্র। প্রেম কিরূপ ও তাহা সহজে লাভ করা যায় কিনা?

উ। সমুদ্রের নিকট একটি মিষ্ট জল বিশিষ্ট কূপ থাকিলে সকলেই সেই কূপের নিকট যায়, সমুদ্রের নিকট যায় না, অবশ্য যাহারা একবার কূপের জল আস্বাদন করিয়াছে, তাহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া ও কূপের জল লইয়া থাকে; সমুদ্রের জল অনায়াস লভ্য হইলেও লয় না, এখানে সমুদ্রের ও কূপের মাধুর্য্যের তুলনা, বিস্তৃতির তুলনা নয়।

যার যত বড় ঘর, তার ঘরে তত বেশী জীব জন্তু বাস করিতে পারে। জীব জন্তুর বাসের জন্য বড় ঘর নয়, তবে ঘরের শোভার জন্য জীব জন্তু, এই যেন

আমরা মনে প্রাণে বুঝি অর্থাৎ বড় লোকেরা যেন মনে না ভাবেন যে তাহারাই অনেক আশ্রিত লোকের উপায় ও শক্তি।

প্র। আপনি কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন কেন? কালী দুর্গা বলিতে তো একবারও শুনি নাই!

উ। ছোট ছোট ছেলেদের যখন দাদা বুলি বাহির হয়, তখন তাহারা মাকে দাদা বলে, বাবাকে দাদা বলে, এমন কি যাকে দেখে তাকেই দাদা বলে, কারণ সে দাদা ছাড়া অন্য কিছু বলিতে শিখে নাই। ঠিক্ ঐরূপ আমার অবস্থা, আমি কৃষ্ণ বই অন্য বুলি শিখি নাই, তাই সর্ব্বদা যাকে তাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।

প্র। মোক্ষ বা ঈশ্বর লাভের আনন্দ কি মাধুর্য্যের ভালবাসার সমান নয়?

উ। মাধুর্য্যে কেবল বদন দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়, আর ঐশ্বর্য্যে ঈশ্বরের চরণ লাভ হয় বা মোক্ষ হয়। যাঁহারা প্রভুকে ভাল বাসেন তাঁহারা মুখ না দেখে সুখ পান না। শাক্তে কেবল তাঁহার চরণ দেখিতে চায় অন্য কিছু দেখিতে বাসনা করে না, কিন্তু মা যশোদা প্রথমেই কৃষ্ণের মুখ দেখিত, ভাবিত মুখটী বুঝি শুখাইয়া গিয়াছে এই দেখিবার জন্যই মুখ দেখ্‌তো, পরে অবসর পাইলে পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে কিনা দেখিত। মাধুর্য্যের আনন্দ মুখে প্রকাশ করা যায় না, যে অনুভব করিয়াছে সেই জানে অন্য লোকে সে বিষয়ে কি বলিবে?

প্রেমময় দাদার মধু মাখা এই উত্তরটী পাঠ করিয়া, আমার একটী ঘটনা মনে পড়িল, একদিন দাদার কাছে থাকিয়া এক খানি রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দেখিতে ছিলাম; আমি যুগল চরণ দর্শন করিতে করিতে বলিলাম "আমার অধিকার এই পর্য্যন্ত"। দাদা হাসিয়া বলিলেন, না—না, হাসি মাখা মুখ খানি দেখ!

"দাদার কৃপাদেশ অনুসারে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, যাহা দেখিলাম কখন তাহা ভুলিবার নহে, সেই হাসি মাখা মুখ খানি কখন কখন মনে পড়িয়া প্রাণে অনাবিল আনন্দ প্রবাহ ছুটাইয়া থাকে। এই ভাবে বিভাবিত হইয়া একদিন একটী কবিতা লিখিয়া ছিলাম; ভক্তগণের আস্বাদনার্থ কবিতাটী এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সেই-মুখ-খানি।

—:•:—

সেই হাসিমাখা, সুধাসিন্ধু ছাঁকা, মু'খানি পড়িছে মনে।
সেই চাঁদ নিরমল শ্রীমুখ কমল, জাগে অবিরল পরাণে।
সেই অলক তিলক জাল সুমণ্ডিত,
সেই বঙ্কিম চাহনি নেত্র সুশোভিত,
সেই অধর যুগল অরুণ রঞ্জিত,
(মম) চিত খানি সদা টানে।
ভুলিতে কি পারি? ভুলিবার নয়,
নিত্য-সম্বন্ধ তারসনেতে রয়;
যদিও মায়ার প্রতাপ দুর্জ্জয়,
(তবু) থেকে থেকে পড়ে মনে।
(সেই) চাঁচর কেশ পরে মোহন চূড়াটী,
কর্ণেতে কুণ্ডল কিবা পরিপাটী,
আকর্ণ বিস্তৃত পদ্ম আঁখি দুটী,
কিবা মধুর ভাব আনে।
(সেই) কি যেন কি ভাবে ভরা মধুময়,
বল্‌তে গেলে পরে, শক্তি নাহি রয়;
অনুভবে হয় আভাস উদয়,
সুষমার অন্ত কেবা জানে?
(সেই) সুকোমল গণ্ড অতি সুশোভন,
নেত্র রসায়ণ, লাবণ্য সদন,
ঈষৎ লোহিত আভা প্রকটন,
(যার) তুলনা বালার্ক কিরণে।
সেই ভ্রূযুগ ধনুক কি সৌষ্টব পূর্ণ;
কামিনী কুলের করে দর্প চূর্ণ;

প্রকৃতির ভাবে হইয়ে ভাবাপন্ন,
চেয়ে থাকি তারি পানে।
সেই বেনু মুখরিত গোবিন্দ-বদন,
সেই অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ললাট মোহন,
তিল ফুল জিনি নাসা সুশোভন
মুকুতার ভূষা দোলনে।
সে মুখের নাহি সৌন্দর্য্যের সীমা,
প্রাকৃত জগতে মিলে কি তুলনা?
শুদ্ধ ভক্তি যোগে ক'রলে উপাসনা,
বাঁধা পড়ে মানস-নয়নে।
সেই মুখ খানি স্মরণ করিতে,
সেই মুখ খানি হৃদয়ে ধরিতে,
সেই মুখ খানি সদা নিরখিতে,
বাসনা উঠিছে জীবনে।
ভুবন মোহন সেই মুখ খানি?
হৃদয়ে বসাব কবে তা'না জানি।
বিজনে বসিয়া শুধু দিন গণি,
হরির দয়া হবে কি জীবনে?

প্র। মাধুর্য্যের ভাবে কেবল স্ত্রীর অধিকার কেন?

উ। স্ত্রীর যেমন স্বামীর উপর অধিকার, অন্য কাহারও তেমন অধিকার নাই, এই হ'চ্চে ইহার কারণ। বাপের ছেলেদের উপর এক রকম অধিকার, মার অন্য প্রকার অধিকার, সেইরূপ ভাই বোন ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অধিকার, কিন্তু বাপ, মা, ভাই, বোন, ইত্যাদির অধিকার স্ত্রীর তো আছেই, পরন্তু স্ত্রীতে এক প্রকার অধিকার আছে, যাহা অন্য কাহারও নাই।

প্র। বস্ত্রহরণ ব্যাপারটা কি?

উ। ষোল আনা খোলা হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে হয়, তাহার নিকট সামান্য একটু গোপন চলে না। শ্রীকৃষ্ণই হ'চ্চেন আত্মারাম তাই আত্মারামের নিকট গোপন করিবার কি আছে?

প্র। যদি প্রভুর নিকট ষোল আনা খোলা না হ'লে চলে না, তবে গোপীরা বস্ত্র চাহিয়াছিল কেন ?

উ। গোপীরা যে কৃষ্ণের নিকট বস্ত্র চাহিয়া ছিলেন, সে কেবল গুরুজন লজ্জা ভয়ে, পাছে কোন গুরুজন তাঁহাদের বিবস্ত্র দেখেন।

প্র। আমরা পুরুষ; স্বামী ভাবে তাঁহাকে ভজন করা কি আমাদের দুরুহ নয় ?

উ। স্বামী ভাবে প্রভুকে ডাকা সহজ। কোন জজ্‌কে জজ ব'লে ভাল বাসিলে সর্ব্বদা প্রভু প্রভু ব'লে তটস্থ থাকিতে হয়, কিন্তু স্বামী ভাবে ভজন করিলে আর ঐরূপ তটস্থ ভাবে থাকিতে হয় না, তখন তাঁর অন্দরের একজন হই; তাই, তখন কোন বিধি নিষেধ থাকে না, বা কোন প্রকারের অপরাধ হয় না. ভাবে ভান করার একমাত্র উপায় আত্ম বিস্মৃতি হইয়া তাঁহাকে ভালবাসা; যতদিন না আত্ম বিস্মৃতি হইয়া তাঁহাকে ভালবাসা যায়, ততদিন তাঁহার প্রেয়সি হওয়া যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ জীব জন্তুরই তিনি স্বামী. কিন্তু যে যত আত্ম-বিস্মৃতি হইয়া তাঁহাকে ভাল বাসে সে তত তাঁর প্রাণের প্রেয়সী হয়, তাঁর নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে ভাল বাসেন।

প্র। আমরা তাঁহাকে এত ডাকি, কিন্তু তাঁহার নিকট আছি বলে মনে হয় না কেন ?

উ। বেশ্যা ভাবে তাঁহাকে প্রাণবল্লভ বলে ডাকিলে তাঁহাকে ডাকা হয় না, কারণ বেশ্যারা তাহাদের নাগরকে প্রাণবল্লভ বলে মুখে, অন্তরে নাগরের অর্থকে প্রাণবল্লভ বলিয়া থাকে। যাহারা বিত্ত বা ঐশ্বর্য্য লোভে তাঁহাকে স্বামী ব'লে ভাল বাসিতে যায়, তাহারা প্রভুর নিকট বেশ্যার আচরণ করে মাত্র। বিধি মার্গের সাধন আর কিছুই নয়, ঐশ্বর্য্য-সাধন।

প্র। ব্যাসদেবের কি উদ্দেশ্য যে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করি ?

উ। স্বয়ং ব্যাসদেবের বর্ত্তমানতা কি আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করেন ? যদি তা না করেন, তবে তাঁহার লিখিত ভাগবতের অর্থ কেন আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করিবেন ?

প্র। পবিত্রতা কি অপবিত্রতা বিচার করা কি ভাল নয়?

উ। চিৎ ও জড়ের সংমিলনে এ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এজগতের কোন জিনিষই চৈতন্য ছাড়া নয়। যে জিনিষ চৈতন্য সংযুক্ত, সে জিনিষ কেমন করিয়া পবিত্র বা অপবিত্র হইতে পারে। পবিত্র বা অপবিত্র আমার পক্ষে, জগতের পক্ষে নয়।

প্র। বৃন্দাবনে কি কেবল মাত্র একবার রাস হইয়াছিল, না পূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছিল?

উ। রাস যে এখনও হচ্চে না, একথা কেমন করে ব'লবে, রাসে যাবার আগেই মূর্চ্ছা হয়; তাই কেহই সেখানকার খবর বলতে পারে না।

রাস যে সর্ব্বদাই হচ্চে তা Circulation of blood (রক্তের সঞ্চালন) এর system (প্রণালী) দেখিলেই বুঝা যায়। Circulation of blood (রক্ত সঞ্চালন) এর মতন রাস ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে হ'চ্চে। রাস ছাড়া কেহ নাই বা থাকিতে পারে না Blood (রক্তের) দুটী atom পরমাণু চিৎশক্তি দ্বারা separate পৃথক থাকে। চিৎশক্তি হ'চ্চে শ্রীকৃষ্ণ, আর atom (পরমাণু) দুটী প্রকৃতি বা গোপী।

প্র। রাসের সুখ তবে আমরা অনুভব করি না কেন!

উ। রাসের অনাহত শব্দ অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে, তবে যে যত কেন্দ্রের কাছে গেছে সে তত সুস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া সুখ অনুভব করে। যেমন যাত্রা শুনিতে গেলে যে কাছে থাকে, সে ভাল শুনিতে ও দেখিতে পায়, কিন্তু যে এক মাইল দূরে থাকে, সে তেমন শুনিতে বা দেখতে পায় না। রাসের কথা মুখে বলা যায় না, নিজে নিজে অনুভব করিতে হয়। যে এ বিষয়ের বর্ণনা করিতে যায়, সে কোম প্রকারে ইহাতে কৃতকার্য্য হয় না, তাই এত মধুর ব'লে বোধ হয় না।

প্র। একবার মাত্র হরি নামের ফল কি?

উ। রাম নাম করিলে যেমন ভূত প্রেত সকল পলাইয়া যায়, ও ঐ নামে তাদের উদ্ধার হয়। যে বাড়ীতে ভূত থাকে, সেখানে রাম নাম করিলে ভূত পলাইয়া যায়। সেইরূপ কৃষ্ণ নামে মায়া পলাইয়া যায় ও বিনষ্ট হয়। যে একবার মনে প্রাণে কৃষ্ণনাম বলে, তাহার পক্ষে ধন দৌলত ধিক্কার ব'লে জ্ঞান হয়।

প্র। ঈশ্বরকে পাওয়া কঠিন; তবে কত দিনে তিনি কৃপা করিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ করেন?

উ। মা যেমন ছোট ছেলেকে শোয়াইয়া কাজ করিতে যান, তেমন প্রভুও আমাদের সংসারে দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। যদি কোন ছেলে মা মা বলে কাঁদে, তাহলে মা একটা লাল চুষি, খাবার দ্রব্য অর্থাৎ ধন, দৌলত, ছেলে মেয়ে ইত্যাদি দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, কিন্তু যে ছেলে সে সকল লইয়া বা না লইয়া তবুও কাঁদিতে থাকে, তখন মা স্বয়ং আসিয়া মাই দিতে থাকেন।

যে রাধাকে কৃষ্ণ-কলঙ্কিণী বলে, সেও একদিন না একদিন মায়ার অতীত হবে।

প্র। সহজে কি করিলে কামকে প্রেমে পরিণত করা যায়?

উ। জল যেমন সামান্য নালা কাটিয়া দিলে যতদূর শক্তি গড়াইয়া যায়, সেইরূপ কামের অন্তর্গত ভাল বাসাকে ঘরের বাহির করিতে পারিলে বিশ্ব প্রেম হয়। তখনই কাম পরশমণির স্পর্শে প্রেম হয়। কাম হচ্ছে বড় circle (বৃত্ত), তাহার অন্তর্গত ভালবাসা হচ্ছে ছোট circle (বৃত্ত), যখন বিশ্ব প্রেম হইতে আরম্ভ হয়, তখন এই ছোট circle (বৃত্ত) ভালবাসা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে ও বাড়িয়া বাড়িয়া কাম বড় circle (বৃত্ত) কে ছাপিয়া গেলে, তখন কাম বলিয়া স্বতন্ত্র জিনিষ আর তাহাতে থাকে না, যাহা থাকে, সে কেবলই ভালবাসা বা প্রেম।

প্র। বিশ্ব প্রেম কি করে বাড়ান যায়?

উ। কষ্ট ক'রে ঘরে একটী ফুটো ক'রে দাও তাহা হইলে ভাল বাসা জগত ছাইয়া ফেলিবে। আগে পরকে একটু ভাল বাস্‌তে শিখ, তখন দেখবে প্রেমে জগত ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রথম প্রথম অপরের ছেলেকে আপনার ছেলের মতন ভালবাস, অপরের মাকে আপনার মার মতন ভালবাস, তখন দেখবে যে কোন চেষ্টা না করিলেও তুমি জগতকে প্রেমে ডুবাইয়া দিবে; কিন্তু সাবধান! যেন ভাবের ঘরে চুরি না হয় অর্থাৎ পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মতন দেখবার সময় নিজে নিজেকে যেন বঞ্চনা না করে। এই ভালবাসা সহজে শিখ্‌তে পারবে বলে শাস্ত্রে ভাই বোনের বিবাহ পদ্ধতি লেখে নাই, পরের ঘরে বিবাহ করিবার নিয়ম লিখেছে, তাহলে অন্ততঃ একটীও পরের ঘরকে ভাল বাস্‌তে শিখ্‌বে।

ক্রমশঃ শ্রীরসিকলাল দে।

গোসাঞি-রাম ।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।)

পালচৌধুরীগণ হাঁসাড়ার প্রাচীন সম্মানিত কায়স্থ জমীদার। পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। এক সময় এই বাউলের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া অপরাধ ধরিয়া ঐ পালবংশীয় কোন এক ব্যক্তি ক্ষেপা বাউলকে কয়েদ রাখিয়াছিল, তখন ইনি বলিয়াছিলেন "আর জ্বালাস্‌নে"। এর পর চৌধুরীদের গৃহদাহ হয়। বাক্‌সিদ্ধির প্রমাণ বিবৃত করিবার আর প্রয়োজন নাই। এই কয়েকটী বৃত্তান্তই যথেষ্ট বটে। নিয়ত যে ব্যক্তি সত্যকথা বলেন, তিনি এজন্মে না হন, জন্মান্তরে বাক্‌সিদ্ধ হন এরূপ প্রতীতি অমূলক বলা যাইতে পারে না। গোসাঞি বাউলের সিদ্ধি সব জন্মান্তরের; নচেৎ বাল্যাবধি বিনা সাধনে, বিনা শিক্ষায় এমন অলৌকিক শক্তি ও ভাব সম্পন্ন তিনি হইবেন কেন ?

গোসাঞি রামের প্রধান শিষ্য ছিলেন "কেবল বাউল"। ইনিও একজন শক্তি সম্পন্ন ভক্ত ছিলেন। ইঁহার আখড়া হাঁসাড়ার তিন মাইল উত্তরে রাজা নগর গ্রামে অদ্যাপি শোভা পাইতেছে। গোসাঞি রামের আখড়ার প্রধান সেবাইত ৺রামানন্দ অধিকারী বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার শিষ্য দয়াল দাস। তৎশিষ্য শ্রীরাধিকা দাস বাবাজী আখড়ার বর্ত্তমান সেবাইত। এখন এই আখড়ার সেবাইতগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ৺রামনন্দ অধিকারী হইতেই এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্রীবিগ্রহ কোন সময় স্থাপিত হইয়াছেন জানা যায় নাই।

আখড়ার সম্মুখস্থ গৃহে ৺গোসাঞি রামের সমাধি দৃষ্ট হয়। ইহার উপর ইষ্টকময়ী বেদী রহিয়াছে, তদুপর বাউলের পবিত্র পাদুকাযোড় ও সেই চরণ নূপুরদ্বয় বিরাজ করিতেছেন। নূপুরদ্বয় তাঁহার ব্যবহৃত বলিয়া উহাদের দর্শনে ভাব জন্মায় এবং চিত্তে ভক্তির উদ্রেক হয়।

প্রাচীন কতিপয় প্রতিবেশী বলিলেন, গোসাইরাম বাউল গৌরবর্ণ, স্থূলাকার, সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তিনি কপালে সতত সিন্দুর পরিতেন। তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল সমধিক উজ্জ্বল দেখাইত। তিনি কটিতে মাত্র কৌপীন ও পদে

নূপুরজোড় ব্যবহার করিতেন। তদ্ভিন্ন অপর কিছু ধারণ করিতেন না। হাঁসাড়ার কতিপয় তিলিজাতীয় ভক্ত আখড়ায় সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দৈনিক ভিক্ষা ও সাময়িক সাহায্যই আখড়ার একমাত্র সম্বল। বিবাহোপলক্ষে গৃহস্থ ভক্ত কিছু কিছু সাহায্য দেন।

গোসাঞিরাম ব্যাসাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দেহত্যাগ করেন, ইহাও বিস্ময়কর বটে। ইহার বংশীয় অধস্তন ৩য় কি ৪র্থ পুরুষ বিদ্যমান দেখি। ইহার নাম শ্রীমথুরানাথ ঠাকুর।

গোসাঞি রামের জীবনের ঘটনাবলী সব অলৌকিক সন্দেহ নাই। ইনি প্রেম ও দয়ার মুর্ত্তি বলিয়া আমাদের আলোচ্য। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের আলোচনা আনুষঙ্গিক মাত্র। ভক্ত পাঠকগণ এজন্য ক্ষুব্ধ হইবেন না।

শ্রীকালীহর দাস বসু।

ঘুম ভাঙ্গিবে কি মন!

—:০:—

দুর্ল্লভ জনম পেয়ে নাবলরে হরি।
বৃথায় চেতন তার, ঘোর নিদ্রা তারি॥
হইয়া বিধির দাস প'ড়ে কর্ম্মফেরে।
ধন জনে আত্মজ্ঞানে স্বপন নেহারে॥

অলস মন! তুমি কি দিন রাতই ঘুমাইয়া থাকিবে? তোমার ঘুমকি একবারও ভাঙ্গিবে না? তুমি কি একবারও জাগিবে না? একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া, মাথা তুলিয়া, নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখ, যোগমায়ার স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানালোকের অভাবে, এবং কুহকী বিষ্ণুমায়াচ্ছন্ন অজ্ঞানরূপ ঘোর তমস্ প্রভাবে তোমার মনে হইবে যে, আমি চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকার বৈ আর কিছুই দেখিতেছিনা। যখন তুমি সজাগ হইয়া উঠিবে, তখন সংসঙ্গ অভিলাষ করিবে, অভিলাষিত ফল প্রাপ্ত হইলে তোমার মনোমধ্যে সদুপদেশ প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানের আলোক মাণিকের ন্যায় দপ্ দপ্ জ্বলিতে থাকিবে। জ্ঞান কি

জান ? সাধুর উপদেশে ব্যাকুলতা আসিবে, ব্যাকুলতা আসিলেই ভগবানের কৃপা হইবে, সেই কৃপাই জ্ঞানালোক বলিয়া জানিবে। এখন মনে করিতেছ, আমি বেশ জাগ্রত আছি, আমি নিয়ত নানাবিধ পার্থিব পদার্থ দর্শন করিতেছি। যতদিন তুমি ভ্রম ঘুমে থাকিবে ততদিন তোমার নশ্বর তুচ্ছ ভাব ঘুচিবেনা। যখন ঘুচিবে, তখন মনে হইবে আমি ত প্রকৃত জাগ্রতাবস্থায় ছিলাম না, ঘোর নিদ্রার আকর্ষণে পড়িয়া চেতনা শূন্য হইয়াছিলাম। তখন ভাবিতে থাকিবে, যাহা গেলে আর হয়না, যাহা হারাইলে আর মিলেনা এমন অমূল্য সময় এক্ নিদ্রার আকর্ষণে থাকিয়াইত নষ্ট হয় ? আমি নিদ্রায় ছিলাম, তাই অনেক সময় অকারণ নষ্ট করিয়াছি, স্বভাবত জীবে যতক্ষণ জাগ্রত থাকে ততক্ষণ সৎ বা অসৎ কর্ম্মেইত সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে, আমিত ভ্রম ঘুমে থাকিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, এই ভাবনায় ভয়ে আত্মহারা হইয়া পড়িবে, আর যাহা দর্শন করিতেছ, এই দৃশ্য মনে হইবে আমি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপনে বিষয়া-নুভব করিতেছি, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন জল বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গুর জানিয়া নিত্য বস্তুর ন্যায় দর্শন করিতেছি, অবিদ্যা বন্ধন সংসারের বাসনা ত্যাগ হইয়া এরূপ ঔদাস্য জন্মাইবে কবে ? ঘুম না ভাঙ্গিলে, ঘুম ভাঙ্গে কিসে ? যদি তোমার পূর্ব্ব সঞ্চিত কিঞ্চিৎ পুণ্যের সঞ্চয় থাকে, যদি সাধু সহবাসের ইচ্ছা হয়, যদি অহঙ্কারকে তাড়াইয়া সাধনের পথে প্রেরিত কর, তাহা হইলে জানিবে যে ঘুম ভাঙ্গিল, ঘুম ভাঙ্গিলে সংসার মায়া ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিয়া তোমার ভীতির উদয় হইবে, তখন ভাবিবে, হায় ! আমি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমি অকারণ ধন, জন, আপন ভাবিয়া, আত্ম বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, বৃথা কর্ম্মে অমূল্য সময়-রত্ন হারাইয়াছি, আমার গতি কি হইবে ? এই-রূপ একটা আকস্মিক আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইলে তুমি কুমার্গগামী অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎকর্ম্ম ও সৎ আলোচনার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভয় নিবারণ করিতে উদ্যত হইবে, সৎসঙ্গগুণে সৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ভগবানকে লাভ করিয়া ভয়ের পথরুদ্ধ করিবে, এবং সেই শ্রীচরণ একান্ত ভাবনা করিয়া নিরন্তর সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে, যেমন মানুষে দিনরাত খাটে, যখন নিদ্রা আসিয়া আকর্ষণ করে, তখন সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সুষুপ্তির কোলে শয়ন করত চেতনা শূন্য হইয়া নিদ্রা যায়, আবার ঘুম

ভাঙ্গিলে সেই খাটুনীর কথা মনে পড়ে তৎপরে কর্ম্মে গিয়া প্রবৃত্ত হয় ও কর্ম্ম করে. তেমনি তুমি ভ্রম নিদ্রার কোলে শয়ন করিয়াছ, তোমার ঘুম ভাঙ্গিলে তুমি বিধির দাস না হইয়া সঙ্কল্পাত্মক কর্ম্ম বাসনা পূর্ণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনের পথে উপনীত হইবে, সাধনের পথে উপনীত হইলে সাধ্যের সুমার্জিত প্রসস্থ পথ দর্শন করিতে পাইবে, এবং ক্রমশই ভক্তির বিকাশ হইতে থাকিবে. ভক্তির বিকাশ হইলে ভগবানের কৃপা হইবে, কৃপা হইলে ভাব আসিবে, ভাব আসিলে তোমার মনোগত অপূর্ব্ব সুধা পান করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িবে। মন! জাগ, জাগ, সুধু ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করিও না, জাগ! জাগ !!

অদেখায় দেখ্‌তে খুশী দেখায় দেখ্‌লিনা।
যারে চোক মুদিলে যায়রে দেখা তায় কি চেননা?
ধন জনাদি সকল দেখ্‌তেছ,
চোক মুদিয়ে দেখ দেখি মন! দেখ্‌তে পেয়েছ?
যখন মুদ্‌বে আঁখি, সকল ফাঁকী,
জন্মের মত জাননা॥
বুঝ্‌লি না মন ঘুমেরি কালে,
লক্ষ টাকার ধনী হ'লে যায় সকল ভুলে,
যখন চিরকালের ঘুম ঘুমাবি সে ঘুমত আর ভাঙ্গবেনা॥

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য।

ভক্তি।

বৈশাখ মাস, ১ম সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

অবিবেক-ঘনান্ধ-দিঙ্‌মুখে
বহুধা সন্তত-দুঃখ--বর্ষিণি।
ভগবন্! ভবদুর্দ্দিনে পথঃ
স্খলিতং মামবলোকয়াচ্যুত! ॥

দেখ অচ্যুত! আমি পথচ্যুত। তুমি যখন 'অচ্যুত,' তখন তোমার চ্যুতির সম্ভাবনা নাই,—পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু আমি তো আর তা নয়, তাই তোমার পথ গুরু-রূপে তুমি দেখাইয়া দিলেও, তাহা হইতে আমি বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি।

এই চ্যুতির প্রতি কারণটা তোমায় বুঝাইয়া দিই। দোষী হইলেও—আমি, আমার ভাগ্য, কি তোমার ভবের স্বভাব, বেশী দোষী কে, তাহা হইলে ভালই বুঝা যাইবে। তুমি তো ভগবন্,—ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত বীর্য্য, সমস্ত যশ, সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বৈরাগ্যের তো তুমি একাই দখলিদার। আমি জীব,—তোমার অংশ হই-লেও এত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অংশ যে, ধারণাতেই ধরা যায় না। সে তো সেই একগাছি চুলের আগা, তার শত ভাগের এক ভাগ, তার আবার শত ভাগের এক ভাগ বই তো নয়? তাই তোমার অংশ হইলেও

তোমাতে আমাতে অনেক তফাৎ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি, তোমার ভবে তোমাকে তুমি ঠিক রাখিতে পারো; কিন্তু আমাদের রাখাই কঠিন।

কথাটা একটু খুলিয়াই বলি। তোমার এই সাধের ভবসংসার সে। আর সহজ জায়গা নয়। শাস্ত্রে বলে,—"মেঘাচ্ছন্নেঽহ্নি দুর্দ্দিনম্"। সে দুর্দ্দিন এখানে লাগিয়াই আছে। অবিবেক-মেঘে দিক্‌বিদিক্ ঢাকা, যে দিকে যাই আঁধার আঁধার—কেবলই আঁধার। কিছুই দেখিবার যো নাই; অপর সামগ্রী কি আপনাকেও দেখিবার যো নাই। তাহার উপর অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ। এ জল আবার যেমন তেমন নয়, বিবিধ দুঃখই ওই বারি রূপে পরিণত। একে চক্ষে কিছু দেখিতে পাই না, তাহার উপর ওই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক দুঃখ বর্ষণে ব্যতিব্যস্ত। এ অবস্থায় সুপথ কুপথ ঠিক রাখি কি করিয়া বল? ভগবান্ তুমি, আপনার জ্ঞানালোকে তুমি আপনি উদ্ভাসিত, আপনার অসমোর্দ্ধ শক্তিতে তুমি আপনি সমন্বিত, এ অজ্ঞান আঁধারে আর তোমার কি করিবে বল? করিতে পারে না বলিয়াই তো তুমি আমাদের অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না? পারিলে কি আর তুমি দেখিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতে, না কৃপাকটাক্ষে আত্মসাৎ না করিতে?

ওহে ও ভগবন্! মিনতি করি, তুমি একবার দয়া করিয়া তোমার ওই ভবকেও দেখ, আর আমাকেও দেখ; দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, কেন আমি তোমার পথ ছাড়িয়া ওই ভবেরই অপর মূর্ত্তি—অধিকতর ভীষণ ও ভয়ানক মূর্ত্তি ভবসংসারে আসিয়া পতিত হইয়াছি। অচ্যুত হে! দেখ দেখ, দয়া না করিয়াও একটী বার দেখ, আমার দশাই তোমার দয়ার উদ্রেক করিয়া দিবে। আমার আর বলিবার কিছুই নাই, প্রার্থনাও কিছুই নাই, দয়া কর আর না-ই কর, "আমার" বলিয়া স্বীকার কর আর না-ই কর, একটী বার তুমি আমার দিকে নয়ন চালন কর, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইয়া যাইব।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

নিত্যধামগত প্রেমিক ভক্তপ্রবর

দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

—:০:—

(জীবনী-প্রসঙ্গ)

(১)

জন্ম ও বাল্য জীবন।

মহাপুরুষ দিগের পার্থিব জীবন, কখন কি ভাবে অতিবাহিত হয়, তাহার সকল বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া, লোক সমাজে, গুরুরূপে, ধর্ম্মপ্রচারক রূপে, তাপিত প্রাণের শান্তি দাতারূপে, আত্ম প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ জীবন চরিত প্রকাশ করিবার যোগ্য "মুরারি গুপ্ত" বা "কৃষ্ণ দাস কবিরাজ" সকল সময়ে ও সকল দেশে জন্ম গ্রহণ করেন না। লোকে সেই সকল মহাপুরুষের চরণ দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া যায়, তাঁহাদের দর্শন মাত্র মনে সাত্বিক ভাবের উদয় হয়, সুতরাং তাঁহাদের নিকট কেবল তত্ব আলোচনা করিয়া থাকে। তাঁহাদের জীবন কখন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, এসকল কথা, কেহ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন না, তাঁহারাও কাহাকে বলেন না। উক্ত মহাপুরুষের নিকটে যাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, যাঁহারা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, তাঁহার দর্শনে আনন্দ অনুভব করিতেন, তাঁহারা, তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের দুই একটী কথা অবগত হইলেও, তাঁহার পারিবারিক পরিচয়, বা তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন না। সুতরাং আমরা তাঁহার অগ্রজ মহাশয়ের নিকট যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার জীবনী প্রসঙ্গ রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বরিশাল জেলায়, গৌরনদী তীরবর্ত্তী হরিসেনা গ্রামে, কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে, একজন স্বধর্ম্ম নিরত, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন; দেবসেবায় তাঁহার

দিনাতিপাত হইত। ১৭৯২ শকাব্দের "সৌর চৈত্রস্য দ্বিতীয় দিবসে, বুধ বাসরে, কৃষ্ণপক্ষীয়া দশমী তিথিতে" শুভ ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র দীনবন্ধুর জন্ম হয়। এই নব-জাত শিশুর লাবণ্য দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য পরিবারের সকলে, একেবারে মোহিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই শিশু, মাতৃগর্ভে বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিয়াছিল বলিয়া, কেহ কেহ বলিতেন যে—"এ বালক ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ পুরুষ হইবে। পাড়ার অন্যান্য পুত্রবতী রমণীরা, ভট্টাচার্য্যের বাঁড়ীতে যখন আসিতেন, তখন তাঁহারা নিজ সন্তানকে কোল হইতে নামাইয়া, দিব্য-কান্তিময় দীনবন্ধুকে সাগ্রহে কোলে লইতেন। এইরূপ প্রীতি বাহুল্যে, শিশু দীনবন্ধু, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

দীনবন্ধু জন্মাবধি বড়ই ধীর; বিশেষতঃ যখন পারিবারিক বিগ্রহ গোবিন্দ দেবের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা ধ্বনি হইত তখন স্থির হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। আবার যখন শৈশব স্বভাব সুলভ ক্রন্দন করিতেন, তখন ঐ মন্দিরের নিকট লইয়া গেলে, শান্ত হইতেন। দীনবন্ধুর বয়ঃক্রম যখন দশ মাস মাত্র, তখন একদিন তদীয় অগ্রজ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া, বহির্বাটীতে মন্দির প্রাঙ্গনে, বসিয়া আছেন, এমন সময় সহসা তিনি পড়িয়া যান। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার অগ্রজ যথেষ্ট আঘাত পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি কণ্টক পুর্ণ স্থানে পড়িয়াও কোন আঘাত পাইলেন না। বরং সকলে দেখিল, তিনি মন্দিরস্থিত বিগ্রহের পানে চাহিয়া, স্থির হইয়া আছেন। এই ব্যাপারে, সকলেই বিস্ময় বোধ করিলেন।

এই স্থানটী তাঁহার বাল্য জীবনে বড়ই প্রিয় হইয়াছিল। চারি পাঁচ বৎসর বয়ক্রম কালে, যখন অল্পে অল্পে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইতে আরম্ভ হইল, তখন তিনি ঐ স্থানটীতে বসিয়া খেলা করিতেন। অন্যত্র, বহু বালকের আড়ম্বর পুর্ণ খেলায় তাঁহার মন তৃপ্ত হইত না। এই স্থানটীতে না বসিলে যেন তাঁহার খেলা হয় না। সে খেলাও আর কিছু নয়; মৃত্তিকাদি সংগ্রহ করিয়া ঘট স্থাপনা; খেলাছলে গোবিন্দ পূজা, আরত্তি ইত্যাদি। কোন কোন দিন পাড়ার বালক দিগকে আহ্বান করিয়া, ঐ স্থানে "হরির লুট" দিতেন ও মহানন্দে "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতেন। বালক দীন-

বন্ধুর এই হরি প্রীতি দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐ স্থানে একটী স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দির মধ্যে, বালক দীনবন্ধুর সেই খেলা ঘরের স্থাপিত ঘট, সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি উহা নিত্য পূজিত হইতেছে।

বালকেরা সাধারণতঃ আহার প্রিয়, আহারের সময় বা ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বালকেরা বড়ই অস্থির হয়। কিন্তু বালক দীনবন্ধুর প্রাণে গোবিন্দ প্রীতি, এত অধিক হইয়াছিল যে, প্রসাদ ভিন্ন অন্য দ্রব্য তিনি আহার করিতেন না। বাটীর অন্যান্য বালক বালিকারা আহার করিতেছে, কিন্তু তিনি নারায়ণের "ভোগ" হইবার পূর্ব্বে কদাচ আহার করিতেন না। যখন কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিতে হইত, তখন আহারের পূর্ব্বে এক বার উদ্দেশে গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া, প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন।

(২)

শিক্ষা ও বিদ্যানুরাগ।

পঞ্চম বর্ষকালে "হাতে খড়ি" হইবার পর, বৎসরাধিক কাল গ্রাম্য পাঠশালায়, দীনবন্ধুর বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। এই সময়, তাঁহার পিতৃস্বসার একমাত্র অপত্য শোক নিবারণের জন্য, উজীরপুর নিবাসী উমাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তাঁহাকে স্বভবনে লইয়া যান। তথায় কিছু কাল, পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, মেধাবী দীনবন্ধু "গুরুমহাশয়ের" সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লয়েন। এবং তথায় বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণ মহাশয়ের পুত্র শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন। সেই বাল্য জীবনে তাঁহার এরূপ বিদ্যানুরাগ ও ভগবদ্ভক্তির ভাবোদ্রেক হইতে আরম্ভ হয় যে তাহাতে সকলে মোহিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা সকলে আলোচনা করিতেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের পূর্ব্বপুরুষ স্থাপিত "কালাচাঁদ গোসাই" বিগ্রহের নিকট থাকিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। বিগ্রহের নিবেদিত ফুল গুলি লইয়া ঘরের পশ্চাতে যাইয়া মাটির মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তিনি পুনর্ব্বার পূজা করিতেন। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরির গান করিতেন। এই সময়ে

কোন আকস্মিক ঘটনা বশতঃ তিনি স্বীয় জন্মভূমি হরিসেনা গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় তাঁহার উপনয়ন হয়। উপনয়নান্তে তিনি স্ব গ্রামে কোন অধ্যাপকের টোলে ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন, কিন্তু মনোমত হইতেছে না দেখিয়া গৈলাগ্রামে গমন করেন ও দুর্গামোহন ঠাকুরের টোলে ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহাকে স্বয়ং রন্ধনাদি করিতে হইত, তথাপি বিদ্যালাভের আশায় তিনি এইরূপ শ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহার আগ্রহ যেমন তীব্র, অধ্যবসায়ও সেইরূপ অসাধারণ ছিল। ব্যাকরণ পাঠ শেষ হইবার পর, কাব্য ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠের জন্য, তিনি শিকারপুরে গমন করেন। কিন্তু তথায় তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তখন বিফল মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং কোথায় যাইলে, কাহার শরণাপন্ন হইলে শাস্ত্র জ্ঞান লাভ হইবে এইভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। সময়ে সময়ে দারুণ উদ্বেগে ক্রন্দন করিতেন ও শ্রীভগবানের নিকট অকপট ভাবে বিদ্যালাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন।

সে প্রার্থনা বিফল হইল না; কলসকাঠি গ্রামের অধ্যাপক বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তাঁহার এই আগ্রহের পরিচয় পাইয়া, সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। দীনবন্ধু অবিলম্বে, কলসকাঠিতে গমন করিলেন ও তাঁহার টোলে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। এই টোলের অধ্যাপক মহাশয় ও ছাত্রবর্গ, তাঁহার অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। কারণ তিনি একবার যাহা শুনিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। একটী শ্লোকের, নানারূপ ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। এই সময়, কলস কাঠির তদানীন্তন জমীদার বরদাকান্ত রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় হইতেও বহু বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী আগমন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বনমালী ভট্টাচার্য্য তথায় দীনবন্ধু প্রভৃতি শিষ্যবর্গ সমেত উপস্থিত ছিলেন। সেই মহতী সভায়, কিশোর দীনবন্ধু, বড় বড় পণ্ডিত দিগের মধ্যে বসিয়া, যে অদ্ভুত শ্লোক পূরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন, তাহাতে সকলে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সেই সভা-জয়ের পর, অধ্যাপক মহলে তাঁহার সুখ্যাতি প্রচারিত হইল। তখন সেই শিকারপুরের অধ্যাপক মহাশয়, যিনি পূর্ব্বে দীনবন্ধুর কাতরতায় কর্ণপাত করেন নাই, তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে ছাত্ররূপে বরণ করিতে চাহিলেন।

কিন্তু দীনবন্ধু আর তথায় গমন করিলেন না। কলসকাঠি টোলের, পাঠশেষ করিয়া, স্মৃতি ও ন্যায় পাঠের জন্য নারায়ণপুরে গমন করেন। তথায় প্রসন্ন স্মৃতিরত্ন ও ন্যায়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ "ন্যায় লঙ্কার" মহাশয়, তাঁহাকে যত্ন সহকারে, উভয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া দিলেন। তৎপরে কাব্য আলোচনার জন্য, কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বরদা বিদ্যারত্নের নিকট; যাইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায়, সে সঙ্কল্প তখন সিদ্ধ হইলনা, সুতরাং গৃহে ফিরিলেন।

এই সময়, তাঁহার বিবাহ হয়। বয়স তখন প্রায় ষোল বৎসর হইবে। যৌবনে, বিশেষতঃ বিবাহের সময়, সাধারণ লোকের মন যে ভাবে উন্মত্ত হয়, তাঁহার সেরূপ ভাব আদৌ ছিলনা। বিবাহ যে একটা পবিত্র বন্ধন, সংসার ধর্ম্মের একটা অঙ্গ বিশেষ, ইহাই তিনি বুঝিতেন। বিবাহ রাত্রে, "বাসর ঘরে" যখন যুবতী ও বৃদ্ধা রমনীরা আসিয়া নানা রূপ রঙ্গরসের উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় তিনি তাহাদিগকে, সেরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং তাহাদিগের মনে যাহাতে "বাসর ঘরের" নীচ রঙ্গরসের আমোদ অপেক্ষা, শত গুণে উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ আনন্দের সঞ্চার হয়, এই উদ্দেশ্যে চিত্তাকর্ষক শাস্ত্র উপাখ্যান সকল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেইদিন তাঁহার মনে যে ভাব আসিয়াছিল, তাহাই ভবিষ্যৎ কালে "দম্পতী-দর্পণ" আকারে পরিণত হইয়াছে।

বিবাহের পর, তিনি বরিশালের "ব্রজ মোহন ইনষ্টিটিউশনের" খ্যাতনামা পণ্ডিত প্রবর কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট কাব্য শাস্ত্র আলোচনা করিতে গমন করেন। এখানে, "তাল তলার" কালী বাড়িতে কোটালি পাড়ার শ্রীযুক্ত নীলরত্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় তাঁহার বাসা ছিল; বাসায় স্বয়ং পাক করিয়া আহার করিতে হইত। এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও, মনোমত বিদ্যাভ্যাস হইত না। কারণ কালীশ পণ্ডিত মহাশয়, কলেজে পড়াইয়া, বৈকালে

বা প্রভাতে যখন অবসর পাইতেন, তখন দীনবন্ধুকে একবার দুই একটী শ্লোক পড়াইতেন মাত্র। দারুণ পিপাসায়, দুই এক বিন্দু শিশির কণা যেমন, বরিশালের বিদ্যাশিক্ষাও, দীনবন্ধুর পক্ষে সেইরূপ হইয়াছিল। এইরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় বলে দীনবন্ধু প্রায় সমস্ত কাব্য শাস্ত্রগুলি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং কাব্য শাস্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এইভাবে কিছু কাল তথায় অবস্থান করিবার পর, অবগত হইলেন যে, মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, "বৃজ মোহন ইনিষ্টিটিউশন" পরিদর্শনে যাইবেন। তিনি এই সুযোগে তাঁহার সহিত দেখা করিতে উদ্যত হইলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় যথা সময়ে বরিশালে আসিলেন। কলেজ পরিদর্শন সাঙ্গ করিয়া আফিস ঘরে বসিয়া রিপোর্ট লিখিতেছেন, এমন সময়ে দ্বারদেশে সুন্দর মূর্ত্তি, দীনবন্ধুকে দণ্ডায়মান দেখিয়া, আগ্রহ সহকারে নিকটে আহ্বান করিলেন ও পরিচয় লইলেন। দীনবন্ধুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও তাঁহার বিদ্যানুরাগ এবং অধ্যবসায় দেখিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয় পরম প্রীত হইলেন। এমন কি, স্বয়ং অর্থ সাহার্য্য করিয়া তাঁহাকে বিদ্যাদান করিতে ও প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু দীনবন্ধু, অর্থের অভাব অপেক্ষা অধ্যাপকের অভাব যে অধিক হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া, ভবানীপুরের বরদাকান্ত বিদ্যারত্নের নিকট যাহাতে তিনি পড়িতে পারেন, কেবল ইহাই প্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য, ন্যায়রত্ন মহাশয়, এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; বরদাবিদ্যারত্নকে আহ্বান করিয়া, দীনবন্ধুর বিদ্যাভ্যাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

—:০:—

(১)

সীমা হীন, অন্ত হীন, ভব পারাবারে,
দিনে দিনে, পলে পলে, হ'তেছি মগন ;
পতিত পাবন হরি,
হইয়ে তুমি কাণ্ডারী,
ভাসাইয়ে দাও প্রভো! এ অভাগা তরে,
সুদীর্ঘ তরণী ওই রাতুল চরণ॥

(২)

বিষয়ে না হই যেন লিপ্ত অহর্নিশি,
বিভব বাসনা যেন সব যায় দূরে ;
আপন ইন্দ্রিয় জিনি,
অপরে স্ব-মিত্র গণি,
সমভাবে সবে যেন আমি ভালবাসি,
কটু বাক্যে প্রাণে ব্যাথা নাহি দিই কারে॥

(৩)

দুঃখীদের দুঃখ দূর করি যেন সদা,
তাহাদের করি যেন মিষ্ট বাক্য দান ;
অন্নহীনে অন্নদানে,
বস্ত্র হীনে বস্ত্র দানে,
অরিরে আলিঙ্গন দানে রত রহি সদা,
দীন জনে কভু যেন না করি পীড়ণ॥

(৪)

কামিনীর রমনীয় রূপ প্রলোভনে,
অন্ধ হ'য়ে কভু যদি বিপথেতে ভ্রমি ;

সুধাইও মোরে হরি,
দেখাইয়ে কৃপা করি,
রমনী-কঙ্কাল যাহা পুড়িছে শ্মশানে,
"এরি তরে ভুলিছ কি নিজ কর্ম্ম তুমি?"

(৫)

জলে, স্থলে, মরুভূমে, ভূধরে, কান্তারে,
কি আলোকে, কি আঁধারে, স্বরগে পাতালে,
কিম্বা পর্ব্বত কন্দরে,
কুঞ্জে, প্রাসাদে, কুটীরে,
যথায় যে ভাবে রহি যেন হে তোমারে,
অনিত্য, নশ্বরে মজি নাহি যাই ভুলে,

শ্রীচুনিলাল চন্দ্র।

চরিত্র শ্রীক্ষেত্রবাসী রাণী।

ভক্তে কৃপা করিতে এবং ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে লীলাময় শ্রীভগবান্ সময় সময় নিত্য-নব-লীলা রটাইবার মানসে নিজচিত্তে এক একটি নূতন সাধ বা বাঞ্ছা জন্মাইয়ালন এবং ভক্তদ্বারা সেই সাধ পূরাইতে তদনুরূপ সেবা গ্রহণ করেন এবং এই ভাবে ভক্তির অলৌকিক মহিমা ও নূতন রঙের আনন্দ কিরণ জীবজগতে ছড়াইয়া দেন। শ্রীভগবান্ এক ঝাঁক শুকপাখী পালেন। লীলা-মাধুর্য্যই তাহাদের আধার। তাহারা আধার খেয়ে খেয়ে আনন্দে পড়ে। তা শুনিয়া শ্রীভগবানের উল্লাস কত। বলিহারি লীলারস-সিন্ধু শ্রীভগবানের, যদি কর্ম্ম থাকে, ইহাই!

ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু-প্রেমবশ্য-শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে কত ছলনা চাতুরী খেলিয়া থাকেন! ক্ষেত্রবাসী রাজার অতি প্রেয়সী পাটরাণী একদিবস মনোসুখে শ্রীগোপাল দর্শনে আসিলেন। তিনি ভাল করিয়া গোপালের রূপখানী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গোপালের সৌন্দর্য্য মাধুরী

দ্বারা রাণীর সর্ব্বচিত্ত বৃত্তি একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। ভগবৎ সৌন্দর্য্য সুবর্ণের নিকষ একমাত্র ভক্তের লোলুপ রসাস্বাদী প্রাণ। গোপালের রূপ চাখিতে চাখিতে সে লাবণ্যে রস ভাণ্ডারে রাণী একটু কর্পূর মশলার অভাব অনুভব করিয়া ফেলিলেন। আনন্দ পুলকিত রাণী চিত্তের ভাব প্রকাশ করিয়া মনে মনে গোপালকে কহিলেন, "গোপাল! তোমার সৌন্দর্য্যে পড়িয়া নানাবিধ ভূষণ সকল কেমন ঝলক দিতেছে! শোভার কিবা আশ্চর্য্য সমাবেশ! কিন্তু চিত্তে দুঃখ থাকিয়া গেল! আমার প্রাণে যাহা চাহিতেছে, তাহা না হইলে আর তোমার সুধাসৌন্দর্য্যের পূর্ণতা ঘটে না। তোমার এই তিলফুলনিন্দী নাসায় একটী নলক মুক্তা দুলিতেছে না। তোমার এই গলিত বিদ্রুম মাখা অধরের উপর সীমান্তে মুক্তা-মণি দোলাইয়া যে সুষমা ছড়ায়, তা দেখিতে একান্ত সাধ জন্মিল। গোপাল! তোমার নাসাই মুক্তা পরিবার নাসা। অহো! এমন সুন্দর নাসায়ও মুক্তা নাই! মুক্তার মুক্তা হইয়াও ফল হইল না!"

এই মুক্তাটি আমি স্বচ্ছন্দে ও চারু নাসায় পরাইয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু কেমনে? নাসায় ছিদ্র নাই। "রাণী মনের দুঃখ বুকে বহিয়া যথা সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রিতে এসব ভাবিতে ভাবিতে রাণী নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। তখন গোপাল যাইয়া স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "শিশুকালে মা আমার নাক বিঁধাইয়া মুক্তা পরাইয়াছিলেন; অদ্যাপি সেই ছিদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু মুক্তা নাই। বড় সাধ একটি মুক্তা পাইলে পরি। তোমার নাকের এই বৃহৎ মুক্তাটি হইলে ভাল হয়, কিন্তু তোমার ব্যাথা হইবে বলিয়া ভয়বাসি।"

প্রাতঃকালে রাণী উঠিয়া স্বপ্নকথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাণী ভাবিলেন, গোপাল অন্তর্যামী, তিনি আমার মনোভাব জানিতে পারিয়া ভানপূর্ব্বক নিজ মুক্তা পরার সাধ আমাকে জানাইলেন। এই স্থির করিয়া রাণী নাসা হইতে মুক্তা খুলিয়া গোপালের সন্নিধানে যাত্রা করিলেন এবং সাক্ষাৎ পৌঁছিয়া রাণী কাঁদিয়া কহিলেন, "গোপাল! মুক্তা পরাইতে মাতা তোমার নাকে ছিদ্র করিয়াছিলেন, এ আহ্লাদের কথা বটে, কিন্তু এ বড় দুঃখ যে কষ্টের সেই ছিদ্র আছে, কিন্তু কৈ, মুক্তা নাই। এখন আমার হাতে তা পরিতে তোমার সাধ হইয়াছে, ভাল? তোমার মা নাকে ছিদ্র করিয়া তোমায় মুক্তা পরাইয়া ছিলেন, এও চাতুরী মাত্র; কারণ এমন চাঁদ মুখের কোমল নাসায় অস্ত্রাঘাত

তোমার মায়ের প্রাণে সয় নাই। তবে যদি একান্ত সাধের ভুলে করিয়া থাকেন, তবে সে পরান মুক্তাই বা কি হইল? এ সবে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে। এ তোমার এক নূতন লীলাবিশেষ, আমার বিশ্বাস। আর যদি বল ছিদ্র করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তা মিলাতে পারে নাই, তোমার মা যে এমন কাঙ্গালীনি যে একটি মুক্তাও তাহার জুটিয়া উঠে নাই, ইহাও আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"গোপাল! তুমি আমার কাছে মুক্তা পরিতে চাহিয়া বলিয়াছ, কি জানি মুক্তাদানে আমার প্রাণে ব্যাথা হয়, অথবা খুলিতে বেদনা পাই। গোপাল! বলিব কি, মুক্তা কোন্ সামগ্রী, তোমার এই অনিন্দ্য কোমল শ্রীঅঙ্গের প্রসাধনে সর্ব্বস্ব দিয়াও তৃপ্তি হয় না এবং তোমাকে পরাইবার সুখে অপর দুঃখ ব্যাথা সব বিলীন হয়, চিত্তে অন্যবিধ কোন ভাব তিষ্ঠে না। তোমার জন্য যে ত্যাগ তাহাই সর্ব্ব সুধামৃতের নির্ঝর। আমি ছার তুমি এই অধমের নিকট মুক্তা পরিতে চাহিয়াছ, এ সৌভাগ্য সুখ ভাবিয়া চিত্ত কেবল পুলকে নৃত্য করিতেছে। গোপাল! মুক্তা বলিয়া কি, দেহ বল, প্রাণ বল, আমার বলিতে যা সব নিয়া যাও। তাতেও এ সুখের সীমা পাইব কিনা জানিনা। তুমি আমার চিত্তের বাঞ্ছা জানিয়াই মুক্তা চাহিয়াছ তোমাকে এই জন্যই বাঞ্ছা কল্পতরু বলে। যাহা হউক, এখন এই মুক্তাটি তোমার সুন্দর নাসায় পরাইয়া দেই।" চতুর্দ্দিকে জয় জয়কার পড়িয়া গেল। অচিরে মহামহোৎসব! নলক পরিয়া গোপালের মুখ শোভা কত না বাড়িয়া গেল! রাণীর আনন্দ অপার।

মুক্তা পরাইয়া রাণী নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, ধন্যা হইলেন। গোপালের চাঁদ মুখের উজ্জ্বল মাধুরীময়ী শোভার ছটা দেখিয়া রাণী বাৎসল্য সুখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। গোপালের মা নাকে ছিদ্র করিয়া রাখিলেন; এতদিনে ক্ষেত্র-বাসী রাণী নিজ হাতে মুক্তা পরাইলেন। অদ্যাপি রাণীর মুক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রেমাধীন গোপাল রাণীর বাৎসল্য প্রেমের বশ হইয়া এ লীলার দ্বারা রাণীর বিমল সুখ জন্মাইলেন এবং মধুর বাৎসল্য প্রেমের কিরণ ছড়াইলেন। রাণী গোপালকে নলক পরাইতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। গোপালের সেবা ও সুখ বাঞ্ছাই বিশুদ্ধ প্রেম। ইদৃশী বাঞ্ছা দৃঢ় থাকিলে, জীব সবে একদিন সাফল্য লাভ করে, ইহা নিশ্চিত।

শ্রীকালীহর দাসবসু।

শিবরাম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রাচীন কবির গান ও কবিতা আলোচনা করা যেরূপ তৃপ্তি কর, উহা তদ্রূপ লাভ জনকও বটে। আমরা প্রাচীনত্বের একান্ত পক্ষপাতী। শিবরামকে আমরা ভাল বাসি। তিনি আমাদের জেলার লোক; শুধু জেলার লোক নহেন, তিনি আমাদের স্বগ্রাম বাসী কবি, সুতরাং আমাদের তাঁহার উপর ভালবাসা যে স্বাভাবিক, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইতঃ পূর্ব্বে শিবরামের কতকগুলি গান পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি; আজও আমরা সাদরে তাঁহার রচিত কয়েকটী গীত উপহার দিতেছি।

এ বিকট রুচি বিকাশের দিনে যাঁহারা পবিত্র রাধা কৃষ্ণ প্রেমে কলুষময় ভাব দেখিতে পান, তাঁহাদের এ প্রবন্ধ পড়িয়া কাজ নাই। প্রকৃত প্রেম কি পদার্থ, মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকার অকৃত্রিম প্রেমের বিষয় বুঝিবার শক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা অগ্রসর হউন্।

বিরহ বিধুরা রাধার সখিগণ শ্রীকৃষ্ণকে মিষ্ট ভৎ'সনা করিয়া শ্রীরাধিকার বিরহ কাতরতার বর্ণনা করিয়া কি বলিতেছেন, দেখুন।

"তুমি নও শুধুই বাঁকা। ওতা এবার জানা গেল সখা॥ সহজেতে কাল, স্বভাব কুটীল, কৃষ্ণ তোমার মন গরল মাখা॥১ কুলবতীর কুলে কালি দিবার তরে, কালি রাত্রি কালে কুঞ্জে এলে পরে, কৌতুক বাসরে ছিলে কার দ্বারে, কুঞ্জের প্রভাতকালে দিলে হে দেখা॥২ যে দুঃখেতে গেছে জাগিয়ে যামিনী আমরা জানি আর জানে রাই মানিনী, কেঁদে ব্যাকুলিনী রাজার নন্দিনী, কথায় কথায় কত যাবে হে রাধা॥৩ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কাল চন্দ্রোদয়, হ'য়েছিল এম্‌নি অনুমান হয়, শিবরাম কয় জানি পরিচয়, হাতের আড়ে চাঁদ যায় কি ঢাকা॥৪"

শ্রীরাধা যে কৃষ্ণ গত প্রাণা; তিনি তিলার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ সহ করিতে পারেন না। তাই, শ্যামের উপর মান করিয়া তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অসহ যন্ত্রণার আকুল হইয়া শ্রীরাধিকা অতি বিনীত ভাবে সখিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

"মান ক'রে কি মান থাকে সই প্রাণ থাকে না তার কি বল। ওগো মানের ছলে, পায়ে ঠেলে, শেষকালে এই কাঁদ্‌তে হল॥ ওগো সখি, একবার আন্‌গে ডেকে, পায়ে ধ'রে সাধ্‌তে হ'ল। আমি মাটি মেগে নি আপন মুখে, জন্মের মতন মান্ ফুরাল॥ মান তরঙ্গ তুফান হ'য়ে, কি ক্ষণে হৃদয়ে এল্। শিবরাম কয়, একি প্রলয়, কাল মাণিক ভেসে গেল॥"

ব্রজের গোপাল মথুরার রাজা হইয়াছেন; গোপালকে আর গো-চারণ করিতে হয় না, এবং তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রজ গোপী মথুরায় আসিয়া গোপীজন বল্লভকে পরিহাস করিয়া বলিতেছেন:—

"আসি নাই তোমায় নিতে। ও শ্যাম হবে না হে সেখানে যেতে॥ আনন্দে বিরাজ, কর মহারাজ, আমরা এলাম তোমার সাজ দেখিতে॥ হোক্ হোক্ তোমার ফিরেছে কপাল, এত দিনে মানি ঘুচেছে রাখাল, ফিরাতে ঘুরাতে হয় না ধেনুর পাল, হয় না নন্দের বাধা বহিতে॥১ পুরুষের না কি হয় দশ দশা, অদ্য তোমার বিধি পুরায়েছেন আশা, তৃতীয় শনিতে মথুরায় আসা, ব্রজ বাসী কেবল দুঃখ সহিতে॥২ রাই ধনী মোদের গোপের কুমারী, পল্লিগ্রামে বাস্ কুরূপিনী নারী, কত ভাগ্যে পেলে কুবুজা সুন্দরী, শিবু কহে তাকি পারি বলিতে॥৩"

আর একটী গানে সখিগণ বলিতেছেন "খেলিতে হোলি তোমার হরি সেজেছে গো রাই। একাকী ওই কুঞ্জের পথে রাখালগণ কেউ সঙ্গে নাই॥ কটীতটে পীতধড়া, মালতী মল্লিকে বেড়া, উঠধনি চাঁদ্ বদনী, কালা চাঁদের সঙ্গে যাই॥ বঁধু চকিত চঞ্চল, মকর কুণ্ডল, শ্রবণে উজ্জ্বল, ঘন দোলে গো;— গতি বেগে ঘর্ম্ম জল সকল অঙ্গে দেখ্‌তে পাই॥ বাঁশী থুয়েছে কটীতে, সুরঙ্গ পিচ্‌কারী হাতে, কি শোভা তাতে, রাই বুঝি গিয়াছে আগে, ত্বরিত গমনে তাই॥৩ কাঞ্চন গাগরী, কক্ষে কর প্যারি, কালিন্দীর বারি আনিবার ছলে গো;—আমরা তোমায় ঘেরি ঘেরি যাব গো সখি সবাই॥

রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক আর একটী গানে শিবরাম যুগল মুর্ত্তি স্মরণ করিয়া কহিতেছেন।

"আমার মন কদম্ব তরুমূলে দাঁড়াও মুরারি। ওহে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে বামে ল'য়ে রাই কিশোরী॥ শ্রীমধুসূদন, জুড়াও হে নয়ন, রাঙ্গা চরণ, পূজিব দিয়ে

তুলসী চন্দন, ওহে প্রেমাবেশে অনায়াসে, তর্‌তে চাই ভববারি॥

ঠিক্ এই ভাবের আর একটী গীত এই "তুমি বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও হরি হৃদয়ে আমার। মন কদম্ব তরুমূলে রাই বামে হেরি একবার॥ ওহে দয়াময়, মোরে হইয়ে সদয়, আশা পূর্ণ কর যশোদা তনয়, তবে, হবে হৃদে হবে প্রেমের উদয় চক্ষে বহিবে জলধার॥"

রাধা রমণের প্রতি শ্রীরাধিকার সম্বন্ধে শিবরাম যে সুন্দর গান লিখিয়াছিলেন, তাহা এই—

"মদন মোহনে কেন মান। (ওগো ধনি,) চরণে ঠেলিলে তারে এতই কি তোর মন পাষাণ॥ ব্রহ্মা পঞ্চানন, তারে করে গো সাধন, পদ্ম হাতে করে পদ্মা যে চরণ সেবন, ওগো জগজনে জানে দ্রবময়ীর জন্ম স্থান॥ ও রাই কি মান করেছ, এ মান কোথায় শিখেছ, মানে মজি চিন্তামনি চিন্তে নেরেছ, ও যে জগন্মান্য জগৎ ধন্য, শিব রাম তার করে ধ্যান"

শিবরাম রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত আর উদ্ধৃত করিয়া কাজ নাই। তাঁহার রচিত একটী তত্ত্ব সঙ্গীত উপহার দিয়া অদ্য আমরা আমাদের এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

কাণা ঠুঁটো চাষা ক্ষেতে কি কাজ কর্‌বি বল্। আবাদ কর্‌তে পারলি নাকো, আশাতে কি ফলাফল। বীজ রোপণ যে হ'য়েছিল, রস বিনে সব শুকাইল, আসল বর্ষা সময় গেল, মেঘে না বর্ষিল জল। ডাক্ পুরুষের কথা আছে, ছেঁচা জল সে সকল মিছে, মেল্লা পেলে সকল বাঁচে, শালি জমি যে সকল॥ সুরসে যে রসা জমি, ফসলের নাই বেশী কমী, সুখে হয় তার সাল্ তামামী মালিকে জমিন কুতুহল। তোর হ'ল এ জমি ডাঙ্গা, খোঁড়া গরু লাঙ্গল ভাঙ্গা, শুধু কি দেখালে ঠেঙ্গা জমিতে ফলে ফসল॥"

সম্পূর্ণ। দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

মাঘ আমবস্যা নিশি নীরব অবনী,
প্রগাঢ় তিমিরে আজি মগন ধরণী;

আবৃত করিয়া তনু আঁধার বসনে।
লক্ষিছে প্রকৃতি যেন বিকট নয়নে ॥
নিস্তব্ধতায় মৃতপ্রায় সব ধরাতল,
বিভীষিকা মূর্ত্তি সম বিরাজে কেবল;
আরোহিছে যেন বিশ্ব তিমির বিমান।
ভাসে ঘোর অন্ধকারে ভীষণ শ্মশান ॥
তমোরাশি বিস্তারিত এ হেন নিশীথে,
চিন্তিতেছি বিধাতারে বিস্ময় চিত্তেতে;
ভাবিতেছি ঈশ্বরের মহিমা অপার।
এরূপ ভীষণ নিশি সৃজন যাঁহার ॥
এই যে বিটপিমালা প্রফুল্ল অন্তরে,
ত্যজিয়া নীহার বিন্দু দাঁড়ায়ে তিমিরে;
বিভু কৃতজ্ঞতা যেন বিজ্ঞাসিয়া তায়।
বর্ষিতেছে অশ্রুবারি এ সুপ্ত ধরায় ॥
অন্ধকারে সৌধমালা অম্লান বদনে,
প্রকাশিছে বিধাতার মহিমা গোপনে;
যাঁহার আদেশে তারা এ মর ভুবনে।
রক্ষিছে আশ্রিত জনে নিঃস্বার্থ পরাণে ॥
হে ঈশ্বর কৃপাময়! করুণা আধার,
বুঝিতে মহিমা তব কি সাধ্য আমার;
পুতুল নাচায় যথা বিজ্ঞ বাজিকরে।
তেমতি নাচাও প্রভু আপ্তগ্রাহি নরে ॥
অদ্রি সম ধনরাশি অর্পিয়া কাহারে,
মাতাইছ তারে তুমি ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারে;
ভিক্ষুক করিছ কারে কঙ্কাল শরীর।
মেলেনা আহার তার ক্ষুধায় অধীর ॥
পণ্ডিত করিছ কারে জ্ঞানের সাগরে,
ভাসাও কাহারে তুমি অজ্ঞান পাথারে;

রাজারে করিছ ভিক্ষু অঞ্জন বরণ।
অবশেষে পর্ণগৃহ তাহার ভবন॥
অসম্ভব সম্ভবয়ে তোমার ইচ্ছাতে,
বিশাল সমুদ্র শোষে তোমার ইঙ্গিতে;
গোষ্পদে সমুদ্র পুনঃ করিছ গঠন।
পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি অক্লেশে যেমন॥
কত আসে কত যায় সংখ্যা নাহি তায়,
অসংখ্য মানব হায় বুদ্বুদের প্রায়;
চলিছে গন্তব্য স্থানে ক্ষণে উদ্দীপিয়া।
ঊর্ম্মি পরে ঊর্ম্মি যথা চলিছে ধাইয়া॥
কাহার সময়ে মৃত্যু অসময়ে কার,
যেরূপেতে গুরুদেব দিলা শোকভার;
কেন তিনি অকালেতে গেলেন স্বর্গেতে।
এ গূঢ় রহস্য মোরা না পারি বুঝিতে॥
এ উরু উর্ব্বীতে প্রভু সকলি অসার,
তোমা বিনা দয়াময় গতি নাহি কার;
প্রেমময় মূর্ত্তি তব করিলে স্মরণ।
পুলকে পূরিত তনু সজল নয়ন॥
রবি শশি তারা আর অমর নিচয়,
জঙ্গম স্থাবর আদি গ্রহ সমুদয়;
বিজ্ঞাপিছে প্রতিক্ষণ তোমার মহিমা।
সুশ্রাব্য অমৃতমাখা পূর্ণ মধুরিমা॥
রাজীব লোচন হরি ত্রিলোক তারণ,
পতিত পাবন তুমি ব্রহ্ম সনাতন;
পঞ্চমুখে ভূতনাথ না পারে বর্ণিতে।
কেমনে বর্ণিব গুণ এ ক্ষুদ্র শক্তিতে॥
এরূপেতে কিছুক্ষণ চিন্তিতেছি তায়,
ক্রমে অভিভূত হ'য়ে পড়িনু তন্দ্রায়;

অর্দ্ধ নিমীলিজাগ্রত স্বপনে।
গুরুর পার্থিব মূর্ত্তি হেরিনু নয়নে ॥
চির প্রসন্নতা কান্তি অতি মনোহর,
তেজ পুঞ্জ বপু দেখি কিবা শোভাকর ;
উজ্জ্বলতা জ্যোতির্ম্ময় সে মুখ সুষমা।
প্রেমময় মূর্ত্তি যেন শারদ চন্দ্রমা।
প্রশান্ত অমিয়ভাবে কহিলেন মোরে।
গম্ভীর গম্ভীর স্বর অতি স্নেহ ভরে ;
"তোমরা পড়েছ বাছা বিষম ভ্রমেতে।
সংশোধিতে সেই ভ্রম আসিনু মর্ত্তেতে ॥
আসিয়াছি অসময়ে সংসার ছাড়িয়া,
কাতর তোমরা সবে হতেছ ভাবিয়া ;
এসেছি সময়ে বাছা অসময়ে নয়।
বলিব কারণ তার আমি গো নিশ্চয় ॥
দুর্জ্জয় কলির সন্ধ্যা ভীষণ আকার,
পুণ্যের নাহিক লেশ মোহে অন্ধকার ;
কলির রাজত্ব ধরা হয়েছে এখন।
চারিদিকে পাপরাশি দেখিতে ভীষণ ॥
পৃথিরে ঢেকেছে আজি যেমন আঁধারে,
তেমনি এ পাপরাশি ঢেকেছে ধরারে ;
বিশ্বকে আবরি পাপ করিছে গর্জ্জন।
ঝঞ্জানিল সিন্ধু জল গর্জ্জয়ে যেমন ॥
বিশেষতঃ সংসারেতে অশান্তি নিচয়,
প্রবেশিল মূর্ত্তি যেন সাক্ষাৎ নিরয় ;
ভাঙ্গে মানবের হৃদি কলহ আকারে।
ভীম ভূমিকম্পে যথা ভাঙ্গে গিরিবরে ॥
ক্রোধ রিপু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ধরাতলে,
জ্বলিছে মানব প্রাণ বহ্নি সম বলে;

ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য কভু না করে বিচার।
দ্বন্দ বিসংবাদে কাল কাটে অনিবার॥
পতঙ্গ অনল দেখি ধাবয়ে যেমতে,
তেমনি ধাইছে লোক অর্থের লোভেতে ;
স্বজন কর্ত্তারে কভু ডাকে না পামর।
হা অর্থ যো অর্থ করি ক্ষিপ্ত যতনর॥
সুকার্য্যেতে অর্থ ব্যয় করে কয় জন?
দুষ্কর্ম্মেতে অর্থনাশ কলির লক্ষণ ;
দুর্গা পূজা আদি করি যতেক পার্ব্বণ।
যশের নিমিত্ত, নহে ধর্ম্মের কারণ॥
অনিত্য জীবন জেন ধর্ম্ম কর সার,
এ নশ্বর পৃথিবীতে কেহ নহে কার ;
কর্ম্ম অনুসারে লোক জনম লভিয়া।
নির্দ্ধারিত কার্য্য করি যায় সে চলিয়া॥
যাপি নিশি উর্ব্বীরুহে পক্ষি একত্রেতে,,
ভিন্ন হ'য়ে যায় তারা উড়িয়া প্রভাতে ;
তেমনি জানিও বিশ্বে মানব ক্রীড়ন।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ মোরে কর বিলোকন॥
ভীষণ মূর্ত্তিতে পাপ গ্রাসিছে সংসার,
দেখি মম মনে খেদ হইল অপার ;
সূক্ষ্মরূপে পরিণাম বিবেচিয়া আমি।
শুভ ভাবি আসিয়াছি ত্যজি মর্ত্তভূমি॥
অতিশয় স্নেহ বাঞ্ছা করিতাম তোরে,
আসিনু মর্ত্তেতে তেঁই তব ক্লেশ তরে;
অস্থায়ী পার্থিব মূর্ত্তি ত্যজিয়া এখন।
মম সূক্ষ্মাকৃতি তুমি করহ চিন্তন" ॥
এত বলি গুরুদেব হলেন অন্তর্দ্ধান,
সম্মুখেতে আর নাহি হেরি সে বয়ান ;

চমকি তখন উঠি হইয়া বিস্মিত।
স্বর্গ হতে মর্ত্তে যথা হইলে পতিত ॥
জলন্ত প্রদিপ শিখা সম্মুখ হইতে,
সহসা লইল কেহ উঠায়ে চকিতে ;
অন্ধকার পরিপূর্ণ ভয়াল যেমন।
স্বপ্নান্তে হেরিনু বিশ্ব আঁধার তেমন ॥
আর নানা নীতিপূর্ণ সার উপদেশ,
প্রদানিলা গুরুদেব করিয়া বিশেষ ;
সে সব উল্লেখ যোগ্য নহে জানি মনে।
লিখিতে নারিনু আমি এস্থলে এক্ষনে।
হায় গুরো! তব স্নেহ গাইতে নারিব,
স্বপ্নে যত শিক্ষা দিলে কেমনে বর্ণিব ;
এই বড় খেদ কিন্তু রহিল মনেতে।
আপনি বলিলে সব না দিলে বলিতে ॥
গুরো তব উপদেশ জ্ঞান উদ্ভাবন,
না করিব ত্রুটি সদা করিতে পালন ;
আশিস্ সকলে মোরা, বৈজয়ন্ত ধামে।
শ্রীচরণে স্থান যেন পাইহে অন্তিমে ॥

সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী।

সঙ্গীত।

(১)

ওহে বিপদ হারি! বড় বিপদে পড়ে ডাকি তোমারে।
আমার আর কেহ নাই, ডাকি হরি তাই, পার কর এই বিপদ সাগরে ॥
ওহে করুণা নিদান জীব দুখ হারী, তবে কেন দুখ পায় অষ্ট প্রহরি,
কর হে করুণা দাও হে চরণ তরি, (পার কর বিপদ সাগরে দিয়ে অভয় পদতরনী)

অশান্তি আকাঙ্ক্ষা কুম্ভিরে ঘিরিছে হে ;—
উঠিছে তুফান, দুর্জ্জয় অভিমান, যায় বুঝিহে প্রাণ ডাকি বারে বারে ॥
লোভ মেঘ আসি উদয় হয়েছে, মোহ বাতাস তাহে সদত বহিছে,
ক্রোধ বাজের ডাকে হৃদয় কাঁপিছে (গেল প্রাণ আর রহেনা হরি
কাম শিলাঘাতে দেহ জর জর) এ ঘোর বিপদে রাখ হে দয়াময় ;
তোমাবিনে হরি, কে আছে কাণ্ডারী, কে আর তরাবে অকুল পাথারে ॥
ওহে দীন নাথ শ্রীমধুসূদন, অভয় পদে আজি নিলাম হে স্মরণ,
যেন মনে থাকে হ'য়োনা বিস্মরণ, (তরাতে কৃপণ হ'য়োনা হরি
পতিত পাতকী জনে) পতিত পাবন পতিতে রাখ হে ;—
ডাকে দীন বৃন্দাবন, হে রাধা রমণ, থাকো সদা দীনের হৃদয় মাঝারে ॥

বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য।

শেষ চিন্তা।

ভ্রান্ত মানব! একবার স্থির ধীর ভাবে জীবনের শেষ চিন্তা করিয়া দেখ সংসারে সকলি অনিত্য সকলি অসার কিছুই কিছু নয়। যে দিন কণ্ঠনালী রোধ হইয়া আসিবে দারুণ খল কফে আসিয়া তোমায় আক্রমণ করিবে ভাব দেখি সেকি ভয়-ঙ্কর দিন। যে দীন মুলাধার ছাড়িয়া যাইবে চিকিৎসক আসিয়া হাতের নাড়ী হাতে না পাইয়া তোমায় শেষ জবাব দিবে, জীবনের আশা ভরসা কিছুই থাকিবে না হা হুতাশে প্রাণ কেবলই ছট্ ফট্ করিতে থাকিবে। তোমার বহু কষ্টে উপার্জ্জিত ধন পাইবার আশায় জ্ঞাতি বন্ধু গণ আসিয়া আদেশ অপেক্ষা করিবে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রগণ তোমার সমস্ত ধন সম্পত্তি বিভাগ করিবার জন্য ব্যাস্ত হইবে, কিন্তু ভাই! তুমি সঙ্গে কিধন লইয়া যাইবে একবার ভুলিয়াও এ কথা মুখে আনিবে না কেহই সে চিন্তা করিবে না। ভাই! এই পাঞ্চ ভৌতিক দেহ এতো মায়ার বাসা এই যে দারা পুত্রের প্রতি ভালবাসা, এই যে ভোগ পিপাসা এই যে সুখ লালসা এরা কি সহসা তোমায় ছাড়িতে চাহিবে? কখনই

নয়। এরা কেবল আরও তোমায় যন্ত্রনা দিবে। এমন যে প্রাণ প্রিয়জন আত্মীয় স্বজন সাথের সাথী কেহই হইবে না। তুমি কোথায় যাইবে, কোথায় কি অবস্থায় থাকিবে এ ভাবনা ভূলেও কেও ভাবিবে না॥

ভাই! যখন তোমার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া আসিবে, চিরদিন যাহাদের আপন ভাবিয়াছ, চিরদিন যাহাদের ভালবাসিয়াছ সেই দুর্জ্জয় কামাদি রিপুগণ কোথায় পলায়ন করিবে।

আজন্ম যাহাদের বশে চলিয়াছ সেই রিপুগণ তোমাকে কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইবে, ভীষণ যন্ত্রণার সময় কোন সাহায্য করিবে না। প্রাণ প্রিয় বন্ধুগণ সময় বুঝিয়া তোমার সাধের গৃহে আর রাখিবে না বাহিরে আনিয়া তাড়াতাড়ি অন্তর্জ্জলী করিবার যোগাড় করিবে, আবার কোন বন্ধু তুলসী পত্র আনিয়া তোমার মুদিত চক্ষে অর্পণ করিবে আবার কেহ কাণের কাছে যেয়ে তারক ব্রহ্ম নাম শুনাইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু বল দেখি ভাই: সে নাম কে শ্রবণ করিবে? সে সময় তোমার শ্রবণ শক্তি যে আর থাকিবে না, মাথা কুটিয়া চিৎকার করিলেও কোন শব্দ শুনিতে পাইবে না, সমুদয় ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া যাইবে কোন কথা বলিতে পারিবেনা তোমার মনের কথা মনেই থাকিবে। সকলেই কথা কহিবে কিন্তু তুমি নীরব থাকিবে, শরীরে কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকিবে না জড়ের ন্যায় অচেতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিবে। তোমার এমনি নিঠুর বন্ধুগণ যে সে সময় ভাল বিছানা কি ভাল শয্যা এমন কি "চাটাই পাটি কিছুই পাতিয়া দিবে না খালি মাটীতে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। তখন কেহ তোমায় স্পর্শ করিবে না কেবল মাত্র এক খানি বস্ত্রের দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া রাখিবে। বল দেখি ভাই! তখন তোমার বন্ধু বান্ধবের দল কোথায় রহিবে সুখের সময় তাহারা কত না মিশামিশি করিয়াছিল তোমাকে বিপদে মগ্ন দেখে আর তো তাহারা সাড়া দিবে না সে দিন তোমায় "কাম্ হিয়ার" বলে কে ডাকিবে? বল দেখি ভাই! সে দিন আনন্দে ভরপুর হইয়া বগল বাজাইয়া রঙ্গ ভরে রঙ্গ স্বরে নিধুর টপ্পা কে গাহিবে? বিজাতি পোষাকআর কে পরিধান করিবে? চোকে চশমা প'রে চেন ঘড়ি ঝুলাইয়া চুরট টেনে ছড়ি ধরে কে রাস্তায় বেড়াইবে? জুড়ি গাড়ী হাঁকাইয়া বাগান বাড়ী কে বেড়াইতে যাইবে? দাড়ী ঝুলাইয়া উইলসেনের খানা কে খাইবে? ভাই রে! সে দিন সকলি যে ফুরাইয়া যাইবে কিছুই থাকিবেনা সময় বুঝিয়া

জ্ঞাতি বেহারা আসিয়া তোমার সাধের দেহ ছেঁড়া চটে বন্ধন করিবে এক ভগ্ন খাটে তুলিয়া শ্মশান ঘাটে লইয়া যাইবে। যাহাদের চির দিন আপন বলে ভাবিয়াছ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়াছ সেই স্ত্রী পুত্র কন্যা এরা কিনা তোমার মুখে নুড়ো আগুন জ্বালিয়া দিবে। এই রূপে অগ্নি জ্বালাইয়া তোমার সাধের দেহ খানি ভস্মীভূত করিবে দেহ ভস্মে পরিণত করিয়া বন্ধু বান্ধবগণ সকলেই আপন আপন গৃহে আসিবে কিন্তু ভাই তুমি যে কোথায় যাইবে কোথায় কি ভাবে থাকিবে, সে ভাবনা কেহই ভাবিবে না। কি প্রকারে তোমার শ্রাদ্ধ শান্তি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইবে এই ভাবনা তখন সকলেরই প্রবল; পরিশেষে বন্ধু বান্ধবগণ কোন রকমে তোমার শ্রাদ্ধ শান্তির উদ্যোগ করিবে।

পুরোহিত মহাশয় যথা সময় আগমন করিয়া পাওনার বিষয়টা ভাবিতে থাকিবে, জ্ঞাতি বন্ধুগণ মহা মহোৎসবে আহারাদির আয়োজনে ব্যস্ত থাকিবে পুত্র কন্যা প্রভৃতি এরা শান্তি জল পাইয়া শুদ্ধ হইবে, সকলেই মহানন্দে সুখের ফলাহার ভোজন করিবে। কিন্তু ভাই! তুমি কোথায় কি খাইবে, সে ভাবনা কেহই ভাবিবে না, কেবল তাহারা মিঠাই মোণ্ডা অনবরত চাহিতে থাকিবে। অপরাহ্নে পিণ্ড প্রদানের সময় তখন আত্মীয় স্বজন সকলেই মহারোলে "মরণ কান্না" আরম্ভ করিবে, কিছু ক্ষণ পর সব চুপ চাপ শেষে দিনে দিনে সকলেই তোমার কথা বিস্মরণ হইবে। ভ্রান্ত মানব! এই তো সংসারের গতি তথাপি কেন ভাই ভ্রান্তের ন্যায় ভব ঘোরে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছ। মাখাল ফলে লোভ করিয়া কি লাভ হইবে ভাই! এ মাখাল ফল যখন ভাঙিবে তখন যে তোমার লোভের আশা ভগ্ন হইয়া যাইবে। ভাই? কে তোমার, তুমিই বা কে? কারে আপন আপন বলিতেছ; আমার আমার বলিয়া কাহার সেবা করিতেছ? সংসারের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থি চর্ম্ম সার হইলো কিন্তু আপন চিন্তা একবার করিলে না অসার চিন্তাতে মত্ত থেকে শেষের চিন্তা করিলে না ভাই! আমি আমি বলিয়া সর্ব্বদাই অহঙ্কার করিতেছ একবার আপনার সত্য পরিচয় দাও দেখি, এই যে সুন্দর কলেবর পাইয়াছ এযে কেবলই কলের ঘর একটী কল বিকল হইলে কোন বল থাকিবে না ভাই! দেহের আশাতো অনিত্য এ দেহ তো কেবল ভূতের বাসা মাত্র, যে আশায় আশা করিয়া সংসারে আসিয়াছ সেই সকল আশায় বাসা "রাঙা পাদু খানি" চিন্তা কর ভাই সকলই অনিত্য ধন জন বিষয় বিত্ত সকলই মিথ্যা, নিত্য

রূপে সেই সত্য সনাতনে ভাব ভক্তি যোগে অনুরাগে গোবিন্দ-চরনার-বিন্দ চিন্তা কর। সেই এক জন ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেহ নাই তিনিই সংসারের সার আত্মা রূপে সবাকার হৃদয়ে বিরাজমান ভাই! ভবে আসিয়া কি করিলে কেবল ভূতের বেগার খাটিয়া মলে, আপন কার্য্য কিছুই করলে না যদি জীবনে সুখ শান্তি চাও যদি অন্তিমের যাতনা হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাও তবে যাতনা হারী শ্রীহরি নামে মতি রাখ চিন্তামণির চরণ দুখানি অহরহ চিন্তা কর॥

দীনাতি দীন

বৃন্দাবনভট্টাচার্য্য।

শ্রীরামদাস সাধু।

হৃদয় শুদ্ধ হইয়া ভক্তি সঞ্চার হইলে, চিত্তে এক প্রকার স্নিগ্ধ কোমল অতি শীতল অমৃত-ময় মেঘের ছায়া পড়ে। তখন প্রাকৃত মেঘ পানে চাহিতে প্রাণ উল্লাসিত হয় এবং মধুর তরঙ্গে ভরিয়া উঠে। চিত্তের উদিত এই মেঘ সুকৃতিফলে ঘন হইয়া শ্রীবিগ্রহ হন। প্রাণের বিগ্রহ স্ফূর্ত্তি উজ্জ্বল হইলে মাটি পাষাণের শ্রীমূর্ত্তি আর মাটি পাষাণ থাকেনা তখন উহা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। এই মুলতত্ত্ব যিনি ধরিতে পরিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের সকল সন্দেহ-তিমির ঘুচিয়াছে, তিনি শুদ্ধ সত্ত্বময় ভক্তিরসে মজিয়াছেন। স্বরূপ ও বিগ্রহের অভিন্নত্ব আমরা অতি-ভাগ্যবান্ রামদাসের জীবনে সুন্দর প্রতিপন্ন দেখিতে পাইব এবং ভক্ত যে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি তৎ প্রমান ও আমরা ইহাতে লাভ করিব। ভক্তের অঙ্গে রক্তপাত হইতে পাষাণের বিগ্রহে ও যে তথানুরূপ রক্তপাত হইয়াছে তদ্দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি সাধু মহতের জীবনীতে পাঠ করিয়া থাকি। ভক্তি বিজ্ঞানের এই সূক্ষ্মতত্ত্বে যাহারা এখনও আস্থা স্থাপন করেন নাই, তাহাদের জীবনটা যে একেবারে মাটি হইতে চলিল তাহা বলা যে বাহুল্য। পাষাণের গোপালও ভক্তচিত্তে এমন কোমল সুখময় স্ফূর্ত্তি পায় যে স্বরূপ ও বিগ্রহে কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি থাকেনা ইহা ভক্তগণই অনুভব করেন। সাক্ষীগোপাল শ্রীবৃন্দাবন হইতে পূর্ব্বদেশে

চলিয়া আসিলেন; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সঙ্গে কত না মধুর আলাপ করিলেন এবং দরবারে সাক্ষ্য দিলেন। শ্রীবিগ্রহ সেবাইতগণ সহ কথাবার্ত্তা করেন তা এখনও ঘটিতেছে। বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

দ্বারকার নিকটে শ্রীরামদাস নামে এক মহানুভব সাধু বাস করিতেন। তিনি একাদশী ব্রতপরায়ণ পরমনৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীমান রণছোড়জীর অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন। শ্রী একাদশীর হরিবাসরে তিনি রণছোড়জীর মন্দিরে জাগরণ পূর্ব্বক ঠাকুরের গুণানুকীর্ত্তন করিতেন। আশীতি বর্ষে জরাজীর্ণ রামদাস উক্ত শ্রীমন্দিরে যাইয়া ভজন পূজন বন্দনাদি করিতে অশক্ত হইলেন। রামদাসের মনোদুঃখ বুঝিয়া ঠাকুর রণছোড়জীর দয়া হইল; তিনি নিজভক্ত রামদাসকে একদিন কহিলেন, "রামদাস, তুমি গৃহে বসিয়াই আমার সেবা কর। আমি তোমার সঙ্গে তোমার গৃহে যাইব।" রামদাস কহিলেন, ঠাকুর তুমি রাজরাজেশ্বর, আমর গৃহে তুমি কেমনে যাইবে? গরিবের ঘরে তোমার সেবা চলিবে না, তোমার অশেষ ক্লেশ হইবে। বিশেষতঃ তোমার সেববগণও তোমাকে অন্যত্র যাইতে দিবে না। "ঠাকুর কহিলেন, আমি লুকাইয়া যাইব। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে কে রাখিবে? মন্দিরের পাছের গবাক্ষ দ্বার দিয়া নিশাযোগে আমি বাহিরে যাইব, তুমি যথাকালে তথায় গাড়ী প্রস্তুত রাখিবে গাড়ীতে চড়াইয়া তুমি আমাকে তোমার গৃহে নিয়া যাইবে। ইহাতে সন্দেহ করিও না।— শুনিয়া রামদাসের চিত্ত আনন্দোৎফুল্ল হইল।

নিশাযোগে ঠাকুর ওইযে মন্দির হইতে পলাইতেছেন। কি অদ্ভুত লীলা! ঠাকুরকে খিড়কী দ্বার দিয়া গাড়ীতে চড়ান হইল। রামদাস সজোরে গাড়ী হাঁকাইয়া কিয়দ্দূরে যাইতে না যাইতে পূজারি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখেন ঠাকুর নাই। "ঠাকুর নাই"—সোর পড়িয়া গেল। কোন কোন লোক সংবাদ পৌঁছাইল রামদাস বৈরাগী গাড়ীতে চড়াইয়া ঠাকুর লইয়া যাইতেছেন। পূজারিগণ "মার মার ধর ধর" শব্দে গাড়ীর পশ্চাৎ ছুটিল। রামদাস পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন, "চিন্তা নাই, আমাকে এই পুষ্করণীর জলে ডুবাইয়া রাখ।" ঠাকুরের নিদেশানুযায়ী জলে ডুবাইতে পূজারিগণ তাহাকে দেখিয়া ফেলিল এবং ক্রোধভরে সাধুর অঙ্গে শূলাঘাত করিল। রামদাসের অঙ্গে হইতে রক্তধারা বহিল। অতঃপর পূজারিগণ জলে নামিয়া ঠাকুরকে তুলিলেন,

এবং তুলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের হৃদকম্প উপস্থিত হইল। পূজারিগণ যাহা দেখিল তাহা পাঠকগণ বিশ্বাস করিবেন কি? ঠাকুরকে জল হইতে সবে তুলিয়া দেখিলেন ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ দিয়া রক্ত ধারা বহিতেছে। সবে স্তম্ভিত ভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, ভক্তাঙ্গে আঘাত করিবার এই পরিণাম দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের দেহের কোনও প্রভেদ নাই তখন সকলেই ভাল বুঝিলেন। নিজ অপরাধে ক্ষুব্ধ হইয়া সবে সিদ্ধান্ত করিলেন সাধু যথা ইচ্ছা ঠাকুর নিয়া যাউন, ইহাতে আপত্তি করা হইবে না, কারণ এহেন কর্ম্মে বৈষ্ণবের সাহস অসম্ভব; উহা ঠাকুরেরই অভিপ্রেত ও ইঙ্গিত। যাই উনি যেখানে ঠাকুর নিয়া যান, আমরা তথায় যাইয়া উঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া লই।

এই যুক্তি করিয়া তাহারা সাধুকে ঘেরিয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনাকে চিনিতাম না। আপনার চরণে আমারা ঘোর অপরাধী। আপনার চরণে পড়িয়া মিনতি করি, আপনি নিজগুণে আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া যথেপ্সিত স্থানে ঠাকুরকে নিয়া যান তাতেই আমরা আহ্লাদিত। — "ঠাকুর! তুমি আমাদের প্রতি এখন বাম হইয়াছ; তাই আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়াছ। এইটি তোমার স্বভাব জানি,—অক্রূরকে পাইয়া তুমি অতিশ্রেষ্ঠ ব্রজবাসীগণকে ছাড়িয়া গেলে। আজিও আমাদের ছাড়িয়া চলিলে। তোমার প্রাণ বড় কঠিন। ঠাকুর, আমরা সেবানভিজ্ঞ, সেবা করিতে জানি না, তা বলিয়া আমাদের প্রতি অকরুণ হইও না; ফিরিয়া আস আমরা তোমাকে মন্দিরে নিয়া যাই। আমাদের যত্নের ত্রুটি ভুলিয়া যাও। তুমি আমাদের প্রাণ, তোমাকে হারাইয়া আমাদের কি গতি হইবে তা বল।"

তখন কাঙ্গালের প্রাণ দয়াময় ঠাকুর এক ছল পাতিলেন, কহিলেন, "আমার ওজনে সোণা দিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও, আমি রামদাসে বিক্রীত হইয়াছি।" শুনিয়া সেবাইতগণ সবে ধাইয়া স্ব স্ব গৃহে গেলেন এবং প্রচুর স্বর্ণ লইয়া ফিরিলেন এবং ঠাকুরকে পাল্লায় চড়াইয়া সোণা দিয়া ওজন করিতে সোণায় কুলাইল না দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন ঠাকুরের যাইবার ইচ্ছা নাই। যাহা হউক্ তাহাদিগকে নিরাশ দেখিয়া ঠাকুর সদয় হইয়া বলিলেন, যাও তোমরা সবে বিজয় নামে শ্রী বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠিত কর গিয়া

তাহাতেই সতত আমার আবির্ভাব জানিবে। পূজারিগণ আশ্বাসচিত্তে যাইয়া পুনঃ শ্রী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ধন্য রামদাস ঠাকুর! তিনি নিজগৃহে ঠাকুর সেবা পত্তন করিলেন। শ্রী বিগ্রহ চুরি করিয়াও রামদাস নির্ম্মল নিরপরাধ। কারণ উহা কৃষ্ণেরই ইচ্ছা এবং আদেশ। কৃষ্ণের ইচ্ছা পালনে অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবা লাগিয়া যা করা যায় তাই ধর্ম্ম—অমৃত—সিদ্ধি! ঠাকুর রামদাসের ভক্তির বশ হইয়া রাজভোগাদি ত্যাগ করিয়াও গরিবের ঘরের ক্ষুদকণা অঙ্গীকার করিলেন। কৃষ্ণের লীলানিগূঢ়তত্ব বুঝা ভার।

শ্রীকালীহর বসু।

শ্রীলরায় রামানন্দ।

—:০:—

বন্দে চৈতন্য দেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ং॥

মাহিষ্য কুলচন্দ্র শ্রীমন্মহাত্মা রামানন্দ রায় নীলাচলে উদয় হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভবানন্দ পট্টনায়ক। ভবানন্দ রাজ সংসারে কর্ম্ম করিতেন। উৎকলের সার্ব্বভৌম মাহিষ্য ভূপাল মহারাজ প্রতাপ রুদ্র ভবানন্দকে রায় উপাধিতে ভূষিত করেন। ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি, ও বাণীনাথ। জ্যেষ্ঠ রামানন্দ আত্মসংযমী, নিষ্ঠান ছিলেন, সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা অতিথি-সংকার করিতেন। ভক্ত চরিত্র সংগ্রন্থ পাঠই তাঁহার বাল্য জীবনের নিত্য সহচর ছিল। দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার কালীন, যে সকল ভক্তবৃন্দ দেহ, মন, প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন, রায় রামানন্দ তন্মধ্যে একজন। রামানন্দ শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের একজন পার্ষদ, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। মহারাজ প্রতাপ রুদ্র রামানন্দকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং সর্ব্বগুণান্বিত দেখিয়া গোদাবরী উপকণ্ঠস্থ রাজ মহীন্দ্রীর রাজা করিয়াছিলেন।

রাজ ঘোষণা।

ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণ আমার সহজেই প্রীত॥

রাজ মহীন্দ্রীর রাজা কৈনু রাম-রায়।
যে খাইল যেবা দিল নাহি লেখা দায়॥

শ্রীমুখের কথা—

শান্ত দান্ত প্রিয় ভক্ত রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, আর বাণীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয় পাত্র।
রমানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥

গৌড়মণ্ডলে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব সমকালে, গোদাবরী তীরস্থ বিদ্যানগর অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। ঐ বিদ্যানগর রামানন্দের রাজধানী ছিল। দাক্ষিনাত্যের ভক্ত বৃন্দের মধ্যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সার্ব্ব-ভৌম ঘোর বৈদান্তিক, জ্ঞান পথের পথিক ছিলেন। আর রামানন্দশুদ্ধ ভক্তিপথের পথিক। এই জন্য উভয়ের মধ্যে একটু বিদ্বেষ ভাব ছিল। চৈতন্যদেব নিলাচলে শুভাগমন করিলে, সর্ব্ব প্রথমে সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রভু নিজগুণে তাঁহাকে হরিভক্তি দিয়া কৃতার্থ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন. রামানন্দ! তুমিই যথার্থ ভক্ত, হরিনামের মহিমা তুমিই জানিয়াছ, আমি বৃথা জ্ঞানাভিমানে মত্ত হইয়া বৈষ্ণব বলিয়া তোমায় কতই না উপহাস করিয়াছি। প্রভো! রামানন্দ আপনকার একজন পরম ভক্ত, গোদাবরী তীরে বাস করেন, আমার বিনীত প্রার্থনা তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবেন।

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদনে॥
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহ বিদ্যা নগরে॥
শূদ্র বিষয়ী, জ্ঞানে তাঁয় উপেক্ষা না করিবা।

আমার বচনে তাঁয় অবশ্য মিলিবা ॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহ একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥
পাণ্ডিত্য ভক্তি রস দুয়ের তেঁহ সীমা।
সম্ভাষিলে যানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া ॥
তোমার প্রসাদে এবে যানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥
তাহাই হউক বলি শ্রীশচী নন্দন।
রামানন্দ ভেটীবারে উঠিল তখন ॥
গোদাবরী তীর ঘাটে দিল দরশন।
যথা রামানন্দ করে স্নানাদি তর্পণ ॥
ঘাটে বসি মহাপ্রভু ভাবে মনে মনে।
কেমনে হইবে দেখা রামানন্দ সনে ॥
হেন কালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজন বাজায় ॥
তাঁর সঙ্গে আইলা সহস্র বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধি মতে কৈল তেঁহ স্নান ও তর্পণ ॥

প্রভু গোদাবরী জল সন্নিধানে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। সহসা বাদ্যধ্বনি ও লোক কোলহল শুনিতে পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, দেখিলেন, রামানন্দ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ সহ গোদাবরী পূত সলিলে স্নানার্থ আসিয়াছেন। রায়সহ মিলিবার জন্য প্রভুর মন অতিশয় উদাস হইল। নদী যেমন জল বেগে কূল হরণ করে, তেমনি রামানন্দ দর্শন প্রভুর চিত্ত হরণ করিতে লাগিল। রামানন্দের নিকট যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। কি জানি কি ভাবিয়া আবার যথাস্থানে বসিয়াই নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

স্নানান্তে রামানন্দ যখন তীরে উঠিতেছিলেন, দেখেন অদূরে এক সৌম্যমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন। কোটীসূর্য্য সমকান্তি, অরুণ

বসন ধারী, ইন্দিবর নিন্দিত মুখমণ্ডল প্রশস্ত কপাল, কমলাক্ষ, আজানু-লম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষঃস্থল, আমরি-মরি, কি শান্ত মূর্ত্তি, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সন্ন্যাসীর বেশে ধরাধামে উদয় হইয়াছেন, রামানন্দ নিকটে যাইয়া চরণ প্রান্তে দণ্ডবত প্রণাম করিলেন।

করে ধরি উঠাইয়া প্রভু কহে বাণি।
বল বল ত্বরা বল ভক্ত চূড়ামণি॥
তুমি কি সেই আমার রায় রামানন্দ।
যাঁর নাম শ্রবণে হয় পরম আনন্দ॥
যাঁর গুণাবলি শুনি সার্ব্বভৌম স্থানে।
দেখিবারে আইলাম হরষিত মনে॥

রামানন্দ বলিতে লাগিলেন প্রভু! আমিই সেই দাসানুদাস অধম রামানন্দ, মাহিষ্য কুলে জন্ম, ঘোর সংসারী, আপনার স্পর্শের যোগ্য নহি, আমায় স্পর্শ করিবেননা। আজ আমার সুপ্রভাত সার্ব্বভৌমের কৃপায় আপনার দর্শন লাভ করিয়া, মানব জীবন সার্থক হইল। আমি রাজসেবী শুদ্রাধম, কৃপার পাত্র, হে করুণা নিদান, পতিত পাবন! যদি নিজগুণে দর্শন দিলে, তবে এই ক'রো যেন জন্ম জন্মান্তরে শ্রীচরণ সেবায় বঞ্চিত না হই।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তখন রামানন্দকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, সহাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন, তুমি সংসারী এই জন্য ভীত হইতেছ, সংসারের তুল্য আর স্থান কি আছে? ইহাতে ভোগমোক্ষ দুই লাভ হয়। সংসারের ন্যায় কল্যাণপ্রদ স্থান আর দ্বিতীয় নাই, এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন, সকল ধর্ম্মের সার সংসার ধর্ম্ম, ভগবানে অচলা ভক্তি থাকিলেই, সংসারেতে থাকিয়াই মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়।

রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে।
কিছু দিন তবে প্রভু হইবে থাকিতে॥
হেন কালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তায় বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মন।

পুনরপী পাই যেন তব দরশন ॥
প্রেমালিঙ্গনে রায়ে বিদায় করিলা।
ব্রাহ্মণের সহ প্রভু ত্বরিত চলিলা ॥
কুশাসনে যথা সুখে উপবিষ্ট হইলা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিপ্র চরণ বন্দিলা ॥
সেবা লাগি বিপ্র তবে করেন আয়োজন।
হরষিত মনে প্রভু করিল ভোজন ॥

সেবান্তে চৈতন্য দেব সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন। ব্রাহ্মণ প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনয় নম্র বচনে বলিতে লাগিলেন। প্রভু অদ্য আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক যে হেতু ভবদীয় অমর বন্দিত পদারবিন্দ দর্শন করিলাম। সংসার জ্বালায় জীবন জ্বলিতে ছিল, আপনার দর্শন রূপ সলিল সহায়ে শান্তি হইল। জানিনা কোন ভাগ্য গুরু ঈদৃশ সংযোগ ঘটাইলেন। এইরূপ ভাবে কথোপকথন হইতে হইতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। প্রভু সায়ংকৃত্য করিয়া রামানন্দের জন্য উংকণ্ঠিত হইলেন।

প্রভু সায়ং'কৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥
দণ্ডবত কৈল রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কন কথা বসিয়া সেই খানে
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যো নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণু ভক্তি হয় ॥

ক্রমশঃ শ্রীমতিলাল শর্ম্মা।

সাধানতত্ত্ব বিচার।

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ প্রকাশ।

হরিদাস—প্রভো! ক্ষমা করিবেন অনেকে মহাপ্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া মানিতে চাহেন না; তাঁহার ঈশ্বরত্বের শাস্ত্র প্রমান কি?

গুরুদেব—বৎস, একথা আর নূতন কি? সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এই চিত্রই হইয়া থাকে। নচেৎ মায়ার রাজ্য টিকিবে কেন? স্বচক্ষে দেখিলেও সকলে বিশ্বাস করিতে পারিবেনা।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে॥
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবারে পারে॥

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাভাগবত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি সুন্দররূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন, তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণীতে তাঁহার স্বকীয় স্বরূপ যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি।

পূর্ব্বে পাইয়াছ যে, শ্রীসনাতন শিক্ষা সময়ে মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন যে, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। আবার অন্য চিত্র দেখ—

রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি গোপীজন-মনোহর শ্রীনন্দনন্দনের এবার নূতন লীলা। এবার ছন্ন কলিতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ; তাই কালো অঙ্গ গৌরাঙ্গ করিয়াছেন, চাঁচর চিকুর মুড়াইয়া মুণ্ডিত মস্তক হইয়াছেন; মোহন বেণু ছাড়ি। দণ্ড লইয়াছেন। চতুরের সাজসজ্জা উত্তম হইয়াছে, ছদ্মবেশে বেশ সকলের চক্ষে ধুলি দিয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছেন; শেষে সন্ন্যাসী সাজিয়া শ্রীবিশাখা (রায় রামানন্দ) সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ইষ্টগোষ্ঠি পরে সাধনতত্ত্ব রসতত্ত্বের আলাপ হইল, তখনও ধরা পড়েন নাই। ভাবিয়াছিলেন সেখানেও চতুরতা চলিবে, কিন্তু বিশাখা সখীও কম চতুরা নহেন, মায়া কুহেলিকায় কিছুক্ষণ তাঁহার চক্ষুকে ঝলসিয়া রাখিলেও অবিলম্বেই সাহজিক প্রেমদৃষ্টির বিকাশ হইল। তিনি সন্ন্যাসী শ্রীমূর্ত্তিতে তখন কাঞ্চন পঞ্চালিকার আচ্ছাদিত তাঁহাদের সেই সবংশীবদন সুপরিচিত খঞ্জননয়ন শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দেখিলেন। হাসিয়া বলিলেন, ওহে সন্ন্যাসী-ঠাকুর! চতুরালীর আর কি স্থান নাই? তুমি কে বল? ভাল মানুষের মত এখনই পরিচয় দেও, নচেৎ এখনি সব ভারিভুরি ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্রমশঃ

শ্রীবামাচরণ বসু।

ভক্তি।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১০ম সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

অহোতি দুর্জ্জয়া মায়া জ্ঞানিনা-মপি মোহিনী।
জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্তেহপি ক্বচিনৃত্যতি মানসে ॥

হে ভগবন্! বুঝিয়াও যাহাকে ছাড়িতে পারিনা, জানিলেও যে জানিতে দেয়-না, নিরন্তর ভাবিয়া ভাবিয়া ও যাহার অন্তপাইনা সেই সদা-নন্দ-নাশিনী বিষয় বাসনা রূপিনী কু-চিন্তাকে নাশ করিয়া তোমার ধনকে তুমিই লও আর পরের হাতে ফেলিয়া রাখিয়া যাতনা দিওনা।

হে পতিত পাবন দীনদয়াল! আমার যে তোমা-ভিন্ন অন্য গতি নাই। আমি যে আজ কালের কঠোর শাসনে কাল চক্রে পিষ্ট হইয়া নি-দারুণ যন্ত্রনা হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য তোমা কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া তোমার নিকটেই প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু দেব! তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামি তুমি সকলই যান, জানিয়া শুনিয়া আর চুপ্ করিয়া থাকিও না। আজ আমি প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তোমার নিকট যে কি করিয়া প্রার্থনা করিতে হয় তাহা আমি জানি না; তবে এই ভরসা আছে যে, তুমি দীনশরণ। দীনের এই প্রার্থনা যেন সর্ব্বদা তোমার ভাবে থাকিতে পারি এবং যখন যেখানে যেভাবেই-থাকিনা কেন যেন তোমার করুণা ভুলিয়া না যাই, যেন মধুমাখা হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া ধন্য, কৃতার্থ, হইতে পারি। প্রভো! বিশ্বাস দাও; এক-

মনে যেন তোমার নাম-কীর্ত্তন করিয়া, তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া তোমারই সেবা করিতে পারি। বাঞ্ছা কল্পতরু! আমি যতই প্রার্থনা করিনা কেন তোমাকেত সকলই পূরণ করিতে হইবে; কারণ আমি দীন তুমি দীন-নাথ, আমি পতিত তুমি পতিতপাবন, আমি ভিখারী তুমি রাজ রাজে-শ্বর। দে'খ যেন তোমার ভক্ত প্রদত্ত নাম ব্যর্থ না হয়। আমি বড় আশা করিয়া তোমার ঐ অভয় পদে শরণ লইলাম; হে অভয় দাতা! অভয় দাও একেইত দুর্ব্বল হৃদয় তাহাতে আবার নানা প্রকার দুর্ভাবনা আসিয়া হৃদয় কে আরও দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে ভীষণ কর্ম্মক্ষেত্র, শক্তিময়! শক্তি দাও, নাথ তোমার নাম স্মরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম, দেখ যেন তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক না হয়। হে ভাবনিধি! ভাব দাও—এমন ভাব দাও যে স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী যাহা কিছু নয়ন গোচর হউক না কেন সকলেতেই যেন তোমার সত্তা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারি। এদীনহীনের চঞ্চল মন যেন তোমার ঐ রাতুল চরণ সরোজে নিরন্তর মধুপান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, দীনহীন অভাগার আজ ইহাই প্রার্থনা। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সৎপ্রসঙ্গ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চ।—তুমি জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য করিবার কথা বলিতেছ, কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, জ্ঞানোদয় হইলে আর কর্ম্ম থাকে না, অতএব এই পরস্পর বিরোধি বাক্যের মীমাংশা করিয়া দাও।

র।—জ্ঞানোদয় হইলে অহঙ্কার জনিত সগুণ কর্ম্ম থাকে না, কিন্তু নির্গুণ বা নিস্কাম কর্ম্ম থাকে, এই নিস্কাম কর্ম্মের অর্থ নির্ব্বিশেষ কামনা যুক্ত কর্ম্ম, শ্রীভগবানই একমাত্র নির্ব্বিশেষ, সুতরাং মন নির্ব্বিশেষ লক্ষ্যে যুক্ত হইলে ভাবপথে শ্রীভগবানের শক্তি সাধকাধারে সঞ্চারিত হইয়া যখন

তাহাকে যন্ত্রবৎ পরিচালনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করায় তখন সেই যোগযুক্ত কর্ম্মকেই নিস্কাম কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ বলে, এই অবস্থায় সাধকের গুণজ অহঙ্কার না থাকায় সেই কর্ম্ম তাহার নিজের দ্বারা কৃত হয় না, ভগবৎ প্রেরণায় তিনি কর্ম্মের অনুসরণ করেন মাত্র, ফলাফলের দিকে আশক্তি থাকে না।

চ।—কোন্ অবস্থায় এই নিস্কাম কর্ম্ম করিবার অধিকার ও শক্তি লাভ হয়?

র।—জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইলে নিস্কাম কর্ম্মের স্তরে উঠিবার আরোহণী স্বরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎপ্রীত্যার্থে কর্ম্ম করিবার অধিকার হয়, পরে এই ব্রাহ্মণত্বের মধ্য দিয়া বৈষ্ণবত্বে উন্নীত হইলে সাধক নিস্কাম কর্ম্মের উপযুক্ত হইতে পারেন।

চ।—সর্ব্বভূতের মধ্যেই যখন চৈতন্যস্বরূপে শ্রীভগবান বিরাজিত তখন কেবল ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবগণকে নারায়ণ স্বরূপ বলা হয় কেন?

র।—ব্রাহ্মণত্ব গুণগত, জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক অর্থাৎ শ্রীভগবানকে জানিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত ভাবে যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই ব্রাহ্মণ, লৌহের মধ্যে অগ্নি সূক্ষ্ম ভাবে আছে, কিন্তু ঐ লৌহ অগ্নির সহিত যুক্ত হইলে যেমন উহা অগ্নির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় সেইরূপ চৈতন্য সত্ত্বা সর্ব্বভূতে সূক্ষ্ম ভাবে থাকিলেও চিদ্ঘন শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত থাকায় জ্ঞানবান ব্রাহ্মণগণের হৃদয়েই ঐ সত্ত্বার প্রকাশ হয়, সুতরাং গঙ্গার জল কলসীর মধ্যে থাকিলেও যেমন তাহার পাবনী শক্তির হ্রাস হয় না সেইরূপ ব্রাহ্মণের নির্ম্মল হৃদয়-স্থিত ভাবাধার বিহারী চৈতন্য সত্ত্বার সহিত শ্রীভগবানের স্বরূপ সত্ত্বার ব্যবহারিক কোন প্রভেদ নাই জানিও এবং এই জন্যই গীতায় আছে।

ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্মং মাগতাঃ
সর্গেঽপি নোপ জায়ন্তে প্রণয়ে ন ব্যথন্তিচ।

অর্থাৎ এই জ্ঞান আশ্রয় করতঃ সৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে জন্মমৃত্যু রূপ আবর্ত্তন রহিত হইয়া যায়।

লণ্ঠন নির্ম্মল হইলে যেমন বাহিরে তন্মধ্যস্থ আলোকের প্রকাশ হয় সেইরূপ সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রকৃতি নির্ম্মল হইলে তন্মধ্যস্থ চৈতন্য-জ্যোতি জ্ঞান স্বরূপ প্রকাশ পায়, ফলতঃ সাত্ত্বিক বা নির্ম্মল কর্ম্মের দ্বারা মার্জ্জিত চিত্ত শূদ্রের মধ্যেও যদি এই জ্ঞানের প্রকাশ হয় তাহা হইলে সে ব্রহ্মত্বে উন্নতি

হইয়াছে বলিয়া জানিবে এবং জন্মগত ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি এই জ্ঞানের অভাব দেখা যায় অর্থাৎ মলিন কর্ম্মের দ্বারা যদি তাহার চিত্তাধারে নিহিত চৈতন্য জ্যোতীর প্রকাশাবস্থা সূক্ষ্ম হইয়া যায়; তবে সে শূদ্রত্বে অধঃপতিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। জল সুক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইলে জলের সহিত তাহার উপাদান ভেদ না থাকিলেও যেমন তাহার দ্বারা তৃষ্ণা শান্তি হয় না সেইরূপ অব্রাহ্মণের মধ্যে চৈতন্য সত্ত্বা থাকিলেও প্রকাশাভাবে তাহা সাধারণের নিকট কার্য্যকরি হয় না কিন্তু হিমের দ্বারা ঐ বাষ্প ঘণীভূত হইয়া জলে পরিণত হইলে যেমন উহা সাধারণের পিপাসা নিবৃত্তির উপযোগী হয় সেইরূপ সাত্বিক কর্ম্মের দ্বারা চৈতন্য সত্ত্বা জ্ঞান স্বরূপ প্রকাশ পাইলে যখন ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় তখন আধ্যাত্মিক তাপের শান্তি করিবার জন্য জনসাধারণে সেই প্রকাশ শক্তিকে নারায়ণ বুদ্ধিতে পূজা করে, ফলে গাভী দুগ্ধবতী ও দোহন কারি উত্তম হইলে যেমন যথেষ্ট পরিমানে দুগ্ধ লাভ হয়, সেইরূপ পাত্র প্রকৃত ও পূজা আন্তরিক হইলে মহৎ ফল লাভ হয় জানিও।

চ। ব্রাহ্মণে ও বৈষ্ণবে কি প্রভেদ নাই?

র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণত্বের মধ্য দিয়াই বৈষ্ণবত্বে উন্নীত হইতে হয়, অতএব ব্রাহ্মণত্বকে বৈষ্ণবত্বের প্রথম স্তর বলা যাইতে পারে, প্রকৃত বৈষ্ণবগণ ভাব যোগে শ্রীভগবানের দ্বারা ত্রিগুণের অতীত; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সাত্বিক অহঙ্কার থাকে. তবে সোণার তরবালের যেমন তরবার উপাধি থাকিলেও তাহার দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না সেইরূপ এই অহঙ্কারে উন্নতির কোন বিঘ্ন হয় না "উর্দ্ধেগচ্ছন্তিসত্বস্থা" ইহাই গীতার বাণী, ফলে এই নির্ম্মল অহঙ্কার অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণগণ ক্রমে উর্দ্ধগামী ও গুণাতীত হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানি ও বৈষ্ণবগণ বিজ্ঞানী, ব্রাহ্মণগণ শ্রীভগবানকে জানিয়া যোগের দ্বারা তাঁহার শক্তি লাভ করেন; এজন্য তাঁহা-দিগকে শাক্ত বলা যাইতে পারে কিন্তু বৈষ্ণবগণ সেই শক্তিমানকে বাদ করিয়া জলে তুষার খণ্ডের ন্যায় "তিনি আমাতে ও আমি তাঁহাতে" এই মহান্ ভাবে মগ্ন থাকেন, গুণের অন্তর্গত হওয়ায় ব্রাহ্মণের বরং পতন সম্ভাবনা থাকে কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবের সে ভয় নাই, তাঁহারা অচ্যুত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ সম্ভোগ করেন, পুত্র পিতার হাত ধরিয়া চলিলে তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু

যদি পিতা পুত্রকে কোলে করিয়া চলেন তাহা হইলে যেমন তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিক অস্মিতার দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত যোগ রাখিয়া চলেন, সুতরাং অন্যমনস্ক হইলে যোগ ভ্রষ্ট হওয়ায় পতনের ভয় থাকে, কিন্তু বৈষ্ণবের আত্ম-সমর্পণে সিদ্ধ হওয়ায় শ্রীভগবান তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করেন সুতরাং তাঁহার আর কোন ভয়ই থাকে না, মায়িক শক্তির দ্বারা কোনরূপেই তাঁহার সচ্চিদানন্দ ভাবের বিচ্যুতি হয় না।

মনে রাখিও যে আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃতবৈষ্ণবের লক্ষণ বলিলাম, সাধারণ ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের কথা বলি নাই কেননা যাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবত্বের উন্মেষ হইয়াছে, একটু লক্ষ্য করিলেই তাঁহাদের মধ্যে অসাধরণত্ব দেখিতে পাইবে।

চ। কিরূপে এই অসাধারণত্ব দেখিয়া তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিব ?

র। জহুরী হইলেই জহর চিনিতে পারা যায়; ইংরাজীতে একটি বচন আছে "God helps him who helps himself" গীতাতেও আছে যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" ফলে তুমি যদি সৎ হইতে চেষ্টা কর তাহা হইলে ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন, তিনিই তোমাকে সাধু চিনাইয়া দিবেন অর্থাৎ তাঁহার কৃপায় তোমার হৃদয় রূপ কষ্টিপাথরে প্রকৃত স্বর্ণের পরীক্ষা তুমি নিজেই করিতে পারিবে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবকে দেখিলেই হৃদয়ে সদ্ভাবের উদ্রেক হয়, শ্রীভগবানকে মনে পড়ে ও মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও হৃদয় হইতে পার্থিব পঙ্কিল ভাব বিদূরিত হয় ও জগতের নশ্বরতা বোধ হওয়ায় পারমার্থিক কর্ত্তব্য পালনের জন্য হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠে।

কিন্তু ইহাও জানিও যে যাহাদের হৃদয় অসতের ঘাত প্রতিঘাতে অসাড় হইয়া গিয়াছে, সদ্ভাবের বিন্দুমাত্র রসও যাহাদের হৃদয়ে নিহিত নাই, অন্ততঃ সে জন্মে তাহাদের এ সকল অনুভূতি হওয়া দুস্কর। ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বাসনা।

—:০:—

(১)

হেন দিন কবে হইবে আমার,
বল গো করুণাময়!
আত্ম সুখ আশ করি পরিহার,
ভজিব চরণ দ্বয়॥
ভুবন মোহন ও রূপ তোমার,
মানস নয়নে হেরি অনিবার,
প্রেমের সাগরে দিব গো সাঁতার,
দূরে যাবে তাপত্রয়।
হেন দিন কবে হইবে আমার,
বল গো করুণাময়।

(২)

জলে, স্থলে শূন্যে প্রতি পদার্থে,
নিরখি, তোমার জ্যোতি।
হিয়ার মাঝারে, ভাবের তরঙ্গ,
খেলিবে দিবস রাতি॥
নাহি র'বে তবে আত্ম পর জ্ঞান,
দূরে যাবে দ্বেষ, হিংসা অভিমান,
তৃণ হ'তে নীচ মানি' আপনারে,
করিব সবারে নতি।
জলে স্থলে শূন্যে প্রতি পদার্থে,
নিরখি' তোমার জ্যোতি॥

(৩)

প্রেম বলে কবে, মায়ার বন্ধন,
অবহেলে ছিন্ন করি।

মুক্ত পক্ষী প্রায়, আপন ইচ্ছায়,
ভ্রমিব দয়াল হরি !
হেরিয়ে তোমার রচনা কৌশল,
জুড়াব আমার নয়ন যুগল,
তব গুণ গান গা'ব অবিরল,
অপার মহিমা স্মরি॥
বল নাথ কবে এ বাসনা মোর,
পূরা'বে করুণা করি॥

(৪)

কামিনী কাঞ্চন, করিয়ে বর্জ্জন,
ভকত নিকর যথা।
প্রেমের উচ্ছ্বাসে গাহিছেন সদা,
তব লীলা গুণ গাথা।
মনোসুখে তথা যাব ধীরে ধীরে,
ভক্ত পদ ধূলি লব তুলি শিরে,
লীলারস বাণী, শ্রুতি যুগে শুনি,
ঘুচাব প্রাণের ব্যথা।
হেন দিন কবে হইবে আমার,
বলগো জগৎ ত্রাতা?

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার,

(কাঙ্গালের কথা।)

—:০:—

মানুষ! তুমি কয় দিনের জন্য এই সুখ দুঃখের লীলা নিকেতন, আপদ বিপদ সঙ্কুল সংসার রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছ? বড় জোর, একশত

বৎসরই হউক? ইহার অধিক ত, নয়? আর লক্ষ হইলেই বা কি? আদ্যন্ত শূন্য অসীম সময়ের তুলনায় তোমার পরমায়ু কাল কতটুকু !! চক্ষের নিমিষওত নয়। এই অত্যল্প সময়ের জন্যে আসিয়াই তুমি তোমার জীবনকে অনন্ত মনে করিতেছ। মর জগতে মরিতে আসিয়াই, আপনাকে অমর ভাবিতেছ। হরি! হরি!! হরি!!! মোহের মহিমা কি দুর্ব্বোধ!! অবিদ্যার কি অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব!!!

এই জড় জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সমস্তই বিশ্ব বিধ্বংসী কালের করাল কবলে নিষ্পেষিত হইয়া, দিন দিন চূর্ণাতি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে! আবার নূতন নূতন অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া এই বিশ্ব সংসারটাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছে। মোট কথা; যাইতেছে, আর আসিতেছে। অথবা আসিতেছে আর যাইতেছে। একেই কথা।

ক্রীড়াময়ী প্রকৃতি, বিকার বিশিষ্ট পঞ্চভূত উপকরণ লইয়া, সর্ব্বক্ষণ শুধু ভাঙ্গা গড়ার তালেই আছেন। দেবীর আর বিরাম নাই একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন একটী সৃষ্টি বিলয়ের অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র চলিতেছে। স্বভাব সুন্দরীর এই বিনাশোৎপত্তির যন্ত্রটী কতকাল হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর এই ভাবে কত কালই বা চলিবে, কে জানে?

তুমি আমি সকলেই প্রকৃতি যন্ত্রের এক অনিবার্য্য ঘুরাণ চক্রে পড়িয়া কেবল ঘুরিয়া মরিতেছি। আসিতেছি, যাইতিছি বা জন্মিতেছি আর মরিতেছি সেই বা কতকাল হইতে কতকাল পর্য্যন্ত কে জানে?

এই যে জন্ম-মরণ, ইহাও ত সহজ নহে। বড়ই বিষম! জন্ম মরণের ন্যায় দুঃখ জগতে আর কিছুই নাই। হরি ভজন বিহীন জীব, অনন্ত কাল হইতেই এই দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছে।

জন্ম মরণ রূপ আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণের উপায় যে, সাধুসঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ ভজন, মোহ মুগ্ধ জীব এই সারতত্ত্ব সহসা বুঝিয়া লইতে পারিতেছে না।

মায়ার ঐকান্তিক প্রভাবে জীব, আত্ম তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া অহঙ্কারী হইয়া উঠে। সর্ব্বদা বিষয় পিপাসার তীব্র তাড়নায়, পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ ক্লেশ নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে অবকাশ পায় না।

তাপত্রয় সংযুক্ত মিথ্যা সংসারের দাসত্ব করিয়া ক্ষোভে, দুঃখে অতিশয় কষ্ট ভোগ করে।

এইরূপে দুঃখ দুর্দ্দশা ভুগিতে ভুগিতে পরিশেষে মরিয়া যায়। মরিয়াও নিস্তার নাই। কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত, রক্ত মাংসের একটা পঁচা গলা শরীর লইয়া পুনর্ব্বার সংসার চক্রের পাপ তাপ পূর্ণ কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে হয়।

কিন্তু গত জন্মে যে, এত দুঃখ দুর্দ্দশা ভুগিয়া গিয়াছিল, তাহা আর কিছুই মনে নাই। এদিকে সকলেই দেখিল যে, যে মরিয়া গেল সে গেলই গেল। কিন্তু তা নয়, জন্ম মরণ নিবারণ করিয়া, নিত্যের নির্ম্মলানন্দে পহুছিতে না পারিলে আর নিস্তার নাই। কেবল আসা আর যাওয়া। আর যন্ত্রণা! আর যন্ত্রণা !!

জীব যদি মনের নিবৃত্তি সাধন না করিয়া বিষয় বাসনা লইয়া দেহত্যাগ করে, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই সেই লোভ লালসার অনুরোধে, মনের বাসনা পূর্ণের জন্যে, আবার এই মর জগতে আসিতে হইবে।

এই নশ্বর জড় জগতের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধ থাকিবে, যে পর্য্যন্ত আত্মার চিন্ময় সত্ত্বা বিকাশ না পাইবে, যে পর্য্যন্ত ভগবদ্‌ভজনোপযোগী হইয়া আত্মা, চিদ্ বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের সুনির্ম্মল প্রেম জ্যোৎস্নায় উদ্ ভাসিত না হইবে, সে পর্য্যন্তই কেবল জন্ম আর মরণ। সে পর্য্যন্তই যাওয়া আসা, সে পর্য্যন্তই কেবল দুঃখ ভোগ।

জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে সময় টুকু, তাহাই আমাদের জীবন কাল। এই জীবন কালের মধ্যে মানুষকে বড়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পারলৌকিক সুখ-দুঃখ ছাড়িয়া দিয়া, যদি কেবল ঐহিক সুখ দুঃখের বিচার করা যায়, তবেও দেখা যাইবে যে, মানুষে কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে।

ত্রিতাপের ক্রীড়া ক্ষেত্র এই মর জগতের মানুষ কেমন করিয়া সুখী হইবে? সংসারের রাজা, প্রজা, ধনী, মানী, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই এই জড় জগতের তাপত্রয়ের অধীন।

তবে যাহারা সাধনার বলে কি ভক্তি ভজনের গুণে, মায়া মোহের অন্ত-রালে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন, মনকে বিষয় বিতান হইতে উঠাইয়া লইতে পরিয়া-

ছেন, কিম্বা যাঁহারা সহিষ্ণুতার বলে, জ্ঞানের বলে, সংসার গণ্ডীর বহির্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক, প্রেমোজ্জ্বল-চিত্তে সর্ব্বদা ভজনানন্দে বিভোর হইয়া শান্তির নির্জ্জন কুটিরে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা জন্ম মরণের দায় হইতে মুক্ত। তাঁহাদের আসা যাওয়ার পথ বন্ধ।

ব্যাধির আলয়, রক্ত মাংসের এই শরীর লইয়া রোগ, শোক, পাপ, তাপ, আপদ, বিপদ সঙ্কুল সংসারের মানুষ কেমন করিয়া সুখী হইতে পারে? তবে যে ঐহিকের সুখ সন্তোষ, স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বা বিদ্যুৎরেকার ন্যায় অতি চঞ্চল। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে, সংসারটা শুধু দুঃখ দুর্দ্দশারই লীলা স্থলী পরিতাপেরই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড !!

এবম্প্রকার মর জগতে, জ্বালা যন্ত্রণার রাজ্যে, যদি মানুষের কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তবে তাহা কৃষ্ণ ভজন। তবে তাহা পরোপকারব্রতে দীক্ষিত হইয়া আত্ম প্রসাদ লাভ।

এই দুঃখের দেশে সুখ, শুধু সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা। শ্রীশ্রীভগবানের পরম পবিত্র লীলা মাধুর্য্যে অমৃতোপম রসাস্বাদন। ভাই ভাই সকলে মিলিয়া অকপট চিত্তে শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করা।

নতুবা পুত্র কন্যা ধন, মান, লইয়া এই অনিত্য সংসারে কেহই সুখী হইতে পারিবে না।

এই বিশাল বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভাবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, বোধ হয় কলি-কবলিত জীবের বহু পরিমানে আত্মাভিমান অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারে।

মানুষ! তুমি কি কখন জাগতিক অনিত্য কোলাহলের ব্যাপকতার বহির্ভাগে, শান্তি সন্ন্যাসীর তটস্থ হইয়া জ্ঞান অথবা প্রেম চক্ষু সংযোগে অনন্তের লীলা তরঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে, এ কিছুই না! তোমার ধন, জন, মান, মর্য্যাদা সকলই মিথ্যা।

আর যদি না দেখিয়া থাক, তবে তুমিই একজন। তোমার মত এমন জ্ঞানী, এমন মানী, এমন বিদ্বান্ কি এমন কুলীন, এমন নিরোগী দীর্ঘজীবি আর দ্বিতীয়টী নাই।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়, এই পৃথিবীটাকে একটী বিন্দু বলিলে বড় দোষ নাই। আবার এই পৃথিবীর তুলনায় তোমাকে আমাকে একটী পরমাণুর অংশ কণিকা বলিলে লজ্জার কারণ কি? অত্র অবস্থার আপনার ওজন না বুঝিয়া, আপন শক্তি সামর্থ্যের খবর না লইয়া, তোমার আমার জ্ঞানের গৌরব করা কি নিতান্ত নির্ব্বোধতার পরিচায়ক কিম্বা ঐকান্তিক মূর্খতার জ্ঞাপক না।

তুমি আমি জিনিসটাই বা কি! আর তোমার আমার জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমাণই বা কতটুকু? তবে কিনা আত্ম-তত্ত্ব ও অনিত্য তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অনন্তের দিকে না চাহিয়া নিজে নিজেই খুব বড় মানুষ নিজে নিজেই আপন বিদ্যাবুদ্ধির মাত্রা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা মানব জীবনের অধোগতি বা দুরাবস্থা কি হইতে পারে?

তুমি কেবল তোমাকে দেখ আর তোমার আপন গুণ গরিমা বড়াই করিয়া মর। জ্ঞান অথবা প্রেমের চক্ষু লইয়া অপার মহিমা মণ্ডিত এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই কেবল অনন্তের লীলা খেলা, সেই দিকেই কেবল অনন্তের অনন্ত উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গ মালা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবে।

অনন্ত মহিমাময় ঈশ্বরের রাজ্যে যে তুমি যৎসামান্য একটুক জ্ঞান কণিকা লইয়া বাহাদুরী দেখাইতে চাও, ইহা তোমার দুর্ব্বুদ্ধি নয়তো কি?

বিরাট বিশ্বের বিশাল ব্যাপকতার কোন এক অপরিজ্ঞাত স্থানে ধূলি-কণার ন্যায় পড়িয়া থাকিয়া, তোমার এত আস্পর্দ্ধা কেন? এত জ্ঞান গৌরব কেন? এত অভিমান কেন?

বিশেষতঃ, তুমি জ্বালা যন্ত্রণাময় মরজগতের একটা রক্ত মাংসের কীটানু-কীট; তোমার সময়েই বা কত! আর কতক্ষণের জন্যই বা এই অনিত্য সংসার ক্ষেত্রে নড়া চড়া করিতে আসিয়াছ।

এই বিশাল বিশ্ব সমুদ্রের মধ্যে বুদ্বুদের ন্যায় কত অসংখ্য জীব অবিরত উৎপত্তি হইয়া লয় পাইয়া যাইতেছে, তাহার হিসাব নিকাশ লইতে তোমার আমার ভজন বুদ্ধিতে কুলাইবে কি!

মানুষ! তোমার যে এত জ্ঞানের গৌরব, ধনের গৌরব, কুলের গৌরব এই সমস্ত গৌরবের মূল কারণই তোমার মূর্খতা! তোমার অজ্ঞানতা!! তুমি অন্ধ তোমার চক্ষু ফোটে নাই। যদি চোক্ ফুটিত, তবে জগতের প্রলয়ঙ্করী

পরিবর্ত্তন, বিশ্ব বিধ্বংসী স্বভাব, অনন্তের অনন্ত লীলা লহরী দেখিয়া বুঝিয়া লইতে পারিতে যে, এই মানব জন্মের সার উদ্দেশ্য কেবল ঈশ্বরের মহিমা চিন্তন। ঈশ্বরের ভজন সাধনে মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখা। ঈশ্বরে অকৈতব প্রেম করাই জন্ম মরণ দুঃখের বিনাশক সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করা।

একবার জগতের প্রাকৃতিক কাণ্ড কারখানার দিকে চাহিলে, অনন্তের লীলা তরঙ্গের দিকে চাহিলে, তোমর সকল গৌরব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তুমি বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িবে। তখনই আর মনের অহঙ্কারাদি থাকিতে পারে না। মন ভগবদ্ প্রেম-মাধুর্য্যে পরিসিক্ত হইয়া উঠে। ভগবচ্চরণে আত্ম সমর্পণের বলবতী ইচ্ছা জাগিয়া উঠে।

অতএব মানুষ! একবার ভগবানের অপার মহিমা মণ্ডিত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখ, একবার অনন্তের অপূর্ব্ব লীলা, অবলোকন কর, একবার পরিণাম চিন্তায় মনোনিবেশ কর। জগতের অনিত্যাচারের দিকে চাহিয়া ভুবন মঙ্গল শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও। প্রাণ ভরিয়া প্রাণের দেবতাকে ডাকো। একবার শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের সুমধুর লীলারস চিন্তনে মনকে নিযুক্ত করিয়া দেও। সময় নাই জীবন যে অতি চঞ্চল। কখন কি হয় বলা যায় না।

জীবের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে বড়ই ভয় হইয়াছে। বহু জন্ম পরিভ্রমনান্তে আমরা এই ভজন যোগ্য মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এবারও যদি ভক্তির পথে অবসর হইতে না পারি, এবারও যদি নিষ্কাম ভক্তি যোগে ভগবানের আরাধনা করিতে না পারি, তবে আবারও সেই আশি লক্ষ্যের পথে ঘুরিতে হইবে, আবারও পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ আত্যান্তিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।

সংসার স্বপ্নবৎ মিথ্যা জানিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা মানব কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি সর্ব্বদা পাশব চরিত্রের অনুসরণ করিয়া বেড়াই, তবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি?

তাই বলিতেছি, মানুষ! রোগে শোকে পরিপূর্ণ এই অনিত্য সংসারের সার যে কেবল শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, এই নির্ম্মল তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। সাধু সঙ্গ কর। বল, একবার বদন ভরিয়া বল, হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!! বল, প্রাণ ভরিয়া বল, "রাম রাঘব রাম রাঘব, রাম রাঘবপাহিমাং।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাং।" বল, বল, মনের সাধে বল,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

ভাল বাসা।

—:০:—

"ভালবাসা" কথাটী যেমন শ্রুতিমধুর কার্য্যতঃ তদ্রূপ হইলেও ইহার প্রকৃত আস্বাদ অনুভব করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। স্বার্থের আবরণে তাহার অনুপম মধুর মূর্ত্তি নিরন্তর প্রছন্ন থাকায় হৃদয়ে প্রকৃত রূপে প্রতিফলিত হয় না। পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন, মা সন্তানকে স্নেহ করেন ইত্যাদি জগতে অনেকে অনেককে ভালবাসিতেছেন সত্য; কিন্তু ইহা প্রকৃত ভালবাসা কিনা তাহার তত্ত্ব নির্দ্ধারণ নিতান্ত কঠিন বলিয়া মনে হয় না কি? পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, মা সন্তানকে স্নেহ করেন, ইহা যদিও অলীক নহে; কিন্তু কয়জন পিতা মাতা পুত্রের হিতের জন্য, পুত্রের সুখের জন্য, তাহার নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যস্ত? কয়জন পিতা মাতা পুত্রের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি সাধনে উদ্যোগী? বৈদিক যুগে যেমন দ্বাদশ বর্ষ কাল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত এখন তাহার বিপরীত হইয়া দাড়াইয়াছে। ইদানীন্তন বিদ্যাশিক্ষা কেবল অর্থকরী রূপে পরিণত হইয়াছে। পুত্রের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হউক বা না হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না এমন কি যদি ছেলে দুটা সৎ কথা শুনিতে যায় তাহা হইলে সমাজে তীব্র প্রতিবাদের ধূম পরিয়া যায় পুত্র কোনও রকমে বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিতে ভূষিত হইলে ঐ পিতার পুত্রোচিত কার্য্য করা হইল বলিয়া ধারণা। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, সম্পূর্ণ নীচ স্বার্থের এক জ্বলন্ত উদাহরণ তাহা অনায়াসে বোধগম্য। কারণ পিতা মনে করিলেন;

পুত্রকে ভাল বাসিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথ প্রসস্ত করিবার জন্য তাহাকে উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত করিলাম কিন্তু হায়! এ ভবিষ্যৎ মঙ্গল কার! কাহার প্রতি এ ভালবাসা! তাহা একবার চিন্তা করিবার অবসর পান কি? পুত্র নাস্তিক হোক্, পুত্র ব্রহ্মচর্য্য হীন হইয়া অকাল মৃত্যুলাভ করুক, পুত্র বেশ্যাসক্ত হইয়া রসাতলে যাক্, তাতে আমার কি? আমার চাকুরি করিতে পারিলেই হইল। সে অশান্তিতে পুড়িয়া মরুক, সে তাহার পরিবার প্রতিপালন করিতে পারুক্ বা না পারুক্, সে বীর্য্যহীন হইয়া মরিয়া যাক্ তাতে আমার কি? আমার নব বধুর মুখ দেখিতে পাইলেই হইল। আমার পৌত্রের মুখ-চন্দ্রমা অবলোকন করিতে পারিলেই হইল। এইত ভালবাসা! এই ভালবাসা পিতার নিজের উপর কি পুত্রের উপর? তাঁহাদের ধারণা পাশ করিয়া চাকুরী করিলেই পুত্র মানুষ হইল। বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার করিলেই পুত্র মানুষ হইল। অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া মনুষ্যত্বের একটা উপাদান। কিন্তু যে শিক্ষায় নৈতিক জীবন গঠিত না হয়, যে শিক্ষায় যথেচ্ছাচার স্রোতে ভাসমান মনুষ্যকে প্রত্যাবর্ত্তীত না করিয়া কেবল মাত্র অর্থ প্রসব করে সে শিক্ষা কুশিক্ষা। সে শিক্ষা কেবল আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনের পুষ্টি সাধন করে মাত্র। এ সকলত পশু পক্ষীর ও আছে যদি কেবল মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াই, মাত্র আহারাদির সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া মনুষ্য হওয়া যায় তাহা হইলেও জীব মাত্রেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে। হায়! জগৎ কেবল মাত্র এই হীন-স্বার্থে জড়িত হইয়া এত আসক্ত হইয়াছে যে "মনুষ্যত্ত্ব কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত" সে দিকে লক্ষ না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় কোথায়! কোন নরকেরদিকে ছুটিতেছে তাহার স্থির নাই। জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হিংসা দ্বেষ অভিমানে অহঙ্কারে সর্ব্বদা পূর্ণ হইয়া সকলেই যেন অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে নরক ভোগ করিতেছে। প্রায় সকলেই কেবল আপনার এই কয়েকটী ইন্দ্রিয় আর স্থুল দেহটীর সন্তোষ সাধনে ব্যস্ত। কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহে না। কেবল আমার পুত্র, আমার ধন, আমার স্ত্রী করিয়াই উন্মত্ত। পার্থিব বস্তুতে এত জড়িত যে, সে একবারও ভাবে না "আমাকে এ দেহ অধিক দিন ধারণ করিতে হইবে না।" পাগল! ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? শেষের সে দিন কি ভীষন! কি ভয়ঙ্কর!! সকলেই তোমায় উলঙ্গ

করিয়া সব ছাড়াইয়া লইবে কিছুই সঙ্গে দিবে না তখন তোমার সঙ্গী কে হইবে? এখন যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এত পরিশ্রম করিতেছ, উৰ্দ্ধে লক্ষ্য নাই ভগবানের উপর বিশ্বাস নাই, তখন তোমার যে দশা হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যে স্ত্রী পুত্রের জন্য তুমি সব বিসর্জ্জন দিয়াছ, তাহারা তোমার চির নিদ্রায় ক্ষণকাল বাহ্যিক চীৎকার করিয়া, স্ব স্বকৰ্ম্মে নিযুক্ত হইবে। তোমার কথা তাহাদিগের মনে থাকিবে না। কারণ তোমার সে কপট ভালবাসায় তাহার ভুলে নাই। তুমি যে নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের তৃপ্তির জন্য, তাহাদের উপরা ভালবাসা দেখাইতে, তাহা সে বিস্মৃত হয় নাই। ভ্রান্ত মানব! তুমি ও তাহাদের প্রতি যে রূপ প্রেম দেখাইতে, তাহারাও তোমার প্রতি সেইরূপ দেখাইত; অতএব এখনও সময় আছে, এখনও দর্শন ও শ্রবণ শক্তি হ্রাস হয় নাই; এখন হইতে স্ব স্ব কৰ্ত্তব্য সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও? আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না একটা গল্প মনে হইতেছে; গুরু শিষ্যকে বুঝাইতে ছিলেন ভগবানই আত্মীয় আর কেহ আত্মীয় নহে তাহা শুনিয়া শিষ্য বলিলেন, আজ্ঞা মা, পত্নী প্রভৃতি ইহাঁরা খুব ভাল বাসেন, না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখন, গুরুজী বলিলেন ইহা তোমার মনের ভুল। আচ্ছা! এই ঔষধের বড়ী কয়টী লও এবং বাড়ী গিয়া ঐ ঔষধ খাইয়া শুইয়া থাক। লোকে মনে করিবে তোমার দেহ-ত্যাগ হইয়াছে, কিন্তু তোমার বাহিরের জ্ঞান থাকিবে তুমি সব জানিতে পারিবে আমিও সেই সময় যাইতেছি। শিষ্য আজ্ঞানুবৰ্ত্তী হইয়া তাহাই করিল, ইহাতে তাহার "মা" "স্ত্রী" ইত্যাদির করুণ চীৎকারে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল পরে গুরুজী যথা সময়ে দর্শন দিলেন। গুরুজী বলিলেন আমি একটী ঔষধ জানি তাহাতেই তোমার পুত্র জীবিত হইবে কিন্তু একটী কথা আছে; এই ঔষধটী আগে একজন আপনার লোকের খাইতে হইবে তাহার পর উহাকে দেওয়া যাইবে। যে আপনার লোক ঐ বড়ীটী খাইবে তাহাতে তাহার মৃত্যু হইবে। তা এখানে উহার মা স্ত্রী সব আছেন একজন নয় একজন খাইবেন সন্দেহ নাই তাহা হইলে ছেলেটী বাঁচিবে। গুরুজী আগে মাকে ডাকিলেন ;— বলিলেন মা! আর কাঁদিতে হইবে না এই ঔষধটী খাও তাহা হইলে ছেলেটী বাঁচিবে। মা বলিলেন আমার খাবার কোন আপত্তি নাই, কথাটা কি! আমার আরও দু পাঁচটী ছেলে আছে তাহাদের উপায় কি হইবে বলিয়া ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। শিষ্যটার পরিবারও ঐরূপ বলিলেন। শিষ্যের তখন ঔষধের নেশা নাই সে বুঝিল কেহ কাহারও নহে। তখন সে সব বুঝিতে পারিয়া গুরুজীর সহগামী হইল। গুরুজী শিষ্যকে বলিলেন তোমার আপনার কেবল সেই ভগবান। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জগতে কেহ কাহাকেও ভাল বাসে না, ভালবাসা বলিয়া প্রকৃত যেটী তাহা বাহ্য জগতে পাওয়া যায় না। এটী অন্তরের জিনিস অন্তর্য্যামির নিকটেই থাকে; জীবের অন্তরাত্মাই তাহা উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত! তাই সে চায় কেবল আত্মা স্বরূপ ভগবানকে অর্থাৎ আপনাকে ভাল বাসিতে, কিন্তু বাহির হইতে ইন্দ্রিয় চরের মুখে যাহারই ভাল সংবাদ পায়, তাহাকেই জড়াইয়া ধরে; শেষে কোথাও শান্তি পায় না তখন অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব প্রকৃত ভাল বাসার পাত্র একমাত্র অন্তরাত্মা। তাহাকেই ভালবাসিতে পারিলে মানুষ শান্তিলাভ করে, ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে পারে, প্রথিত নামা সাহিত্য-সেবী স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত লিখিয়াছেন "যিনি কাহারও সহিত মিত্রতা করিবার বাসনা করেন তিনি আপনি আপনাকে ভাল বাসেন কিনা, অগ্রে তাঁহার তাহা দেখা অবশ্যক।" ইহার ভিতর এই গূঢ়তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু হায়! মানুষ আপনাকে লক্ষ্যই করে না। পরকে আপনার ভাবিয়া আপাত মধুর সুখে উন্মত্ত হইয়া দুষ্প্রবৃত্তির বশে চরিত্রকে কলুষিত করিয়া আপনাকে দূরে অতি দূরে নিয়া ফেলে। কিন্তু আপনাকে সুখী করিতে, শান্তি প্রদান করিতে; বিকাশের পথে লইয়া যাইতে, মানুষ নিজে নিজের চরিত্রের উন্নতি সাধনে যত্নবান নহে। নিজের ঐহিক পারত্রিক কোন দিকে দৃষ্টি নাই। সংসারের কুহকে পরিয়া স্ব স্ব কতব্য ভুলিয়া কত দূরে গিয়া পরিতেছে তাহার স্থিরতা নাই। পরম-কারুণিক-জগদীশ্বরের অপার করুণায় এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার আদিষ্ট কার্য্য না করিয়া কেবল নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ছুটা ছুটি করিতেছে। লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই উদ্দেশ্য বিহীন হইয়াই তাহাদিগের দশা এরূপ হইয়াছে। এ জগতে কেহ কাহারও নহে। যদি আপনাকে ভাল বাসিতে চাও "একা আসিয়াছ একা যাইতে হইবে" মনে করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও। ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধি পরিহার করিয়া জগতকে ভালবাসিতে শিখ। "তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা কেহ যেন

বিন্দু মাত্র দুঃখিত না হয়"। তাহা হইলে তুমি ভালবাসা পাইবে ও ভালবাসার অধিকারী হইবে। বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে সকল কর্ম্মফল সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত থাক ফল ভোগের আকাঙ্ক্ষা করিও না কার্য্য করিতে আসিয়াছ করিয়া যাও ভাল মন্দ তিনি দেখিয়া লইবেন এইরূপ করিলে তখন সুখ আসিবে, শান্তি পাইবে, শাশ্বত-আনন্দ-নিকেতনে নিরাপদে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ যে যেটী চায় সেটী পাইলেই তার তাতে শান্তি। কিন্তু সেই প্রার্থিত লক্ষ্য বস্তুটী কি তাহা স্থির না করিয়া যদি ভ্রান্তিবশে অপর একটী দিয়া তাহার অভাব পূরণ করিতে যাওয়া যায় তবেই সর্ব্বনাশ। পুষ্প-মাল্য ভ্রমে কৃষ্ণ-সর্পকে গলায় ধারণ করিলে দংশন জ্বালা ভোগ নিশ্চিতই। কিন্তু মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ-গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া দৃষ্টিকে এমনি সঙ্কীর্ণ বা অন্ধ করিয়া বসে যে, চেতন অপেক্ষা জড়কে অধিক ভালবাসে, টাকাকড়ি, জমী বাড়ী, এ সকলই অধিকতর প্রিয় বিবেচনা করে, আর চেতনের মধ্যে যে গুলি মাত্র নিজের ইন্দ্রিয় সুখের চরিতার্থতা সম্পাদন করে, তদ্‌ব্যতীত অন্য কিছুই আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। অথচ সেই টাকাকড়ি, জমীবাড়ী, পুত্রপরিবারই তাহার এমন অভাব বাড়াইয়া দেয় যে; সেই অভাব পূরণ করিতে করিতে তাহার জীবনান্ত হয়, তখন সে অশান্তির বিষজ্বালা অনুভব করিতে করিতে নরকের অভিমুখে ধাবিত হয়। দেখ! ধনবানের ধনই প্রিয়। তিনি জগতে কেবল এইটীকেই ভালবাসেন আর চেতনের মধ্যে দেখেন কেবল আপনাকে আর আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে। তাহার প্রিয়তম অর্থকে ব্যয় করিতে হইলে তাহার পাত্র কেবল তিনি এবং তাঁহার পরিবার-বর্গ, বসুন্ধরার ধনরাশি যেন তাঁহাদিগের জন্য! অথচ তাঁহার অভাবের নিবৃত্তি নাই। উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধারও বৃদ্ধি! সরার মত ধরাখানাও যেন আর কুলায় না। সে ক্ষুধার কি শান্তি আছে? সে আকাঙ্খার কি বিরাম আছে! এদিকে আবার দম্ভ অভিমান এরূপ অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, কেবল নিজের কয়েকটী পরিজন ভিন্ন আর যে কেহ খায়, আর যে কাহার অভাব আছে, আর যে কেহ কষ্ট পায়, আর যে কাহারও রোগ হয়, আর যে কাহারও ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে এমন বোধ হয় না। একটী

দীন দরিদ্র তাহার উদরান্নের সংস্থান নাই সে ভিক্ষাং দেহি! ভিক্ষাং দেহি! করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত কিন্তু তাহাকে এক মুষ্ট অন্ন দেওয়া দূরের কথা অনেক ধনীগণের নিকট ধ্বনিতে তাহাদিগের সে যন্ত্রনা দূর হইয়া যায়। এইত ভালবাসা! আর ইহার পরিণামও যে কি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি অতএব যেটী বাস্তবিক ভালবাসার জিনিস, যাহার নিকট ভালবাসা গেলে, ভালবাসাটী নিখুঁৎ হয়; সেই এক আত্মামাত্রকে ভালবাসিতে হইলে স্বার্থের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তখন পিপীলিকা অবধি রাজাধিরাজ সম্রাট্ পর্য্যন্ত, বধোদ্যত শত্রু অবধি প্রিয়তম পুত্র পর্য্যন্ত সকলেই তাহার পক্ষে সমান। বাহিরের উপাধি তাহার ভেদ-বুদ্ধি জন্মাইতে পারে না. তিনি সেই সর্ব্বভূত-গুহাশয় শ্রীহরিকে ভালবাসিয়া প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়ে যেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই দেখেন—ভগবানের অসীম করুণাধারা নিরত ক্ষরিত হইতেছে, বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়া তাহার করুণ হস্ত জীবের দিকে সর্ব্বদা পসারিত রহিয়াছে। সর্ব্বদা জীবের জন্য তিনি কাছে কাছে থাকিয়া ভালবাসিতেছেন আমরা এমনি মোহান্ধ যে তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। কখনও যদি সৌভাগ্য বশতঃ ভগবানের অনন্ত করুণার কণামাত্র উপলব্ধি করিতে পারি কিন্তু এ পাষাণ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহা কুট কুতর্ক জালে জড়িত করিয়া ফেলিয়া দিই। ভগবান দয়াময়। তিনি সর্ব্বদা জগতকে ভালবাসিতেছেন বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই সর্ব্বদা প্রত্যেকের নিকট বিবেক রূপে বসিয়া আছেন। প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য জানাইয়া দিতেছেন, আমরা মোহান্ধ! মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছি। প্রকৃত ভালবাসার স্বরূপ কি তাহা আমরা দেখিতে পাইনা। প্রকৃত প্রেমের মূর্ত্তি আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয় না। গুহক চণ্ডাল রামচন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলেন। হনুমান রামচন্দ্রের জন্য প্রাণকেও তুচ্ছ মনে করিয়াছিলেন। ব্রজ-গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। ভালবাসা ঐ খানেই ছিল ভালবাসা জিনিসটা কি তাহা তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন। সে অমৃতের স্বাদ তাঁহারাই ভোগ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। ভালবাসার প্রকৃত তথ্য যদি জানিতে হয় ঐ খানেই পাইবে। ভগবন্! সংসার জালে জড়িত হইয়া

বিষয়-বিষে মগ্ন হইয়া তোমায় ভুলিয়া রহিয়াছি। ষড়-রিপুর ভীষণ তাড়নায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিবেক বাণী শুনি নাই তাই আজ এই অবস্থা হইয়াছে। ভক্ত রাম প্রসাদ গাহিয়াছেন ;—

দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল মনোরমা॥

তাই বলিতেছি হে ভগবন্! স্বীয় বুদ্ধি-দোষে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। পতিত হইয়াছি। দীনবন্ধু তুমি! দয়াময় তুমি! পতিত পাবন তুমি!! এ পতিতকে এ কাঙ্গালকে কি দয়া করিবে না। আমি ছাড়িব না। দয়া করিতেই হইবে। তুমি যদি দয়া না কর তবে আমি আর কাহার নিকট দাড়াইয়া আর্ত্তনাদে আত্ম নিবেদন করিব। একবার শুন নাথ! তুমি শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ অবতারে স্বয়ং ভগবান রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় লীলা আস্বাদন করিবার শিক্ষা দিবার জন্য কত জীবকে, কত পাপীকে অবহেলে দর্শন দিয়া গিয়াছ, তোমার দয়ার সীমা নাই, তোমার ভালবাসার সীমা নাই। তোমার পতিত পাবন নাম শুনিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি, কাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করিও না নাথ! সংসারের দাবদাহে হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। করুণাময় হে! একবিন্দু করুণা প্রদান করিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করাও। জানিআমি, তুমি নাকি প্রেমময়! ভালবাসা তোমারই বস্তু। তাই আমাকে এক বিন্দু দাও প্রভো! তাই দিয়া আমি তোমরা পূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইব। এমন দিন কি আসিবে যে দিন তোমার রূপ-মাধুরি অবলোকন করিয়া আপনাকে চির কৃতার্থ মনে করিব। এস ভাই! দম্ভ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মাটীর মানুষ হইয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ভালবাসি। ভাইসব ইহাই কার্য্য। শান্তি পাইবে। মনের ময়লা ধুইয়া যাইবে। প্রাণ খুলিয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া সুখে সংসার করিতে পারিবে।

শ্রীঅতুল চন্দ্র দাস।

প্রার্থনা।

—:০:—

এস এস হরি, হিয়ার মাঝারে,
করুণা করিয়ে দীনে।
আমি, নয়ন ভরিয়ে, ওরূপ হেরিয়ে,
জুড়াই তাপিত প্রাণে॥
এ দীন জনার, কেহ নাহি আর,
তোমা বিনে দয়াময়!
দেহ, প্রাণ মন, সব সমর্পণ
করেছি রাতুল পায়॥
তোমারি করুণা, করিয়ে ভরসা,
দুঃখময় ভব বাসে।
যাপিছি জীবন, হে রাধারমণ!
ভুলিও না যেন দাসে॥
আমি, দারুণ ত্রিতাপে হইয়ে তাপিত,
ডাকিছি কাতর প্রাণে।
বারেক আসিয়া, স্নিগ্ধ কর হিয়া,
রাঙ্গা পা দু'খানি দানে॥
আমি, শান্তিময় প্রাণে, ভাবের প্রসূনে,
পূজিব পদার বিন্দ।
তাহে, জীবন আমার হইবে সফল,
পাইব পরমানন্দ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

শ্রীশ্রীরাধাপদে॥

—:০:—

কর কৃপা কেশব মোহিনী!
নাহি জানি স্তুতি ভক্তি ভ্রমেমুগ্ধ মোহউক্তি,
কিবা শক্তি ওরূপ বাখানি॥

থাকে যদি তব বর, লঙ্ঘে পঙ্গু ধরাধর,
বামনে ধরিতে পারে শশী।
তোমার করুণা হ'লে, চলে খঞ্জ অবহেলে,
দেখে গয়া গঙ্গা বারানসী॥

বোবায় বর্ণনাকরে, মূর্খে বেদ গ্রন্থধ'রে,
অনায়াসে পাঠে যোগ্য হয়।
তোমার কৃপায় মূঢ়, বুঝে তব তত্ত্ব গুঢ়,
তব কৃপাবিনে কিছু নয়॥

কি লিখিব তবরূপ, অনুপম অপরূপ,
রূপ অলঙ্কারে নাহি জ্ঞান।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষ হ'লে, জ্ঞানদাত্রি অবহেলে,
বন্দিপদ করি অনুমান॥

সাধু মুখে শুনিয়াছি, চিত্রপটে দেখিয়াছি,
তব ধ্যান ক'রেছি পঠন।
তেঁই সে তোমার চিত্র, দেখি ইচ্ছা করিমাত্র,
প্রবক্তের (আশাএবে) সিদ্ধের মতন॥

দয়াময়ী দয়া ক'রে, আর কবে অধমেরে,
দেখা দিয়ে পুরাইবে আশ।
যতদিন না পাইব, রাধা ব'লে ফুঁকারিব,
মম মন রহু তব পাশ॥

অতুলনা দুইপদ, জবা রক্ত কোকনদ,
তুলনায় কিছু হ'তে পারে।
পীতেতে হিঙ্গুল বেড়া, ভাঙ্গিল বর্ণেরচুড়া,
বর্ণ দেখি বর্ণসব হারে॥
চলনেতে চক্রবাক্‌, স্বমুখে সরায়ে বাক,
করে নিন্দা আপন চলনে।
নূপুর ঝঙ্কারে ভৃঙ্গ, আপনি মানয়ে ভঙ্গ,
পায় লাজ আপন গুঞ্জনে॥
তাহাতে মগরা রাজে, কিবা অপরূপ সাজে,
উরু গুরু রম্ভা তরু প্রায়।
মৃগেন্দ্র নিন্দিত কটী, নীল পট্ট পরিপাটি,
কিঙ্কিনী সুরুচী বেড়া তায়॥
চম্পক বরণ দেহ, সুন্দর বরণ এহ,
চম্পকে চম্পক তুল্য হয়।
উরুতে কাঁচলীবেড়া, তদুপরি মণি ছড়া
শোভিত সুন্দর অতিশয়॥
কম্বু জিনি তব গ্রীবা, মুখরুচী পদ্ম শোভা,
অধরোষ্ঠ পক্কবিম্ব প্রায়।
দাড়ীম্বের বীজসম, দন্ত পংক্তি অনুপম,
কুন্দ পুষ্পসম হাস্য তায়॥
কোকিলের কলধ্বনি, তব কণ্ঠ সম ধ্বনি,
নাসা শুক চঞ্চুর সমান।
নেত্র মৃগনেত্র সম, তাহে কজ্জলানুপম,
মুখ চাঁদে কলঙ্কানুমান॥
কপালে সিন্দুরবিন্দু, শোভে প্রায় পূর্ণ ইন্দু,
গৃধিনী জিনিয়া কর্ণদ্বয়।

বৃষ-পুচ্ছ সমতায়, দুকুণ্ডল ঝলকায়,
দেখিতে সুন্দর অতিশয়॥
মাথে সীঁথি কি বাহার তায় মালতির হার,
বেনী ধরে ফণা ফণী প্রায়
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী, রাধেকৃষ্ণ প্রণয়িণী,
ইন্দ্র তব ঐ পদ চায়॥

শ্রীইন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য।

শ্রীনন্দদাস সাধু।

সাধুমোহান্তের চালচলন কার্য্য কলাপ আচার পদ্ধতিতে একটু বিশেষত্ব থাকে। সে সব দর্শনে সুশীল নিরীহ ভাগ্যবান্ মনুষ্যেরা মুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে প্রীতি ও পূজা করে। সাধু সুধানন্দের আকর স্বরূপ চন্দ্র; তদিতর নরনারী সব দুই শ্রেণীর কতকগুলি চকোর, কতকগুলি পেঁচক। চাঁদে পাইয়া চকোর উল্লাসিত হন এবং তাঁহাকে ঘেরিয়া সুধাপান করেন; পেঁচক চাঁদের কিরণে গাত্রজ্বালা বোধ করে; তাই আঁধারের আশ্রয়ে বল পাইয়া বিকটস্বরে উপহাস করিয়া চাঁদের কলঙ্ক গায়। কিন্তু পেঁচক অত উর্দ্ধে চন্দ্রলোকের দিকে উঠিতে পারে না যে চন্দ্রকে ভীষণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিবে, সে কেবল নিজের অনলে নিজে পুড়িয়া মরে। সাধুদ্বেষিকে পাষণ্ড বলে। যেখানে সাধু আছেন, সেখানে অন্ততঃ দুই চারিজন পাষণ্ডও থাকেন। পাষণ্ডকে কেহ ঘৃণা করিবেন না। পাষণ্ডের পাতাচাপা কপাল থাকে। সাধু-সোণার পরীক্ষার নিকষ পাথর পাষাণ্ড। সুতরাং সঙ্গ-ছাড়া হয় না। শ্রীভগবান সাধুর প্রতি কৃপালু হইয়া তাঁহার কল্যাণার্থে আঁধারে ক্রোড়ে চন্দ্রবৎ পাষণ্ড সমাজে সাধুকে পাঠান। লৌহদণ্ডের আঘাত ব্যতীত যেমন চকমকির স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় না, পাষণ্ডের সংঘর্ষ বিনাও সাধুর পবিত্র মহিমার স্নিগ্ধ কিরণ বিকাশিত হয় না। কংস না থাকিলে কৃষ্ণলীলা হীনপ্রভা হইয়া পড়িত। দন্ত অতি শুভ্রবস্তু, অঙ্গার মলিন, কাল; কিন্তু অঙ্গার দন্তের কোনও অনিষ্টসাধন করিতে

পারেনা, বরং দন্তকে বেশ পরিষ্কার করে। তদ্রূপ পাষণ্ডমার্জ্জনে সাধুর বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। অগ্নিতাপে যেমন সুবর্ণ সমুজ্জ্বল হয়, পাষণ্ডের ঈর্ষ্যানলে সাধুদগ্ধ হইয়াও সমধিক ঔজ্জ্বল্যগুণ প্রাপ্ত হন। শ্রীনন্দ সাধুর চরিত্র ইহার এক সুবর্ণ দৃষ্টান্ত।

শ্রীনন্দ দাস সাধু বরনিতে বাস করিতেন। (বরণি কোথায় জানা যায়না, তবে বোর্ণিও হইতে পারে।)। ইনি বৈষ্ণব সেবায় অতি তৎপর ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। কয়েকটী নিন্দুক পাষণ্ড সতত তাঁহাকে দ্বেষ করিতেন। তাহাদের মধ্যে দুঃশীল এক ব্রাহ্মণের দুষ্টভাব এই সাধুর বিরুদ্ধে বড় বেশী মাত্রায় চড়িয়াছিল। দৈবাৎ একদিবস এই ব্রাহ্মণের একটি বাছুর (গোবৎস)। মরিল তখন ব্রাহ্মণ ঐ মৃতবৎসকে গোপনে নিয়া শ্রীনন্দদাসের গৃহ প্রাঙ্গণে রাখিয়া আসিল এবং নিজদেশভুক্ত পাষণ্ডদের দ্বারা জনরব তুলিল যে, ব্রাহ্মণের বাছুর কোনক্রমে সাধুর দ্বারে গিয়াছিল, সাধু বিরক্ত হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। কোন কোন দুষ্ট অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়া ফেলিল "আমরা সাধুকে নিজহস্তে বাছুর হত্যা করিতে দেখিয়াছি।" জনরব শুনিয়া গ্রামের বহু মান্য গণ্য লোক সাধুর গৃহাঙ্গণে সমবেত হইলেন; গোবৎসের মৃতদেহ তথায় পতিত আছে দেখিয়া সবে সন্দিগ্ধচিত্তে শ্রীনন্দদাসজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সাধু ভাবে ভাবে নিন্দুকদের এই কুচক্র বুঝিতে পারিলেন। ভদ্রলোক সবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, এই গোবৎস কিরূপে মরিল?"—এই প্রশ্ন শুনিয়া সাধুর মুখমণ্ডলে যেন এক বৈদ্যুতিক দ্যুতির আবির্ভাব হইল। তিনি ওর্জস্বিনী ভাষায় উত্তর করিলেন,—এই বাছুরকে মৃত বলে কে?—এ যে নিদ্রাবিষ্ট আছে! তোমরা যদি বল, এখনই উঠাইয়া দিতেছি, সে নিজগৃহে চলিয়া যাউক্।"—এই বলিয়া তিনি দুই তিন তুড়ি দিয়া আদেশ করিলেন,—বৎস, আর ঘুমিওনা, এখন ঘুম ভেঙ্গে উঠ,—এখন যেয়ে একটু দুধ পিয়।"—বলিতেই, বাছুর উঠিয়া লম্ফ দিয়া চলিল। সকল লোক দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিতে লাগিল। শ্রীভগবান্ ভক্তের মান এই ভাবে রক্ষা করেন। সাধুর বাক্য কভু মিথ্যা হয় না। কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"—শ্রীভগবানের অপার

অনুগ্রহে মৃত জীয়াইয়া দেওয়া ভক্তের পক্ষে বেশী কঠিন কর্ম্ম নয়। ভক্তের জন্য ভগবান্ সবই করেন। সেই ব্রাহ্মণ জীবন্মৃত হইলেন। পাষণ্ড সবে সাধুর প্রভাব দেখিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার পদানত হইল।

দেবদ্বিজে—ভক্তে যাহারা অসূয়া করেন, এই সৎসঙ্গ সূত্রে, পাষণ্ড হইলেও, শ্রীভগবান্ পতিতপাবন কিনা, তাই, তিনি তাহাদেরও কল্যাণ বিধান করেন, এককালে উপেক্ষা করেন না। কিন্তু ভক্তবৈষ্ণব দ্বেষ ঘটিত ক্লেশলাঞ্ছনাদি পাষণ্ডের পক্ষে বড়ই দুর্ব্বিষহ। সুতরাং ভক্তে দ্বেষ না করিয়া পূজাচর্য্যা করাই প্রশস্ত ও শান্তি সুখকর; কারণ তাহাতে চিত্ত অমৃতে পরিব্যাপ্ত হয়, নিরানন্দ স্পর্শ করিতে পারেনা।

আবার দেখুন, এই পাষণ্ডগণের জঘণ্য ঘৃণ্য ব্যবহার দ্বারা সাধুর মহিমা বিঘোষিত হইল। অতএব ভক্তি মহিমা প্রোজ্জ্বল করিবার জন্যই প্রভু নিজ দাসের কাছে কাছে পাষণ্ডের ঘর করান।

শ্রীবৈষ্ণবানুগ—

শ্রীকালীহর দাস বসু।

সাধন-তত্ত্ব বিচার।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশাখা কহিছে বাণী শুন ওহে চিন্তামণি!
কেন আর করহে ছলনা।
তুমি যতই লুকাতে চাও ততই বেকত হও
তবু তোমার স্বভাব ছাড়না।

তবু বিদগ্ধ রাজ চতুরতা খেলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বেগতিক দেখিয়া শেষে সমস্ত অকপটে বলিয়া ফেলিলেন, মিষ্ট কথায় মুখরাকে নিরস্ত

করিতে চেষ্টা পাইলেন। তোমার নিকটে লুকোচুরি চলে না; তুমিই ত নাটের গুরু, আমি লুকাতে গেলেও তুমি প্রেমবলে ধরিয়া ফেল, তুমি নিত্যলীলার নিত্যসিদ্ধ পরম অন্তরঙ্গা বিশাখা সখী আমাদের সমস্ত তত্ত্ব-লীলা তোমাকে লইয়া, তোমাকে সেই নিগূঢ় রহস্য বলিতে বা সেইরূপ দেখাইতে কোন বাধা নাই ; এই যে গৌর অঙ্গ দেখিতেছ, উহা আমার নিজস্ব বস্তু নহে, উহা হেমবরণী শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গস্পর্শে উদ্ভূত হইয়াছে। অমি কে তাহা আর পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু শ্রীমতী কৃষ্ণ-মনমোহিনী শ্রীনন্দদুলাল ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি সেই প্রেমময়ীর ভাবে আত্মমন আরোপ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এইরূপ ভাব ও কান্তিযুক্ত হইয়াছি। "রাধাদেহরুচাভ্যুতং কৃতিমিদং শ্যামোঽপি গৌরঽভবং' ইহাই অত্যদ্ভুৎ হইল যে শ্রীরাধিকার দেহ কান্তিতে শ্যামসুন্দর ও গৌরবর্ণ হইলেন।

"ভাবিতে ভাবিতে রাধা, ভাবেতে হয় কৃষ্ণ রাধা"।

এই বলিয়া রসরাজ মহাভাব দুই শ্রীমূর্ত্তি ও অদ্ভুত মিলনে একীভূত মূর্ত্তি দেখাইলেন। রায় রামানন্দ সে উচ্ছ্বসিত প্রেমতরঙ্গ সামলাইতে পারি-লেন না, মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন!

কেমন এখন শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝিলে? শাস্ত্রযুক্তি দূরের কথা একেবারে স্বয়ং তিনি রাসয়নিক প্রক্রিয়া (Chemical analysis) ক'রে বুঝাইয়া দিলেন; তবু যিনি না বুঝিবেন, তাঁহাকে ভগবান এখন বুঝাইবেন না বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তেহোঁ যে করেন বস্তু সেই বস্তু সার॥

হরিদাস। শ্রীগুরু যখন স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ, তখন আবার শ্রীরাধামাধবের প্রেষ্ঠ বলিবার প্রয়োজন কি?

গুরুদেব। বৎস, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন একমাত্র ভক্তি সাধনে লভ্য। ভক্তি বহুবিধ, তাহা পরে আলোচিত হইবে। তন্মধ্যে রাগভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা

শুদ্ধ প্রেমিক ব্রজবাসীগণের নিজস্ব বস্তু। এবিষয় বিস্তারিতভাবে পরে আস্বাদন করা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরস আস্বাদন এই রাগমার্গে ভিন্ন অন্য প্রকারে সংঘটিত হয় না। মহাপ্রভু নিজে বলিয়াছেন—

কর্ম্ম জপ যোগ জ্ঞান　　বিধি ভক্তি তপ ধ্যান
ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্ল্ভ।
কেবল যে রাগমার্গে　　কৃষ্ণ ভজে অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

এই রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন করিতে হইলে শুদ্ধ মধুর ব্রজভাবে অর্থাৎ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন, পতি, পুত্র, বা সখা ভাবে, (ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র থাকিবে না) ভজন করিতে হয়, ব্রজবাসীদের সেই সম্বন্ধ অনুকরণে গুরুরূপা সখীর অনুগা হইয়ে ভজন করিতে হইবে।

সখীর অনুগা হ'য়ে　　সিদ্ধসেবা লব চেয়ে
ইঙ্গিতে করিব সব কাজ॥

ইহাতে স্বাধীনভাবে ভজনে সিদ্ধিলাভ হয় না।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

সুতরাং রাগানুগপন্থী সাধকগণেরা তাই অভিন্নস্বরূপ হইলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তির বামভাগে গুরুরূপা সখীর পৃথকত্ব ধ্যান ধারণা করেন। সেই জন্য "আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ" স্থানে গোস্বামীপাদেরা "মাং" অর্থে মদীয়ং প্রেষ্ঠা করিয়াছেন।

হরিদাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুরূপা বিশাখাসখীরূপে প্রকট হইবার উদ্দেশ্য কি?

গুরুদেব। শ্রীবিশাখাসুন্দরী মূল গুরু, তিনিই শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমবিলাস-শিক্ষয়িত্রী, সুতরাং সকলেরই গুরু এদিকে মহাপ্রভু ও জগৎগুরু। এই রাগভক্তির প্রবর্ত্তক স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনি, প্রকটলীলায় এই রাগভক্তির অবতারণা করেন।

যে লাগি (কৃষ্ণ) অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তিলোক করিতে প্রচারণ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম॥

এই রাগমার্গ ভজনের সূত্রকর্ত্তা গোলকবিহারী শ্রীনন্দনন্দন দ্বাপরের শেষ-ভাগে ইহার প্রবর্ত্তন। আবার কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া, সেই সূত্রকর্ত্তা শ্রীনন্দদুলাল শচীর দুলাল হইয়া উক্ত সূত্রের ভাষ্যকর্ত্তা হইলেন। কেবল লোকশিক্ষাই এ স্থলের উদ্দেশ্য, সুতরাং তিনিই লোক গুরু কিনা বুঝ। তিনি ঐ সমস্ত নিগূঢ় সূত্রের বিমল ভাষ্য করিলেন এবং কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইলেন।

এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

ব্রজভাব শ্রীজেন্দ্রনন্দনের নিজস্ব বস্তু, তাহা তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেহ প্রচার করিতে সক্ষম নহেন। তাই আবার যথাসময়ে কলির জীবের প্রতি সদয় হইয়া করুণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া নিগূঢ় ব্রজরসমাধুরী জীবকে শিক্ষা দিলেন।

যে সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ জীবের হয় জ্ঞান॥

এখন বুঝিলে, কিজন্য মহাপ্রভুকে জগদ্‌গুরু হইতে হইয়াছে। অতএব আইস আমরা প্রেমানন্দে সেই পরম দয়াল জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে নমস্কার করি—শ্রীগৌরাঙ্গদেব জয়যুক্ত হউন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

বৎস! দেখিয়া সুখী হইলাম, আজকাল উচ্চ ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় যে অবশ্য কর্ত্তব্য সেভাব অনেকটা আসিয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব হইতে এই তত্বটী আরও বিকশিত হইয়াছে; পরমহংসদেবের শিষ্যগণ তাঁহাকে "ঠাকুর ভগবান" বলিয়াই জানেন। ঠাকুরের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"The soul can *only* receive impulse from another soul and from nothing else. The person from whose soul such impulse comes is called the Guru.

ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অন্য কোথাও মিলেনা, কেবলমাত্র আত্মায় আত্মায় সঞ্চারিত হয়। যে উন্নত ব্যক্তির আত্মা হইতে এই ধর্ম্মভাব অনুক্রমিত হয় তিনিই গুরুদেব।

হরিদাস। তাহা একরূপ বুঝা গিয়াছে, কিন্তু "যেই গুরু সেই কৃষ্ণ সেই সে গৌরাঙ্গ। নিষ্ঠা করি ভজ মন গুরুপদারবিন্দ"॥ এই মহাবাক্যের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস আসিয়াও আসিতেছে না। একবার বিশ্বাস আইসে, কিন্তু পরক্ষণেই বিচারবুদ্ধি আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়।

গুরুদেব। ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিশেষ দোষ অজ্ঞানতা জীবে আদিম অবস্থা এরূপ কুজ্ঞান অপেক্ষা তাহা শুভঙ্কর, তখন জীব সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্যে বিশ্বাস হারায় না, বরং অন্ধ হইয়া তাহাতেই লাগিয়া থাকে। তৎপরে জ্ঞানাভিমান, ইহাই সর্ব্বনাশের মূল, প্রকৃত জ্ঞান হইল না অথচ জ্ঞানগরিমা আসিয়া স্বাভাবিক নির্ভরতার ভাবটীকে তাড়াইয়া দিল; জীব তখন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হইলেন, ধরা সরা দেখিতে লগিলেন, সর্ব্ববিষয়ে সংশয় কুতর্ক, সংশয় বুদ্ধিকে আরও তমসাচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখন বিনাশের পথ নিকটবর্ত্তী হইল, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। মহাজনবাক্যে বিশ্বাস হারাইয়া জীব উদ্ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিল, ইহাই মানবজীবনের অমাবস্যা রজনী। কালক্রমে সদ্গুরুরূপ চন্দ্রের উদয় হইলে শুক্লপক্ষের রজনীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে

তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতে থাকে; আবার পূর্ণিমার উদয় হয়, তত্ত্ব জ্ঞানালোকিত সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ ও বিমল হইয়া যায়। শিশু সরলমতি অজ্ঞান, পিতামাতাকে দেবতা বলিয়া জানে, তাঁহারা প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিকে "ঠাকুর" বলিয়া দিয়াছেন, শিশু অটলভাবে তাই ধরিয়া রহিয়াছে, সে কোন বিচারকে আহ্বান করিতেছে না, কিন্তু যেমন জ্ঞানের মুখোস পরিয়া কুজ্ঞান-কৈতব তাহার স্কন্ধে ভর করিল, অমনি সেই পরমারাধ্য পিতামাতা "বৃদ্ধ বলদ (Old fools) হইলেন, আর চিন্ময় শ্রীবিগ্রহ আবার জড় পাষাণ হইলেন। আবার যখন ভগবৎকৃপায় জ্ঞানাঞ্জন শলকা দ্বারা তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইল তখন আবার বুঝিল—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মং পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥
যদ্‌ গর্ভে জায়তে লোকো যস্যঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদ্দীশ্বরী মাতা নাস্তি মাতা সমো গুরুঃ॥

সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন—

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ॥

তখন তিনি সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানকে বীজস্বরূপ দেখিতেছেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মনেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি সর্ব্বভূতে ভাগবৎস্বরূপ দর্শন করেন এবং সেই ভগবানে সর্ব্বভুত অবস্থিত আছে দর্শন করেন তিনিই উত্তম ভাগবত।

ক্রমশঃ

শ্রীবামাচরণ বসু।

গান।

—ঃ০ঃ—

কি বলে ডাকিব, ডাকিতে জানিনা,

কি বলে ডাকিলে পাইবে শুনিতে,

ডাকিবার মত, ডাকিতাম যদি

দেখা দিতে হরি হাসিতে হাসিতে॥

ডাকিবার মত যে তোমায় ডাকে,

তারে তুমি দেখা দিয়ে থাক ডেকে,

ডাকিতে পারিনে, বলে কি হে নাথ!

পাবে না দাসী শ্রীপদ হেরিতে?

কি বলে ডাকিলে শুনিবারে পাও,

প্রাণে প্রাণে আমায় ডাকিতে শিখাও,

(আমি) তাই বলে ডাকি, হে কমল আঁখি!

(তুমি) যা ব'লে আমায় শিখাবে ডাকিতে॥

অন্তে যবে দীনা মুদিবে নয়ন,

হেরে যেন তোমায় হে মন মোহন!

দাও দেখা দাও, বাসনা পুরাও

হৃদয় বিহারি (সদা) বিহর হৃদেতে॥

জ্ঞানদা দাসী।

মিছা সংসার।

—:o:—

লোকে শুধু কয়, 'মোর' উহা হয়,
কেমনে এরূপ কয়।
পরাণ ফুরালে, রবে কোন স্থানে,
কোথা রবে বুলি, হায় ॥
কোথা রবে তুমি, কোথা রব আমি,
কোথা রবে এ সংসার ;
তাই বলি ভাই, এস সবে গাই
হরি নাম হয় সার ॥
হরি নাম বিনা, মুখে কিছু আনা
উচিত না হয় মোর।
কিছু নাহি রবে, ত্যজিলে এ ভবে
রবে শুধু "হরি" মো'র ॥
হেন হরি ভাই. ত্যজি বারে চাই
ধিক মোদের জীবন।
ত্যজি বারে চাই, "মোর" বুলি ভাই
তবে পাব তাঁ'র মন।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দত্ত।

আষাঢ় মাস, ১১শ সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা

ত্বংহি সর্ব্বেশ্বর স্বামিন্ সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল।
প্রণমামি ভবন্তং মে শান্তিং ভক্তিং প্রযচ্ছতু ॥

হে জগত স্বামিন্! তুমিই জীবের একমাত্র গতি, তুমিই সকল জীবের একমাত্র কর্ত্তা, এবং তুমিই মঙ্গল স্বরূপ। তোমাকে বার বার নমস্কার করি, তুমি দয়া করিয়া আমাকে শান্তি ও ভক্তি প্রদান কর।

হে চিন্তামনে! দেখ দেখ তোমার সাধের বিলাস ভূমি, তোমার নিত্যলীলা-স্থান মানব হৃদয়, আজ কুচিন্তা কুহকিনী কোথায় লইয়া গিয়া কি অবস্থা ঘটাইয়াছে। তোমার বড় সাধের—বড় প্রিয় মানব হৃদয়ের এইরূপ অবস্থা ভাবিতে গেলে আর কিছুই থাকেনা; মনপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কুচিন্তার ফলে এক এক সময় এমন হইয়া পড়ি যে, কোন কার্য্যই স্থির চিত্তে করিতে পারিনা। এক ভাবি আর হয়। প্রতি কার্য্যেই দেখিতেছি যে কোন একটী বিষয়েতে ও আমার প্রভুত্ব খাটেনা, যে কার্য্যটাই তোমাকে ভুলিয়া অহঙ্কারের দ্বারা চালিত হইয়া করিতে যাই, তাহাতেই অমনি শত শত প্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তোমাকে ভুলিবার ফল বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয়, কিন্তু এমনই মায়ায় মুগ্ধ যে, তথাপিও সেই কুচিন্তাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছিনা। তাই তোমার শরণ লইলাম। হে শরণাগত বৎসল! শ্রীচরণাশ্রিত জনের

মিছা সংসার।

—:০:—

লোকে শুধু কয়, 'মোর' উহা হয়,
কেমনে এরূপ কয়।
পরাণ ফুরালে, রবে কোন স্থানে,
কোথা রবে বুলি, হায়॥
কোথা রবে তুমি, কোথা রব আমি,
কোথা রবে এ সংসার ;
তাই বলি ভাই, এস সবে গাই
হরি নাম হয় সার॥
হরি নাম বিনা, মুখে কিছু আনা
উচিত না হয় মোর।
কিছু নাহি রবে, ত্যজিলে এ ভবে
রবে শুধু "হরি" মো'র॥
হেন হরি ভাই. ত্যজি বারে চাই
ধিক মোদের জীবন।
ত্যজি বারে চাই, "মোর" বুলি ভাই
তবে পাব তাঁ'র মন।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দত্ত।

ভক্তি।

আষাঢ় মাস, ১১শ সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা

ত্বংহি সর্ব্বেশ্বর স্বামিন্ সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল।
প্রণমামি ভবন্তং মে শান্তিং ভক্তিং প্রযচ্ছতু ॥

হে জগত স্বামিন্! তুমিই জীবের একমাত্র গতি, তুমিই সকল জীবের একমাত্র কর্ত্তা, এবং তুমিই মঙ্গল স্বরূপ। তোমাকে বার বার নমস্কার করি, তুমি দয়া করিয়া আমাকে শান্তি ও ভক্তি প্রদান কর।

হে চিন্তামনে! দেখ দেখ তোমার সাধের বিলাস ভূমি, তোমার নিত্যলীলা-স্থান মানব হৃদয়, আজ কুচিন্তা কুহকিনী কোথায় লইয়া গিয়া কি অবস্থা ঘটাইয়াছে। তোমার বড় সাধের—বড় প্রিয় মানব হৃদয়ের এইরূপ অবস্থা ভাবিতে গেলে আর কিছুই থাকেনা; মনপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কুচিন্তার ফলে এক এক সময় এমন হইয়া পড়ি যে, কোন কার্য্যই স্থির চিত্তে করিতে পারিনা। এক ভাবি আর হয়। প্রতি কার্য্যেই দেখিতেছি যে কোন একটী বিষয়েতে ও আমার প্রভুত্ব খাটেনা, যে কার্য্যটাই তোমাকে ভুলিয়া অহঙ্কারের দ্বারা চালিত হইয়া করিতে যাই, তাহাতেই অমনি শত শত প্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তোমাকে ভুলিবার ফল বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয়, কিন্তু এমনই মায়ায় মুগ্ধ যে, তথাপিও সেই কুচিন্তাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছিনা। তাই তোমার শরণ লইলাম। হে শরণাগত বৎসল! শ্রীচরণাশ্রিত জনের

প্রতি দয়া করিয়া কুচিন্তাকে দূর করিয়া দাও। তোমার কৃপায় কুচিন্তা, কুভাব ও নানা প্রকারের কুকর্ম্ম সকল দূর হইলে তুমিই যে আমার আপন তুমিই যে আমার প্রাণের প্রাণ এবং একমাত্র তুমিই যে আমার, আমার বলিবার পাত্র তাহা বুঝিয়া তোমারই চিন্তায় চিত্তকে সদানন্দে রাখিতে সমর্থ হইব।

দেব! মোহের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া একমাত্র তোমার কৃপাভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই। আমি মোহের মুখে পড়িয়া নিরন্তর কষ্ট পাইতেছি, একবার কৃপাদৃষ্টি কর? সুদারুণ কুম্ভীরের কবল হইতে যেমন কৃপা করিয়া গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াছিলে, তদ্রূপ মোহ কুম্ভীরের হস্ত হইতে আমার মন মাতঙ্গকে রক্ষা কর। তোমা ভিন্ন আর কাহার শরণ লইব, কে দাসকে এঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে?

দীনবন্ধো! দে'খ দে'খ তোমার নামে যেন কলঙ্ক না হয়, আমার ন্যায় ভাব-ভক্তি-হীন দীন আর জগতে পাইবেনা। তাইবলি দয়া করিয়া ভাব দাও, সর্ব্বদা যেন তোমার ভাবে মাতিয়া থাকিতে পারি। যখন যেখানে যে ভাবেই থাকিনা কেন, তোমার ভালবাসা, তোমার অপরিসীম দয়া, তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ত যেন না ভুলি। শান্তিময়! আর ভুলাইয়া রাখিওনা, অশান্তি অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া তোমার ধনের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা একবার দেখ। বাঞ্ছাকল্পতরু! আমি তোমার নিকট ধন, জন, রূপও ঐশ্বর্য্যাদি চাহিনা। চাই কেবল তোমার দেখা। দয়া করিয়া দীনের এই বাসনা পূর্ণ করিয়া অজ্ঞানন্ধকার নাশ করিয়া দাও। আজ মায়ারপীড়নে পীড়িত দীনহীন ইহাই প্রার্থনা করিতেছে।

দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

—:০:—

(১)

যাহার শাসন বলে, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা চলে,
করিতে (এ) বিশাল ধরা রক্ষা।
তাঁহারে করিগো স্মরণ।

(২)

যাঁ'র আদেশানু ক্রমে,　　　গ্রহাদি ঢাকে এ ভূমে,

চিরকাল করিতে হে রক্ষা।

তাঁহার ধরিগো চরণ।

(৩)

যাঁহার ক্ষমতাধিনে,　　　বায়ু বহে সর্ব্বক্ষণে,

করিতে হায়, হিতসাধন ।

তাঁহারে করিগো ভজনা।

(৪)

যাঁহার আদেশ জন্যে,　　　মেঘ-বারি আরো অন্যে,

বর্ষে করিতে হিতসাধন।

তাঁহারে করিগো বন্দনা।

(৫)

যাঁহার ইচ্ছানুক্রমে,　　　সাগর পর্ব্ব ভূমে,

হয় গো হায়, অক্ষম রূপে।

তাঁহার ধরিগো চরণ।

(৬)

সৃজেছেন পশুপক্ষি,　　　বৃক্ষ ধান্য পূর্ণ-লক্ষ্মী,

করেছেন বহু বহু রূপে।

তাঁহারে করিগো স্মরণ।

(৭)

সৃজেছেন যিনি শস্য,　　　লৌহ আদি কত ভস্ম,

কহিতে গো আসাধ্য আমার।

তাঁহারে করিগো বন্দনা।

(৮)

হায়! দুঃখনাশ কারি　　　ভূরি, ভূরি গুণ ধারি—

কেগো, বন্দি যথা সাধ্য মোর।

তাঁহার করিগো সাধনা।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত।

দয়াল হরিও দুর্লভ দেহ।

—— ঃ০ঃ ——

মন তুমি বিনাশ্রমে একটী সুন্দর বাসস্থান পাইয়াছ। বাসস্থানটি নশ্বর হইলেও উপাদেয় বলিতে হইবে, কেননা এই মানব দেহে অবস্থান ব্যতিত পুরুষার্থ লাভের প্রধান সাধন আর কিছুই নাই। কিন্তু এমন দেহ তোমায় অল্প আয়াসেও প্রস্তুত করিয়া লইতে বা কাহারো নিকট প্রর্থনা করিয়া লইতে হয়না। এমন একটী দাতা আছেন, তিনি আপন ইচ্ছায় সুন্দর দেহ মন্দির প্রস্তুত করিয়া অকাতরে তোমায়দিয়ে দেন, তুমি সেই ঘরে থাকিয়া তাহার গুঢ় তত্ত্ব না করিয়া, নানারূপ ভোগ সুখে পরমানন্দে কালাতিপাত করে, কিন্তু গৃতীতার কর্ত্তব্য যে দাতার যশঃ করা, সেটা তোমার একদিনও হইলনা। যাইহউক্ তোমার কৃতঘ্নতা ত আছেই, এক্ষণে দাতার কথা, দাতার সেই দয়ার কথাই বলি। সেদাতা বড়ই দয়াল, তাঁর মত দয়ালু আর কেহই নাই, তিনি তোমার বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াদিলে তুমি সেই গৃহের যথেষ্ট কর্ত্তব্য পালন না করিয়া অকারণ সময় অতি বাহিত কর, কিন্তু সেই গৃহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী সুতরাং সে অনিত্য সে নষ্ট হইয়া গেলে তুমি আর তাহাতে থাকিতে পারনা। তুমি গৃহ হইতে নিস্কাশিত হইয়া গৃহত্যাগী হইলে তিনি তোমাকে নিরাশ্রয় দেখিতে পারেন না, তৎক্ষণাৎ অন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তোমার বাসস্থান করিয়াদেন। দেন বলিয়া কি একবার, না দুইবার? পর পর যতবার তোমার ঘর নষ্ট হইবে, তিনি ততবারই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া থাকেন। শুনিতে পাই তিনি চৌরাশী লক্ষবার তোমার হৃদ মন্দির গড়িয়া দিতে বিরক্ত হননা। চৌরাশী লক্ষের মধ্যে, তোমার অবস্থান জন্য বিংশতি লক্ষবার বৃক্ষরূপ জড়দেহ প্রস্তুত করিয়াছেন, তৎপরে নয় লক্ষবার জলচর দেহ, তাহার পর খেচর দেহ দশ লক্ষবার, তদনন্তর কীটদেহ একাদশলক্ষও পশুদেহ ত্রিশ লক্ষবার প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু আশী লক্ষবার পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি নানা যোনি ভ্রমন করিয়া, পরিশেষে চারি লক্ষবার তোমার মানব দেহ প্রাপ্ত হয়। এই মানব দেহ বহু জন্মের পর প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই জন্য পণ্ডিতগণ মানব

দেহকে দুর্লভ দেহ বলিয়া থাকেন। এই দুর্লভ দেহ যে কি জানি কখন পতন হইবে, তাহার কোন স্থির নাই, সেই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিতে মৃত্যুর বহু পূর্ব্ব হইতেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিতে ভক্তি (ভোগ) ভিন্ন মুক্তির উপায় নাই, মুক্তির উপায় কেবল এক মানব দেহেই হইয়া থাকে। সেই মুক্তির ভক্তি হইলেই হয়, ইহা সেই দাতা নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার পদে, সেই দাতার পদে, সেই দাতা আর কে? হরি। সেই হরির পদে ভক্তি না করিয়া, ভক্তি বিনিময়ে মুক্তি না কিনিয়া, কেবল পশুর ন্যায় চারি লক্ষবার ভোগেই কাটাইয়াদিলে, সেই বৃক্ষাদি নানা যোনিতে চৌরাশী লক্ষবার জন্ম হইয়া পুনঃ পুনঃ নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। সে ক্লেশের কথা আর বিন্যাশ করিয়া বলিব কি? মন! তাহাত সাক্ষাতেই দেখিতেছ। সেই পশু, পক্ষি, কীট, পতঙ্গাদির ক্লেশত স্বচক্ষেই দেখিতেছ, তবে আর কেন ইতস্তত হও? আর কেন হরির চরণে শরণ লইতে অলস কর? দেখ, এই দেহ তোমার কি জানি কখন পতন হইবে, ইহা চিরকাল থাকিবার নহে, অতএব সময় থাকিতে পুরুষার্থ লাভে যত্নবান্ হও।

হরি কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা হরিনাম উচ্চারণ, হরি পূজায় যত্নবানও হরির স্তব স্তুতিতেই মনোনিবেশ করিলে ভক্তির সঞ্চার হইবে, ভক্তি লাভ হইলে মায়া পিশাচীর ত্রিগুণ রজ্জু ছিন্ন করিয়া, মুক্তির প্রসস্থ পথে বিচরণ করিবে এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ হইতে নিস্কৃতি হওত, কৃতান্তের দর্প চুর্ণ করিয়া, শ্রীহরির চরণ সেবার নিত্যদাস সাজিয়া নিত্য মুক্ত হইবে। দেখ হরি! তোমার চরণে আমার একটী প্রার্থনা। আমি অনেক ঘুড়িলাম। আর ঘুড়িতে পারিনা, দয়াময়! একবার দুইবার নয়, আশীলক্ষবার কীট পতঙ্গাদি নানা দেহে ঘূড়িয়া বিষম যাতনা ভোগ করিয়াছি, তার পর চারি লক্ষবার মানব দেহের অধিকার, তাহাতে যে কতবার ঘুড়িয়াছি বা আর কতবার ঘূড়িব, তাহার কোন স্থির নাই। কি জানি যদি মানব দেহে ভ্রমণ করার নিয়মটুকু এই বারেই ফুরাইয়া গেল, তাহা হইলে আমি কি আবার আশীলক্ষবার ঘুড়িব? তাহা আর পারিবনা হরি, ঘুড়িতে আমার বড়ই কষ্ট হয়। মানুষে যেমন হাটে হাট করিতে যায়, কিন্তু হাটে গিয়া নানা লোকের সহিত আলাপও বিবিধ

দ্রব্য দর্শনে আনন্দে সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়, কিন্তু বাড়ি ফিরিবার কালে মনে হয় আর পথ পর্য্যটন সহ্য হয় না, কোনরকমে আমায় হাটে আসিতে না হইত, তাহা হইলে বড়ই সুখ পাইতাম। এইরূপ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, গৃহে আসিলেই পরম সুখ অনুভব করে। হরি! আমি সেইরূপ হাটে ঘুড়িয়া বড়ই ক্লান্ত হইলাম, আর পথ পর্য্যটন করিতে পারিনা, এইবার আমার নিজের ঘরে আমায় লইয়া যাও। হরি আমার মনে এমন ধারনা নাই যে আমি হাটে আসিয়াছি, পচা পুঁটী কিনিয়া খাইয়া রোগের মূল কারণ করিব। আমার অভিলাষ পটল বেগুণ প্রভৃতি সুখাদ্য কিনিয়া বাড়িতে গিয়া সুখে ভোজন করিব। বিষয়াদি পচা পুঁটীতে আমার আবশ্যক নাই, তোমার অমৃত ময় নাম রাধা কৃষ্ণ, পটল বেগুণ, ইহাই আমার আবশ্যক। এই ভবের হাটে গুরু ব্যবসাদারের নিকট পটল বেগুণ কিনিব, পরিশেষে তোমার যুগল চরণ যে আমার বিশ্রাম মন্দির, সেই চরণ তলে গিয়া বিশ্রাম করিব। নাথ! এদুর্লভ দেহ এবার হারাইলে একেবারে বড়ই হারিয়া যাইব, দেখ কৃপালাভে যেন বঞ্চিত না হই।

শ্রীইন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য।

ঈশ্বর।

—:০:—

(১)

জগদীশ! জগন্নাথ জগত-জীবন!
সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারণ! জগত-মোহন!
ইচ্ছারূপে তুমি প্রভো! সৃজিলা সংসার
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎসার!

(২)

ক্ষুধা খাদ্য-শার, বারিদানে তৃষা-অরি,
ভেষজাস্ত্রে ব্যাধিকুলে সংহার হে করি

পিতারূপে তুমি দেব পালিছ সংসার
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎসার !!

(৩)

সুপথ কুপথ প্রভো! করিয়া সৃজন
কর্ম্মফল রূপে সদা করিছ ভ্রমণ।
ব্যাধিরূপে কুকর্ম্মীরে করিছ সংহার
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎসার !!

(৪)

পিতা পুত্র পত্নী আদি দিয়া ক্রীড় কে
খেলাইছে মায়া সূত্রে বাঁধিয়া সব লে।
রাখিয়াছ তুমি দেব! ভুলায়ে স ার।
নমি পদাম্বুজে তব দেব! সারাৎ ার !!

(৫)

তোমারি সৃজিত নাথ! এভব-ভু বনে
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ভ াখি যেন মনে
সমভালবাসা থাকে উপরে স ার।
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎ সার !!

(৬)

পীযূষ-জোছনা-মাখা নিশিথি -পতি।
পঞ্চভূত, কাল, তমোবারি-দিবা তি,
সবাই আদেশ তব পালে অনিবার।
নমি পদাম্বুজে তব দেব স রাৎসার !!

(৭)

সাজায়েছ যেই খেলা রিতে সাধন।
দাও শক্তি, সেই খে া খেলি ভগবন্!
চরণে প্রার্থনা;—"যে ন ভুলিনা তোমার।"
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎসার !!

(৮)

কলকলে স্রোতস্বতী, গুঞ্জরি ভ্রমর।
নিরবাকে যোগাসনে গাহে যোগীশ্বর—
তব গুণ, বহে নেত্রে প্রেম-অশ্রুধার।
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎসার !!

(৯)

মর্ম্মরি পাদপচয়, প্রভঞ্জন ধ্বনি,
বিহগ অস্ফুটস্বরে, কড়কড়ে অশনি-
গাহে প্রেমানন্দে মতি মহিমা তোমার।
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎসার !!

(১০)

আর এক আজ্ঞা সবে করিছে প্রচার ;—
"জলবিম্ব প্রায় স্থায়ী তোমার সংসার।"
ভাঙ্গা গড়া এজগতে কার্য্যই তোমার।
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎসার !!

(১১)

অনন্ত অক্ষয় নিত্য সৎ সনাতন
তোমার মহিমা তুমি জান মহাত্মন্ !
কার সাধ্য জানে বিভো! মহিমা তোমার।
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎসার !!

(১২)

তোমারি জগত নাথ! তুমি সর্ব্বময় !
কি আছে আমার যাহা দিব হে তোমায় ?
তোমারি দেওয়া মন লও দয়াধার !
নমি পদাম্বুজে তব দেব সারাৎসার !!

শ্রীবসন্তকুমার প্রামাণিক।

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন।

—:০:—

কুটিলা করিল যবে কলঙ্ক প্রচার,
ব্রজপুরে শ্রীরাধার বাস হ'ল ভার।
ইহা শুনি যদুপতি ব্যাকুলিত মন,
কেমনে কলঙ্ক তাঁ'র হইবে ভঞ্জন!
অবশেষে যুক্তি এক ভাবি মনে মন,
ছল করি' অকস্মাৎ হ'ন অচেতন।
কি হ'ল কি হ'ল রব চৌদিকে উঠিল,
গোপ বালা যত সব ছুটিয়া আইল।
পুত্র শোকে মা যশোদা কাঁদেন আছাড়ি
প্রতিবাসী আদি সবে এ'ল ত্বরা করি।
মুর্চ্ছাগত কৃষ্ণে হেরি' করে হায়, হায়,
চেতনা আনিতে কেহ না দেখে উপায়।
হেন কালে বৈদ্য রূপে যাইয়ে ত্বরিত,
অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ হ'ন দ্বারে উপনীত।
"আরোগ্য করিব আমি না' করিহ ভয়,"
এত কহি যশোদারে দিলেন অভয়।
"ঔষধ দিতেছি আমি কহি অনুপান,
কালিন্দি হইতে জল ত্বরা করি আন।
তব মধ্য হ'তে এক সতী নারী যা'বে,
সচ্ছিদ্র কলসে জল আনিতে হইবে।
এরূপেতে পাই যদি হেন অনুপান,
নিশ্চয় বাঁচা'ব কৃষ্ণে নাহি সন্দিহান।"
বৈদ্য বাক্য শুনি' সবে বিস্ময়ে মগন,
ছিদ্র পাত্রে জল আ'সে ইহা বা কেমন।

বৈদ্য ক'ন হেথা যদি সতী নারী রয়,
ছিদ্র পাত্রে জল সেই আনিবে নিশ্চয়।
এক বিন্দু জল তা'র ভূমে না পড়িবে,
অন্যথা না হ'বে শুন সত্য কহি সবে।
শুনিয়া কুটিলা ধায় যমুনার তীরে,
সচ্ছিদ্র কলসে করি জল আনিবারে
আনিতে আনিতে জল ভূমেতে পড়িল,
শূন্য পাত্র ল'য়ে দ্বারে উপনীত হ'ল।
জটিলা, কুটিলা পরে ধায় গর্ব্বভরে,
কলস তুলিতে জল সর্ব্ব স্থানে পড়ে।
কুটিলা জটিলা লাজে না দেখায় মুখ,
সকলে আনিতে জল হইল বিমুখ।
যশোদা উদ্যতা শেষে আনিবারে জল,
বৈদ্য ক'ন, ইথে কোন নাহি হ'বে ফল।
অবশ্য কহিব আমি মন্ত্র বলে গণি,
ব্রজপুর মধ্যে সত্য সতী হ'ন যিনি।
গণিবারে ছল করি রাধারে লক্ষিয়া,
"প্রকৃতই সতী ইনি কহেন গণিয়া।
বৈদ্য বাক্য শুনি যত নর নারীগণ,
পরস্পরে চাহি হাঁসে বদনে বসন।
ঢলাঢলি করে সবে অঙ্গেতে পড়িয়া,
গুপ্ত বিদ্রূপের স্রোত যেতেছে বহিয়া।
ব্রীড়ায় শ্রীরাধা নত করেন বদন,
যশোমতী তবে যা'ন রাধিকা সদন।
অনুরোধ করি তিনি কহেন রাধারে,
'জল আনি প্রাণ দাও আমার বাছারে।
শুনিয়া শ্রীরাধা ইহা মানেন বিস্ময়,
শ্রবণে কে কহে তাঁর না কহিহ ভয়।

অবশেষে স্বামী পদ অন্তরে স্মরিয়া,
মন্থর গতিতে যা'ন ছিদ্র ঘট ল'য়া॥
কৌতুক হেরিতে তথা যত নারী ছিল,
শ্রীরাধার পিছু পিছু সকলে ধাইল।
প্রভু পাদ-পদ্ম স্মরি তুলিলেন জল,
কি আশ্চর্য্য এক বিন্দু জল না পড়িল।
নয়নে হেরিছে তবু প্রত্যয় না' হয়,
বারি পূর্ণ ঘট রাধা দেন যশোদায়।
কৃষ্ণ রূপে বৈদ্য তথা মহৌষধি দেন,
লভেন চেতনাতথা যশোদা নন্দন।
স্থবিরা, যুবতী আদি যত নারীগণ,
প্রশংশি রাধারে সবে যায় স্বভবন।
কুটিলা জটিলা ইথে রক্তিমা বদন,
এরূপে রাধার হ'ল কলঙ্কভঞ্জন।

শ্রীচুণীলাল চন্দ্র।

গিরি-গোবর্দ্ধন।

—:০:—

সোণামুখীর পুর্ব্বপ্রান্তে গোবর্দ্ধন গিরি নামক একটী সুউচ্চ মন্দির আছে। মন্দির-ইষ্টক প্রাচির দ্বারা বেষ্টিত। সোণামুখীর ভূত পুর্ব্ব জমিদার ৺ বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই মন্দিরের সংস্থাপয়িতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন ধামে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে, বাল্য লীলায় যে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোণামুখীর গিরি গোবর্দ্ধন নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এক্ষণে পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণ-ভক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় নাই—কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গোবর্দ্ধন গিরি ও তৎসম্মুখস্থিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পুর্ব্বে দোলযাত্রা ও গোবর্দ্ধন-যাত্রা নামক

দুইটী মহোৎসব হইত, কিন্তু কালের অপ্রতি-বিধেয় বিধানে উৎসবের সে আনন্দ রাশি থামিয়াছে। গিরি-গোবর্দ্ধন এক্ষণে নীরব, নিস্তেজ। পক্ষীকুলের মধুর কাকলীতে উহার নীরব ভাব সময়ে সময়ে নষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। আমরা বাল্যকালে গিরি গোবর্দ্ধন দেখিয়াছি,—বাল-স্বভাব-সুলভ চপলতা বশতঃ তখন কোন স্থায়ী ভাব আমাদের মনে অঙ্কিত হয় নাই। সে দিন গিরি-গোবর্দ্ধন দর্শনে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, এই কবিতাটী সেই ভাবেরই বিকাশ।

(১)

বিদ্যাভূষণের কীর্ত্তি, সুন্দর গঠন।
ওই দেখ বিরাজিছে, গিরি গোবর্দ্ধন॥
আহা মরি কিবা শোভা, জগজন মনোলোভা,
নিজের মহিমা নিজে করে বিকীরণ।
সুন্দর দর্শনে ওই গিরি গোবর্দ্ধন॥

(২)

কিবা সুশোভিত কায় গিরি গোবর্দ্ধন।
অভ্র ভেদী তুঙ্গ শিরে, এখনো দাঁড়ায়ে ধীরে,
বিশ্বম্ভর-কীর্ত্তি কথা করিছে ঘোষণ।
ভক্তির উজ্জ্বল চিহ্ন এই গোবর্দ্ধন॥

(৩)

প্রীতির পবিত্র রূপ ভক্তি প্রস্রবণ—
কিবা মনোহর ওই গিরি গোবর্দ্ধন।
নীল, লাল শৈল খণ্ডে, ধরিয়া রয়েছে তুণ্ডে,
সর্প, ব্যাঘ্র, আদি জীব করে বিচরণ।
স্থপতির ইহা এক মহা নিদর্শন॥

(৪)

গিরি গোবর্দ্ধন কিবা সুন্দর আবাস।
কৃষ্ণেতে নিষ্ঠার কথা করিছে প্রকাশ॥
ইষ্টক প্রাকারে তার ঘেরা আছে চারি ধার,—

দুটী ধারে দুটী দ্বার প্রবেশ কারণ।
বিদ্যাভূষণের-কীর্ত্তি এই গোবর্দ্ধন ॥

(৫)

বিদ্যাভূষণের কীর্ত্তি ; এই গোবর্দ্ধন—
বাগিচার ভগ্ন চিহ্ন, পাক গৃহ ছিন্ন ভিন্ন,—
অতীতের স্মৃতি চিহ্ন করিছে প্রকাশ।
গিরি গোবর্দ্ধন এই সুন্দর আবাস ॥

(৬)

সুন্দর উন্নত দেহ গিরি গোবর্দ্ধন।
পাশে আছে দোল ঘর-সম্মুখেতে গোপেশ্বর—
মনোহর শিবলিঙ্গ—মূর্ত্তি সুদর্শন।
গুম্বজ আকৃতি এই গিরি গোবর্দ্ধন ॥

(৭)

গুম্বজ্ আকৃতি এই গিরি গোবর্দ্ধন—
দোলেতে লেগেছে গোল, নাহি সে আনন্দ রোল,
নাহি উৎসবের হাসি, কালের শাসন।
শ্রীরাধা গোবিন্দ আর না দেখি এখন ॥

(৮)

গিরি গোবর্দ্ধন ছিল কি সুখের স্থান।
কালের বিধানে এবে সব অবসান।
জনশূন্য দ্বীপ প্রায়, আছে এক ধারে হায়—
নীরবতা, নিস্তব্ধতা অতি ভীতি ময়।
পাখীদের কাকলীতে হ'তেছে বিলয়।

(৯)

গিরি গোবর্দ্ধন ছিল কি সুখের স্থান।
ছিল পেয় নিরমল ; সুন্দর রসাল ফল,—
বৈষ্ণব, কাঙ্গালী কত, করিতে ভোজন।
কালেতে সকল ই লয়—হায়রে এখন ॥

(১০)

উন্নত মস্তকে আছে গিরি গোবর্দ্ধন।
প্রাঙ্গনে ধেনুর পাল, কিন্তু নাহি চরে আর,—
না পায় তণ্ডুল, অন্ন করিতে ভক্ষণ।
গোবর্দ্ধন-যাত্রা হায় কোথায় এখন?

(১১)

কোথা এবে বিশ্বম্ভর বিদ্যার ভূষণ?
কোথা সে প্রেমিক জন, যাঁর প্রেমে অনুক্ষণ—
ছিল সোণামুখী বাসী আনন্দে মগন;—
আছিল এ সোণামুখী নন্দন-কানন॥

(১২)

কোথা এবে বিশ্বম্ভর দয়ার আধার?
এখনো যাঁহার কথা,-স্মরিয়া হৃদয়ে ব্যথা—
ভোগ করে প্রজাপুঞ্জ, এঘোর দুর্দ্দিনে।
বিশ্বম্ভর হোলী গীতি গাঁথা গোবর্দ্ধনে॥

(১৩)

এই যে সুন্দর দৃশ্য গিরি গোবর্দ্ধন।
এই যে দক্ষিণ ধারে,—দেখি মঞ্চ শোভাধরে,
উহাতে বসিত যত সহচরগণ।
আহা মরি সে মঞ্চের কি দশা এখন॥

(১৪)

মনোহর গোবর্দ্ধন আছে দাঁড়াইয়া;
কিন্তু তার দিক-শোভা, নাহি আর মনোলোভা,
বসন্ত নিকুঞ্জ-শোভা নাহি দেখা যায়!
কবি কহে, "চির দিন সমান না যায়॥"

দীন-শ্রীরসিক লাল দে।

মহানির্ব্বাণ।

—:•:—

[শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সাধের মরণ বা অনন্ত জীবন]

সাগরকূলে সাধন কুটীরে আজ শ্রীল হরিদাসের মহা নির্ব্বাণ হইবে, হরিদাস, ভক্ত-বৎসল-মহাপ্রভুর নিকট জীবনের শেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রর্থনা তাঁহার ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরই যোগ্য। প্রভূর লীলা সম্বরণের দিন সন্নিকট; হরিদাস এ দুর্দ্দিনের বিষয় মনে করিয়া অস্থির হইয়াছেন। তাই কাতর প্রাণে, প্রভুর সমক্ষে আর্ত্তি করিয়া বলিতেছেন;—

সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার অগে মোর শরীর পাড়ীবা॥

কেবল ইহাই নহে। কিরূপ ভাবে এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতে তঁহার বাসনা, তাহা এই—

"হৃদয়ে ধরিব তেমার মঙ্গল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥"

ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কারী শ্রীপ্রভু আজ ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য হরিদাসের ভজন কুটীরে সমাগত হইয়াছেন। সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া সকলে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু, হরিদাসের গুণ মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ ও হরিদাসের এবং হরিদাস ও ভক্তগণের চরণ ধুলি গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর ভক্তবর হরিদাস, প্রাণের ঠাকুর, ভক্ত-বৎসল শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্মুখে বসাইলেন। অতঃপর, তাহার নয়ন ভৃঙ্গদ্বয়, গৌরাঙ্গের মুখ পদ্মের মকরন্দ পান করিতে লাগিল। তাঁহার পবিত্র হৃদয় খানি প্রেমময়ের রাতুল চরণ যুগল ধারণ করিল; মুখে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে হরিদাসের জীবাত্মা নামব্রহ্মের সহিত দেহত্যাগ করিয়া নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট

হইল। একদিন ইচ্ছা-মৃত্যু ভীষ্মদেব, নব জলধর শ্যাম মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ আমাদের হরিদাস ও কনক-কান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মাধুর্য্য মণ্ডিত অপরূপ মহিমময় মূর্ত্তিখানি সন্দর্শন করিতে করিতে নশ্বর কলেবর ত্যাগ করিলেন। অহো! ইহাকে কি বলিব? ইহা কি সাধের মরণ, না অনন্ত জীবন। এইরূপ মৃত্যুই জীবের বাঞ্ছনীয়। হে আমার প্রেমরাজ্যের প্রিয় সখাগণ! এই দৃশ্যের সুন্দর আলেখ্য খানি, একটীবার চিত্তপটে এবং আর একবার চিত্রপটে নিরীক্ষণ করুণ। প্রাণ মন আরও ভাবময়, আরও মধুময়, আরও উন্নত, আরও পরিশুদ্ধ হউক। আঁখির পিপাসা প্রেম ময়ের প্রেম সাগরে ডুবিয়া চিরশান্তি লাভ করুক। এই চিত্র আঁকিবার নহে, প্রবরণীয় চিত্র ভাষায় প্রকাশ যোগ্য নহে। ভাব নেত্রে এভাবনিধির ভাবময় চিত্র খানির অনুধ্যান করুণ।

গীতিকা।

আজি সাগরের তীরে, সাধন কুটীরে,
শ্রীহরিদাসের হইবে নির্যাণ।
তাই ভকত-বৎসল শ্রীশচী দুলাল,—
এসেছে রাখিতে ভকতের মান।
সার্ব্বভৌম আদি স্বরূপ রাম রায়,
হরিদাসের চারিদিকে শোভা পায়,
সম্মুখেতে ওই কনক প্রভায়—
গৌরাঙ্গ বিরাজ মান্।
ভক্ত পদ রজঃ করিয়া ভূষণ,
হৃদয়েতে ধরি' রাতুল চরণ,
রসনায় নাম করি' উচ্চারণ—
হ'লে ভাবেতে বিভোর প্রাণ।
দেখিতে দেখিতে শ্রীমুখ কমল,
ভাবের আবেশে হইল বিহ্বল,
দেখা'য়ে নামের মহিমা প্রবল,
ত্যজে কলেবর পুরুষ প্রধান।

এত নহে মৃত্যু ! অনন্ত জীবন ;
এ কেবল প্রেম-রস আস্বাদন,
এ ধরায় তার—শুভ আগমন—
প্রেম ভক্তি রস করিতে প্রদান।

মানব জীবন করিতে সফল,
যদি কারো ইচ্ছা হয় হে প্রবল,
হ'য়ে অকপট, এই চিত্র পট—
(তবে) চিত্ত পটে সদা আন।

ভাবিতে ভাবিতে ধ্যানে চিত্রপট,
আসিবেন প্রভু যেন সুপ্রকট,
চিন্ময় ধাম হবে সন্নিকট—
ও সেই নিত্য লীলার স্থান।

আয় ভাই আয় এ ভাব নিরখি ;
আয় ভাই আয় হৃদয়েতে আঁকি—
হীরক অক্ষরে ; অন্তর মাঝারে—
প্রবাহিত হোক্ আনন্দ তুফান।

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

সুখ।

খ—আকাশ ; উহা শূন্য ও অনন্ত। উহা অকূল সমুদ্র— কূলকিনারা-বিহীন। মানব-পাখী বাসনা-ডানা নাড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া অবশেষে অবসাদের অন্ধকোণে পড়িয়া থাকে। মানব-মীন ডানা নাড়িয়া ডুব-সাঁতারে গ্লানির ফেনে জড়াইয়া মর মর হয়, কিন্তু তবু—অন্ত পায়না।

খ—আকাশ; উহার দুটি রঙ,—এই দিনমণি দ্যুতিবিভাসিত, এই মলিন মেঘাচ্ছন্ন। আকাশ উজ্জ্বল, আকাশ ঘোর; কিন্তু আকাশ সেই এক, কেবল উপাধি বা উপসর্গ ভেদ। মানব জীবন এক আকাশ বা খ। উহা সুদুর্যোগে (সু+খ এবং দুঃ+খ) সুখদুঃখভেদ প্রাপ্ত হয়। সুখ বল, দুঃখ বল, মূলে খ—শূন্য বা ফাঁকা। জীবনে সুখ দুঃখ পর্য্যায়ের পর্য্যাপ্তি নাই। জীবনসিন্ধু-জীবন উঠাপড়া সুখদুঃখের তরঙ্গভরা; কিন্তু উহার গর্ভ স্থির অকম্প এবং তলদেশে অমূল্য রত্নরাজী বিনিহিত আছে। সেই ফাঁকা শূন্যের উপর অতি উচ্চ স্থানের নক্ষত্র হীরকমণির উদ্যান-খানি আছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপ, হাসি ও কান্না, প্রসাদ ও বিষাদ, উন্নতি ও অবনতি, আলো ও কালো, জ্ঞান ও অজ্ঞান, লাভ ও ক্ষতি, বৃদ্ধি ও হ্রাস, ইষ্ট ও অনিষ্ট, যোগ ও বিয়োগ, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, পুরস্কার ও দণ্ড, সদ্ভাব ও অভাব,—সুখ ও দুঃখ—এক জলেরই তরঙ্গ, উঠ্‌তি পড়্‌তি। উত্থান পতনের ও পতন উত্থানের নিয়ামক, সুখ, দুঃখের বীজ ধারণ করে, পোষণ করে। দুঃখ ও সুখের ডিম্ব প্রসব করে। সুখ-দুঃখ-তরঙ্গের অতি নিম্নে ডুব দিতে পারিলে রত্ন মিলে। মধুচক্রের গাত্রাবরণ মক্ষিকা দংশনরূপবিভীষিকাময় কিন্তু অন্তঃ কোটরে দ্রবঘন মধু সংরক্ষিত আছে। সুতরাং ইহা প্রতীত হয়, সুখদুঃখ কেবল আবরণ, বক্কল বা খোঁশা। আজি তোমার গৃহ উৎসবময়, আনন্দ-হিল্লোল-কল্লোলকলরবে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু দুদিনান্তে উৎসব ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্ত গৃহখানি নিরানন্দের ঘোর আঁধারে নিমজ্জিত হইবে। ইহা অহরহঃ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এসুখ সুখ নয়; কারণ, উহা ক্ষণস্থায়ী এবং উহার পুচ্ছে নিরানন্দ মাখিয়া দিয়া যায়। সুতরাং এসব দুঃখেরই বর্ত্ম-নির্ম্মাতা। হে পথিক! কোমলতল্পে না শুইলে তোমার নেত্রে নিদ্রা আসে নাই, কঠিন মৃত্তিকায় শয়ন নিতান্তই একটা অস্বাভাবিক মনে করিয়াছ; মনে করিয়াছ মৃত্তিকায় কভু মানুষে শয়ন করিতে পারেনা। কিন্তু দেখ, অদ্য তুমি কঙ্করাচ্ছন্ন ভূমি মাত্র শয্যায় শয়ন করিতে পারিয়া যেন কতই তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছ এবং কেমন নিদ্রাবিভোর হইয়াছ। অবস্থার সহিত সুখ দুঃখ বর্ণ ধারণ করে। দুঃখপ্রদ সেই কঠিন ভূমি অদ্য তোমার সুখশয্যা হইয়াছে এবং তোমাকে কতইনা সুখ দিতেছে। শারদীয়চন্দ্রধার কিরণ

সুধাসম্পাতে এতদিন কতই না তুমি স্নিগ্ধ শীতল সুখানুভব করিয়াছ, কিন্তু হে বিরহিন্! অদ্য তোমার অঙ্গে সেই শশলাঞ্ছন হিমকর যেন বহ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে; অতএব ভাবিয়া দেখ, তোমার মানসিক অবস্থাভেদ এক চন্দ্রই সুখ ও দুঃখের নিদান হইয়াছে; সুতরাং কোন কোন বস্তুই কেবল সুখকর বা কেবল দুঃখকর নয়, অথবা-কোন বস্তুই স্বয়ং অনপেক্ষভাবে সুখদুঃখের হেতু নয়। মানসিক অবস্থা সহযোগে একই বস্তু বা ঘটনা সুখময় বা দুঃখময় হয়। সুখদুঃখ মনের বৈকারিক ধর্ম্ম। সুধাবর্ষী চন্দ্র—আনন্দকর—হিমকর,—তিনিও অগ্নি বর্ষণ—করেন। বৈষ্ণব সুলেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী মহাশয় লিখিত "শ্রীরাধাবল্লভ লীলামৃত" হইতে উদ্ধৃত করা যাউক্;—

দুরালোকঃ স্তোকস্তবকনবকা শোক লতিকা-
বিকাশঃ কাসারো পবন পবনোঽপি ব্যথয়তি।
অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গীরণিত রমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতি শ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি॥ (গীতগোবিন্দম্)

"সখি, কৃষ্ণ বিরহে আমার মন অন্য কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছেনা। দেখ, এই ঈষমঞ্জুরিত নবাশোকলতিকার প্রফুল্ল শোভা আমর নেত্রশূল হইয়াছে, এই সরোবরপার্শ্বস্থ উপবন হইতে প্রবাহিত মৃদুমন্দ সমীরণ আমার বিষম সন্তাপজনক হইয়াছে এবং চুতপাদপের সুরম্য অগ্রভাগযুক্ত মুকুল রাজী, যাহা ভ্রাম্য মানা ভৃঙ্গী সকল দ্বারা মনোহররূপে মুখরিত হইতেছে, তাহাও আমাকে সুখ প্রদান করিতেছে না।

চিন্মণি দীপ্ত প্রেমনন্দনেই এহেন কাণ্ড, দশা, বিষয়ের নিবিড়ারণ্যে যে কুসুমকণ্টকের লট্পটি থাকিবে, তৎসম্বন্ধে কা কথা! কুসুমেরচুমা, কণ্টকের খোঁচা ওতপ্রোত ভাবেই সবার জন্য প্রস্তুত আছে। আলো জ্বালিয়া দাও, পিঠে পিঠে ছায়া সাজিবে; সুখের মশাল জ্বলিলে, দুঃখের ছায়া কায়া ধারণ করিবে। সুখের ছায়া দুঃখ। বস্তুর অস্তিত্বে ছায়া জন্মায়। বস্তুর বিলোপে বা আলোর অবাধ গতিতে ছায়ার উৎপত্তি সম্ভবেনা। সুখের আলো বিষয়স্তম্ভে প্রতিহিত হইয়া যে ছায়া জন্মায় তাহা দুঃখ। জড় কায়ারই ছায়া বটে। জড়ীয়-কায়শূন্য বস্তুর ছায়া থাকিতে পারেনা। এজন্যই

মরিয়া মানুষ ভূত হইলে, "ভূতের ছায়া থাকেনা"—এরূপ কিম্বদন্তী আছে। উহার তাৎপর্য্য অতি সুন্দর বটে। এখন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যে সুখের ছায়া নাই, তাহাই যথার্থ সুখ, এবং তাহাই জীবের উদ্দিষ্ট অভীষ্ট সম্পদ্। সুখ বস্তুটি নিত্য অখণ্ডালোক; কিন্তু বিষয়ের নানত্বে সম্পাতিত হইলে উহা ব্যষ্টি বা খণ্ড খণ্ড সুখের আকার ধারণ করে এবং ছায়াযুক্ত হয় অর্থাৎ দুঃখ দ্বারা সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত হয়। বিষয়ের ঘাটে ঘাটে, ঘটে ঘটে, আমরা যে সব সুখ ছিটান দেখিতে পাই, সে সব এক মূল সুখেরই রেণু সকল, কিন্তু আবিলতা প্রাপ্ত। হায়রে এমন মেঘের জল, হিমস্ফটিকাচ্ছন্ন, ওই পুতিগন্ধি গর্ত্তে ওই কৃমি-কিলবিল্ পুরীষ কূপে, ওই বেঙাচিবেশ্ম পঙ্কিল পুকুরে, অই কলম্বী-হিলিঞ্চাবিল্‌বিলে, ওই মলনালখালে, আবার এই জাহ্নবীর প্রসন্ন পূত সলিলে। কিবা কূপসলিল, কিবা সবিত সলিল, সকল সম্বন্ধেই অল্পাধিক ফিল্টারের প্রয়োজন। কতকগুলি এককালে অস্পৃশ্য ঘৃণ্য এসব একদা মেঘবারি ছিল। তা এখন মলদুষ্ট, আর অমল নয়। বিষয়ের নানা পাত্রে মেঘ বারি সুখ দুঃখদুষ্ট হইয়াছে। গড়, খাত, কূয়া, ডাঙ্গা, বিল, ঝিল সব আত্মসম্বন্ধি। ফলতঃ এক গঙ্গা সত্ত্বসম্বন্ধিনী। ইহা কি নানা? না—না, এক! মেঘবারি সুখ আত্মসুখরূপে দুঃখাবহ পরসুখ পরের সুখ বা কৃষ্ণ সুখরূপে নির্ম্মল, অনাবিল, নির্ব্বিকার। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যে যে সুখ সেই কেবল সুখ, আত্মসুখতাৎপর্য্যে সুখ দুঃখময় হইয়া সংসার ছাইয়াছে, সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সংসারকে "দুঃখ" অভিধা দেন।

বিষয়ের বিযযোগে, মেঘবারির অস্থানে পতনবৎ, সুখ বিষাক্ত হইয়া যায়। কিন্তু সেই বিষয় সুখসম্ভোগ মধ্যে কৃষ্ণ সুখানুধ্যানরূপ অমৃত প্রবাহ যদি বহান যায়, কি ছিটা প্রক্ষেপ করা যায়, তবে সর্ব্বশোধক গঙ্গোদক ছিটার ফল বর্ত্তিতে পারে। নিত্য অখণ্ড সুখ কৃষ্ণ সুখগঙ্গারূপে জীব মণ্ডলে প্রকট হইয়াছেন। উহার প্রক্ষেপে সংসারের সুখ দুঃখ গুলিকে পবিত্র ও সুখময় করিয়া লইতে হইবে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।

কৃষ্ণই পূর্ণ সুখবস্তু। বিরহই পূর্ণভাব। ভাব ও সুখ সতত জড়িত বিদ্যমান আছেন। ঘটনা ও অবস্থা নিচয় জীবনপথে জীবে সুখে লোভ ও বিরহে

ক্রোড় জমাইয়া ফিরিতেছে এবং জীবকে নিয়ত পুর্ণত্ব পানে ঠেলিতেছে। মায়িক জগতের জ্ঞানমঞ্চে দাঁড়াইয়া দূরবীক্ষণ যোগে দেখিয়াছিলাম যে ছায়াহীন সুখই যথার্থ সুখ, কিন্তু এখন মায়াপারে তটস্থ হইয়া (স্বপ্ন বা কল্পনা হউক) অনাবৃত চোখেই দেখি যে সুখের ছায়াটা নিত্য। উহার নাম বিরহ। উনি সুখের অর্দ্ধাঙ্গ। চিদুদ্যানের সরসীর কমলেও কণ্টক আছে। মনে করিয়াছিলাম এদেশে বুঝি পদ্মে কাঁটা হয়না, না—সর্ব্বত্রই কমলে কণ্টক লাগা আছে। দুঃখ বাদ দিলে সুখের যে কোনই অস্তিত্ব নাই; ইহা ধ্রুবসত্য। ধাম শিরোমণি ব্রজে শ্রীরাধারাণীর এত কাঁদাকাটি কেন, তাহা ভাবিয়া দেখুন। ওই যে বিরহ কৃষ্ণ সুখের বিশিষ্টাঙ্গ ইহা কৃষ্ণ সুখ সরোজের উদ্‌গত কণ্টক। তুমি মনে করিতেছ এই পর্ব্বতটা না থাকিলে সুন্দর হাওয়া খেলিত। না হে, তা নয়, ওই পর্ব্বতটিকে বর্ত্তমান সমীরপতির ও সমীর সৌগন্ধের হেতু জানিও। কৃষ্ণ সুখ বড় দুঃখের ধন! শ্রীরাধার সুখটী যেমন সাগর, প্রণালী দ্বারা যুক্ত। দুঃখ সাগর শুকিয়ে বা সেচিয়ে ফেল, সুখ সাগরের বারি চুয়ায়ে দুঃখ সাগরে প্রবেশ করিবে এবং শুকাইতে থাকিবে।

ভাইরে সুখ ফণীর মাথার মণি! দুঃখ দংশনে জর্জ্জরিত হও তবে সুখ মিলিবে! সুখকে সুখ, দুঃখকে দুঃখ মনে না করা সুখ; সে হেন চিত্ত সুখ ধারণের উপযুক্ত আধার। সর্ব্বাবস্থায় অটল থাকিয়া সন্তোষ বজায় রাখা সহজ নয়; সুখ সুলভ নয়। সংসার ঘোর তুফান তরঙ্গ সঙ্কুল, কূল পাওয়া সহজ নয়। সুখ দুঃখ একসমুদ্রেরই তরঙ্গ ভেদ। কিন্তু তরী যদি না ডুবে, কত রঙ্গ; কত নর্ত্তন ভঙ্গ! তা কি কেহ ভুঞ্জিতে সাধ করে? করে। জলের মীন শীতে কষ্ট পায় ভাবিয়া দয়া প্রকাশ করা যাউক্, তুলিয়া তার শরীরে অগ্নি সেক দেওয়া যাউক্। তখন মীনের দশা বলিহারি! দুঃখের ক্রোড়ে থাকিয়া, নিশি দিন দুঃখদাহে দগ্ধ হইয়াও যিনি তাহাতে মিষ্টি অনুভব করেন, দুঃখতে মজিয়া ছাড়িতে চাহেননা, যেন কোন্ ক্ষীরোদ সমুদ্রেই ঝাঁপ দিয়াছেন, এ হেন মনুষ্য সুখের লাগ পাইয়াছেন, তিনি সুখভাগী হইয়াছেন। দুঃখ সুখেরই কোনও অবস্থা বিশেষ মাত্র। তুমি অমুককে দুঃখ হইতে তুলিয়া আনিতে চাও তাহাকে মারিয়া ফেলিবে! তুমি যাহা দুঃখ মনে কর, সকলের বা অপরের পক্ষে সেটি দুঃখ না হইতে পারে। গরু ঘাস খাইয়া তৃপ্ত,

তুমি তাহাকে লুচিমণ্ডা দিতে চাও? দুঃখের অনলে যিনি আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছেন, তিনি সুখের শীতলভোগ আস্বাদন করিতেছেন। অনলও মাত্রাভেদে শৈত্য ধারণ করে।

এই যে আতসবাজীর ঘটা, কেল্লার আগুন লেগেছে! ধূপ তুবড়ীর কিবা জ্বলন্ত পুষ্পশোভা! কেউ কি দিবসে দেখেছেন? না, নিশার আঁধারেই উহার সৌন্দর্য্য খুলে। দুঃখের আঁধারে সুখের বিচিত্র রোস্নাই হয়। তুমি সুখ বলিয়া যাহা অনুভব কর এবং প্রসাদ সম্ভোগ কর, ভাবিয়া দেখ, উহা দুঃখের বিরতিজন্য এবং তত্তুলনায় মধুরাবস্থা মাত্র। কালোর পাশে যেমন সাদার শোভা! কেবল সাদা একাভ্যস্ত পুরাতন হয়, মিষ্টি হারা হয়। পরিশ্রম না ঘটিলে বিশ্রাম সুখ হয়না, এমন কি "বিশ্রাম" কথাটারও অস্তিত্ব থাকেনা। চিরবিশ্রাম এক বিষময় সামগ্রী (অবস্থা)। দীর্ঘ বিশ্রাম শ্রমের জন্য উতলা হয়, আকুল হয়; সুতরাং শ্রম যেমন নিত্য; দুঃখও নিত্য দুঃখের বিশ্রামবস্থায় দুঃখকোটরনিস্থত মধু পান করি এবং তাহাকেই সুখ বলিয়া অভিহিত করি, গাভী মাঠে চরিয়া ঘাস খায়, বিশ্রামকালে ঘাসের পরিপাক পরিণাম দুগ্ধ দান করে। তদ্রূপ বিশ্রাম পরিশ্রমের প্রদত্ত পীযুষরস সুখ দুঃখের রস।

সুখ দুঃখ দুটী কথার ঘটা কেবল মায়িক জগতে। সুখভোগ, দুঃখভোগ এই দুইটি আপেক্ষিক ভাব ও অবস্থা আধ্যাত্মিক জগতে স্থান পায়না। তথায় ইহাদের কোন চর্চ্চাও নাই। অবিশুদ্ধ মানবচরিত্রেই এই তরঙ্গপর্য্যায় পরিলক্ষিত হয়। জলপ্লাবনে গড়, খাল, জমি ভূমি, সব জলাশয় হইয়া এক হয়; সেই অখণ্ড জলাশয়ে কোন রেখা বা দাগ দৃষ্ট হয়না। তদ্রূপ অনুরাগের বন্যা প্রবাহিত হইলে, সকল সুখ দুঃখ, শুভাশুভ, ভালমন্দ, এক অভিনব ভাবামৃত বারি দ্বারা আবরিত হয়। তখন সুখ দুঃখ সাদাকালোর কোন চিহ্ন বিদ্যমান থাকেনা, সমস্তই অনুরাগের পাটলরঙ্গে অনুরাঞ্জিত হয়। অনুরাগে আত্মসুখ তিষ্ঠেনা। আত্মসুখের ঘরেই সুখদুঃখের ভেদ বসতি করে। অনুরাগের প্রাণসর্ব্বস্ব কৃষ্ণসুখ। ইহা সন্তাপক সূর্য্যালোক নয়, চিন্তামণির শীতল জ্যোতিঃ।

তোমার আমার সুখ কেবল ভ্রান্তির খেলা। সুখময় কৃষ্ণের সুখই সুখ, এবং কৃষ্ণ সুখেই সুখ। জীবের যদি সুখ বলিয়া কোনও লভ্য বস্তু থাকে, উহা কৃষ্ণসুখ বিনা তদিতর কিছু নয়। আমি যে মনিবের চাকর, তাহার

প্রীতি জন্মাইতে পারিলে চিত্তে বড়ই আনন্দোদ্রেক হয়; এইটি আমাদের সুখ। মনিবের মনিব, সকলের মনিব শ্রীভগবান্। সুখ কি?—চিত্তের আনন্দ। কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণপ্রীতি অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কর্ম্ম ব্যতীত চিত্তের আনন্দ অপর কোন উপায়ে উপজাত হয় না। আনন্দ সঞ্চার হইলেও আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে ভানুর বক্ষেও কালদাগ আছে (আধুনিক বিজ্ঞান বলেন) চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে। নির্ম্মলাকাশে ও ধূম্রাবস্থিত। কিন্তু কৃষ্ণ সেবানন্দ অনাবিল অকলঙ্ক শুদ্ধ শাশ্বত। জীবনের কর্তব্যগুলি কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে সম্পাদন করিতেছি এই অন্যাভিলাষ শূন্যা ধারণা ও স্মৃতি দ্বারা কৃষ্ণে সতত মন থাকে এবং তাঁহার সাক্ষাদ্বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। স্বরূপ-সাক্ষাৎকার সর্ব্বসুখামৃতের উৎস বটে। কারণ স্বরূপ বস্তুটি আনন্দ। উহার স্ফূর্ত্তিতে আনন্দ ক্ষরিত হয়।

স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকারে সতি
অজ্ঞানতৎ কার্য্য সঞ্চিত কর্ম্মসংশয় বিপর্য্যয়াদীনপি
বাধিতত্বাদখিল কর্ম্মরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।
ভিদ্যতে হৃদিয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

"দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে"—দীপ নিবাতস্থলে নিশ্চল হয়, সেইরূপ ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারাও অন্তঃকরণ নিশ্চল হয়। অজ্ঞান ও তজ্জনিত কর্ম্মসংশয়বিপর্য্যয়াদি নিরসিত হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ জীব অখিল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে কারণ তাহার কর্ম্মফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাত নাই, সুতরাং চিত্ত সতত উন্মুক্তা থাকে এবং কর্ম্মজন্য সুখদুঃখ তাহার চিত্তকে অভিভূত করিতে পারেনা। তাহার অখিল কর্ম্মপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে সে মুক্ত হইয়া আনন্দের অধিকারী হয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীকালী হর বসু।

মানব জীবন দুঃখময় ও স্বার্থপর কেন?

—ঃ০ঃ—

যখন দেখি অরণ্যজাত শুভ্র ও হিঙ্গুলাদি বরণের পুষ্প সমূহ কেহ বা অর্দ্ধ বিকসিত, কেহ বা পূর্ণ বিকসিত হইয়া নিজ নিজ সৌরভ দানে সুবাসিত ও সুশোভিত করিয়া নির্জ্জন ও শান্তিময় অরণ্যকে অধিকতর নির্জ্জন ও শান্তি-প্রদ করিয়া তুলিতেছে, যখন দেখি কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি বন-বিহঙ্গম কুল আনন্দে আত্মহারা হইয়া এক শাখা হইতে অপর শাখে উড়িয়া বসিতেছে এবং স্ব স্ব কূজনে অরণ্য সমূহ কূজিত করিতেছে, যখন দেখি শিখী, শিখীনী সহ বিবিধ কারুকার্য্য খচিত তদীয় পুচ্ছ উন্মুক্ত করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে জীব সমূহের নয়ন ও হৃদয় যুগপৎ হরণ করিতেছে, যখন দেখি ভাগিরথী উর্দ্ধতম গিরিবর শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া শারদীয় পূর্ণিমার নৈশকালীন পূর্ণচন্দ্রমার শুভ্র ও বিমল কিরণ স্বীয় বক্ষোপরি ধারণ করিয়া জগজন শ্রবণ মধুর কুলুধ্বনি নিঃসরণ করিয়া আনন্দে সাগরাভিমুখে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, তখন স্বতঃ মনে উদয় হয়, ঈশ্বরের সৃষ্ট সকলেই যখন নিত্য আনন্দময়, শান্তিময় ও সুহাসিত, তখন কেবল মানব জীবন কেন চির দুঃখময়, কেবল মানব কেন দুঃখে ও অশান্তিতে জীবনের অধিকাংশ সময় দুর্বিষহ যাতনা বহন করে? আবার যখন দেখি চন্দন তরু হইতে একটী শাখা কর্ত্তন করিলে তরুবর কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ অথবা অপ্রসন্ন না হইয়া অম্লান বদনে অকাতরে উক্ত কর্ত্তন কারীকে স্বীয় সৌগন্ধদানে আমোদিত ও প্রফুল্ল করিয়া তাহার তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত বহু প্রয়াস পায়, যখন দেখি রসাল-ফল-ভর নত-তরুশিরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তরুবর তৎপ্রতি উপদ্রবাদি স্বীয় অন্তঃকরণ হইতে অপসৃত করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপকারীর রসনা তৃপ্তির নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সুপক্ক ও সুরসাল ফল অকাতরে প্রদান করে, যখন দেখি উচ্চ ও বিশাল তরুরাজ প্রবল বাত্যাভিভূত ও কুজ্ঝটিকা পীড়িত এবং গ্রীষ্মকালীন প্রখর সৌরকর তপ্ত হইয়াও অসহায় ও পথশ্রান্ত পথিকদিগের আশ্রয় ও বিশ্রাম প্রদানে বিমুখ নহে, তখন মনে হয়, বুদ্ধি বিবেকরহিত, সদসৎ বিবেচনা শূন্য

জড়পদার্থ সমূহ যখন অপরের নিমিত্ত স্বীয় ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের সন্তোষার্থ সাধ্যমত প্রয়াস পায়, এমন কি পরম শত্রুর উপদ্রবাদি নীরবে ও অক্ষুব্ধ হৃদয়ে বহন করে, তখন মানব মেধাবী, ধীশক্তি সম্পন্ন সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হইয়াও স্বার্থান্ধ হইয়া সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হয় কেন? পরের চিন্তা ভ্রমেও ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাদের অন্তঃকরণে উদয় হয় না কেন? এবং পরের হিতার্থে, আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলার্থে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় কেন? এই কুহেলিকা ভেদ করিতে উদ্যত হইয়া কোন কোন ধীশক্তি সম্পন্ন দেবোপম মহাপুরুষের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে. কেহ কেহ বা স্বল্প পরিমানে কৃতকার্য্য হইয়া স্বয়ং আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন।

প্রথমতঃ—মানবজীবন দুঃখময় কেন? ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি নিরপেক্ষভাবে সমউপাদানে যাবতীয় বস্তু ও জীব জন্তু সৃজন করিয়াছেন; তিনি দয়াময় সুতরাং কোনও জীব জন্তুকে দুঃখী করিয়া সৃজন করেন নাই। তিনি সকলকেই কৃপাদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন এবং কিসে তাঁহার সৃষ্ট জীব সমূহ সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হয়, কি উপায়ে তাহাদের জীবন শান্তি-ময় হয় তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ঐ দেখ কপোত কপোতী কুলায় পশিয়া শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে, ঐ দেখ মধুকরচয় কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিবসান্তে মধুচক্রে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, ঐ দেখ কুরঙ্গ, কুরঙ্গী সনে মিলিত হইয়া শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিশা যাপন করিতেছে, প্রকৃতির দৃশ্য শান্তিপূর্ণ, জগতের যে দিকে দৃষ্টি যায় দেখ সকলই শান্তিময়। হায়! কেবল মানব জাতি দুগ্ধফেননিভ শয্যোপরি শয়ন করিয়াও বহুবিধ দুশ্চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে, অনিদ্রায় অনেক প্রকার যাতনা ভোগ করিতেছে এবং কেহ কেহ নিদ্রামগ্ন রহিয়াছে সত্য সম্ভবতঃ ভীষণ যন্ত্রনা প্রদ স্বপ্ন মধ্যে মধ্যে তাহাদের সুখনিদ্রার অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ কি? মানব আজীবন দুঃখ, শোক ও অশান্তিতে দিনাতিপাত করুক, ইহাই কি লীলাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা? যিনি জগতের অপরাপর যাবতীয় চেতন ও অচেতন বস্তু শান্তিময় ও সুখময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি কেবল নরজীবনই ক্লেশপ্রদ উপাদানে গঠন করিয়াছেন? কখনই নহে। মানব যাহাতে শান্তিময় জীবন লাভে সমর্থ হয়, দুঃখ ও শোক-

প্রদ কর্ম্ম হইতে বিরত হয় তন্নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে সদসৎ বিবেক শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া এই মর্ত্যভূমে প্রেরণ করিয়াছেন। তবে মানব আজীবন দুঃখ ভোগ করে কেন? ইহার কারণ কোনও ইংরাজ উল্লেখ করিয়াছেন—

Man's in humanity to man
Makes countless thousands mourn.

অর্থাৎ মানবের নিষ্ঠুরতা মানবের প্রতি,
সহস্র মানবে করে দুঃখ-বিজড়িত।

মানব স্বয়ং স্বীয় দুঃখ আনয়ন করে। যদ্যপি সৌভাগ্য বশতঃ কোন ব্যক্তি তাহার পরিজন মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গতি সম্পন্ন হয় তাহা হইলে তাহার আত্মীয়-গণের আহার নিদ্রা এককালে দূরীভূত হইয়া যায়। তখন হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা আসিয়া তাহাদের শান্তিময় জীবনক্ষেত্রে অশান্তির বীজ বপন করিয়া দেয়। কোনও গৃহস্থ পরিজন বর্গ সহিত একত্রে সুখে জীবনাতিপাত করিতেছিল, হয়ত কাল ক্রমে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ জনিত এমন একটী কলহের সূত্রপাত হইল যে, আজীবন তাহারা পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করিল না, প্রত্যেকেই তৎজাত অশান্তি জীবনের প্রধান ও নিত্য সহচরী করিয়া দুঃখে কালক্ষেপন করিতে লাগিল। এইরূপ বহুবিধ কারণে মানব স্বয়ং দুঃখ উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং তন্নিমিত্ত তাহাদিগের জীবন চিরদুঃখময় হয়। মানব যদ্যপি আপন দুঃখ আপনি সৃষ্টি না করিত তাহা হইলে তাহাদিগের জীবন চির শান্তিময় হইত। হে মানব! যদ্যপি যথার্থই সুখ ও শান্তিঅভিলাষী হও তাহা হইলে সতর্ক থাকিও যেন পরশ্রী কাতরতা, পরনিন্দা প্রভৃতি কুচিন্তা তোমার হৃদয় কণতরেও স্পর্শ না করে; অপরের ধন, জন, সৌভাগ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অযথা অশান্তি সৃষ্টি করিও না, নিজ অবস্থা অতি মন্দ হইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে সচেষ্ট হইও। কাহারও চরিত্রে দোষ গুণ অবলোকন করিলে বরং তাহার গুণের প্রশংসা করিও, কদাপি তাহার দোষের বিষয় আলোচনা করিও না। কারণ শাস্ত্রে আছে,—

গৃহ্ণাতি সাধুরপরস্ত গুণং ন দোষান্,
দোষাদিতো গুণি-গুণান্ পরিহায় দোষম্।

বালস্তনাৎ পিবতি দুগ্ধমসৃগ্ বিহায়,
ত্যক্ত্বাপয়োরুধিরমেব পিবেৎ জলৌকা।

অর্থাৎ মহাপুরুষগণ অপরের দোষগুণ মধ্যে তাহার কেবল গুণের ব্যাখ্যা করেন, তাহার দোষের প্রতি দৃক্পাত করেন না; কিন্তু অসাধু ব্যক্তিগণ অপরের দোষগুণ মধ্য হইতে কেবল দোষই দেখিয়া থাকে, তাহার গুণের প্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। শিশু তাহার মাতৃস্তন হইতে রুধির পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধই পান করে; কিন্তু জলৌকা (জোঁক) সেই স্তন হইতে দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল রুধির পান করিয়া থাকে।

পরের মন্দ চেষ্টা, পরের কুৎসা, পরের প্রতি কঠোর দণ্ডবিধান করিও না। সর্ব্বদা স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে রত থাকিও। দেখিবে তোমার হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব শান্তিরসে মগ্ন হইয়া যাইবে, কি এক স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া শান্তিদেবীকে তোমার নিত্য সহচরী বলিয়া বোধ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—মানব অতিশয় স্বার্থপর কেন? কারণ পরিদৃশ্য মান জীবলোকে ভূমিষ্ঠ হইবার পরমুহূর্ত্তেই আমাদের আত্মপর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই আত্মপর জ্ঞান শিশুদিগের হৃদয়ে এরূপ সূক্ষ্মতম ও প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করে যে, ইহার প্রভাব সর্ব্ব প্রথমে সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, কিন্তু প্রতি পল, প্রতি দিবস, প্রতি মাসে পর্য্যায় ক্রমে ইহার কলেবর অপেক্ষাকৃত স্থূলতর ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শিশুর পূতান্তঃকরণে অলক্ষিতভাবে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হয়। যখন কোন শিশু সপ্তম বা অষ্টম মাসে উত্তীর্ণ হয়, যখন এই ভূমণ্ডলস্থ মায়াবিনী যাবতীয় কুহেলিকা তাহার পবিত্র অন্তরাকাশ সমাচ্ছন্ন করিতে সচেষ্ট নহে, যখন তাহার ওষ্ঠদ্বয়াভ্যন্তর হইতে অস্ফুট শ্রবণ মধুর নিস্বন ভিন্ন আর কিছুই বিনিসৃত হয় না, তৎকালীন তাহার অন্তরেও প্রধূমিত বহ্নি সদৃশ আত্মপর জ্ঞান ঈষৎরূপে পরিদৃষ্ট হয়। যখন কোন শিশু জননী অঙ্কে শায়িত হইয়া তাঁহার একটী স্তনপানে রত থাকে, দ্বিতীয়টী অপর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এই আশঙ্কায় তখন সে অপর স্তনটী স্বীয় কনীয় করতলে আচ্ছাদন করে; এতদবস্থায় যদ্যপি তাহার এবম্বিধ সত্ত্বের কোন অংশীর আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত শিশুটীর ঈর্ষান্বিত তীব্র রোদন ধ্বনি তাহার নবোদিত আত্মপর জ্ঞানাঙ্কুর মানব প্রত্যক্ষে সংস্থাপন পূর্ব্বক

শিশুকাল হইতেই ইহার প্রতীকার বিধানের আবশ্যকীয়তা স্মরণ করাইয়া দেয়। ক্রমে যখন তাহার বাক্য স্ফুরিত হয়, তখন "এই দ্রব্যটী আমার, ওটী অপরের, আমার দ্রব্য অপরে কেন লইল ?" এবম্প্রকারে সময়ে সময়ে কলহ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। এই আত্মপর জ্ঞান কি মানবের ভাবী আত্মোন্নতি পথ দুর্গম করে না ? ইহা কি মানবের উন্নতি সোপানের পথরোধ পূর্ব্বক আশানুরূপ অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে মানবকে আবর্জ্জনাময় অধোতম তিমিরাচ্ছন্ন শৈল কন্দরে নিক্ষিপ্ত করে না ? প্রতি পদবিক্ষেপে মানব কি ইহা কর্তৃক নিয়ত প্রতিহত হইয়া এক সময়ে স্বকীয় জুগুপ্সিত ক্রিয়াকলাপের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক অনুতাপানলে অহরহ দগ্ধীভূত হয় না ? শৈশব হইতেই এই কুফল প্রসূ আত্মপর জ্ঞানের প্রতীকার বিধানাভাবে বয়োঃবৃদ্ধির সহিত ইহা বৰ্দ্ধিত হইয়া ভবিষ্যতে অন্তঃকরণের নীচতা উৎপাদন পূর্ব্বক বড়ই বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকে। অতএব শিশুকাল হইতেই ইহার বীজ উন্মূলিত করিতে যত্নবান হওয়া সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়।

শৈশব ও পৌগণ্ড অতিক্রমনানন্তর মানব যখন কাম, ক্রোধাদি ভীতিপ্রদ অন্তঃশত্রু ব্যাল সমাকীর্ণ দুস্তর সংসার পারাবারে অবতরণ করে, তখন তাহার আত্মপর জ্ঞান এরূপ বিষময় ফলপ্রদ হয় যে, তৎনিরাকরণার্থ মানব একান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তদীয় জীবনাধিপণেও তৎকবল হইতে স্বীয় মুক্তি লাভ করিতে অসমর্থ হয় এবং তৎজাত দুর্বিষহ যাতনা ও দুরপনেয় কলঙ্ক নীরবে বহন করিতে থাকে।

স্বার্থ নিবন্ধন মানব বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, অন্তরঙ্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। স্বার্থ হেতু বনিতাদিগের জীবন সর্ব্বস্ব ও একমাত্র পরমারাধ্য স্বামী প্রতি ভক্তি ও প্রণয়ের শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং শৈশবাবস্থায় নয়নপ্রান্তে অশ্রু বিন্দু দর্শনে যিনি স্বীয় অশ্রুসংবরণে অসমর্থা হইতেন, প্রত্যুত্তরের বিলম্বে স্নেহালিঙ্গন দানে তদীয় কপোল দেশ অসকৃৎ চুম্বনেও যাঁহার তৃষ্ণা তৃপ্তি লাভ করিত না, হৃদয়ের মালিন্য জনিত ক্ষীণ প্রতিবিম্ব নয়ন প্রান্তে প্রকটিত হইলে তৎদূরীকরণার্থে অহর্নিশি যিনি সচেষ্ট থাকিতেন, হায়! স্বার্থপরতার এমনই মোহিনী শক্তি যে সময়ে ইহা জীবনাধিক পুত্র ও তৎপ্রতি এবম্বিধ পরমারাধ্যা জননীর স্বর্গীয় পুত্রবাৎসল্য মধ্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক দুইটী স্বভাবজ

প্রযত্ন সম্বন্ধকে স্বতঃই এক হইতে অপরকে পৃথক করিয়া দেয়, এরূপ দৃষ্টান্ত অধুনা বিরল নহে।

সচরাচর দৃষ্ট হয় যে, স্বার্থ ভিন্ন কোন ব্যক্তি কাহারও সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেনা, যে জন যাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনে কৃতযত্ন হয়, সেই ব্যক্তি তৎসদনে স্বানুকুল্য বা স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দতার প্রত্যাশা করে। আত্মপরতা পথপ্রদর্শকরূপে স্বার্থান্ধ মানবকে নিয়ত ঘৃণ্য পথে চালিত করিয়া কিরূপে নগণ্য পশু স্বভাব সহিত মানবস্বভাবের তুল্য সম্বন্ধ করিয়া দেয় তাহা মুহূর্ত্ত নিমিত্ত স্মৃতিপটে উদিত হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, দুঃখ ও শোকে অভিভূত ও জর্জ্জরিত হইতে হয় এবং ঘৃণা ও লজ্জা বশতঃ সর্ব্বসমক্ষে শতধিক্কারে স্বীয় স্বার্থপরতা জনিত দুষ্কর্ম্মের ও আপনার আত্মগ্লানি পূর্ব্বক হৃদয়ের নীচতার গুরুত্বের কিয়ৎপরিমান জ্ঞাপনেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। পশু, পক্ষীগণও ত আপন আপন স্বার্থান্বেষণে সতত তৎপর, তাহারাও ত স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রাদির সুখ স্বচ্ছন্দতা ব্যতীত অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, তাহাদের আজীবন আহার, বিহারে অতিবাহিত হয়, সুতরাং ইহারা স্বার্থপর মানবাপেক্ষা কোনও অংশে অপকৃষ্ট বা অবজ্ঞেয় নহে; যদ্যপি তুমি আত্মপরতাকে স্বীয় হৃদয়াভ্যন্তরে প্রশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক অহর্নিশি আপন স্বার্থানুশীলনে তৎপর হও, দরিদ্র নিবন্ধন অপরের ক্লেশোপনোদনার্থে, জগতের কষ্টে স্বয়ং কষ্ট অনুভব করিয়া তৎ দূরীকরণার্থ ভ্রমেও তোমার চিন্তার উদয় না হয়, কি প্রকারে জগতের উপকার হয়, কি করিলে জগতের অপরিমিত দুঃখরাশি অপগত হয়, কি উপায়ে জগৎ অন্ন ও পরিধানাভাব নিবন্ধন দুঃসহনীয় দারিদ্র হইতে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়, এইরূপ মহদনুশীলন যদ্যপি তোমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ না করে, অপরের প্রতি তোমার সহানুভূতি যদ্যপি পরিলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে যেরূপ অরণ্যজাত মনমুগ্ধকর ও নয়ন রঞ্জন প্রসূন অরণ্যে সৌরভ বিতরণ পূর্ব্বক অরণ্যেই নীরবে ও অলক্ষিতভাবে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ বিচক্ষণ প্রজ্ঞ, মতিমান ও সুবিবেচক হইয়াও এই বিশাল সংসারে মানব জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আজীবন স্বীয় সুখসচ্ছন্দতায় কালক্ষেপ করিয়া যখন জগৎ হইতে অপগমন করিবে তখন তোমার সহিত তোমার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে, তোমার নাম ক্ষণিকের নিমিত্ত কাহারও স্মৃতিপটে উদিত হইবে না। তোমার

নাম জগতে চিরকাল অপরিচিত রহিয়া যাইবে। এতদপেক্ষা মানবের দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? পরিতাপের বিষয় মানব ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও এই আত্মপরজ্ঞানের অপনোদনার্থ কিছুমাত্র যত্নশীল অথবা বদ্ধপরিকর হয় না। এবং অনেকে স্বীয় হৃদয়ে এই আত্মপরতাকে পোষণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে আপনাকে সাতিশয় গৌরবান্বিত ও বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া স্বীয় বর্ব্বরতার পরিচয় প্রদান করে। হায়! এবম্বিধ মানব স্বার্থপরতার বিষময় পরিণাম সম্যক্ অবগত নহে, ইহা কিরূপ ক্লেশ ও যাতনা প্রদ তাহা তাহারা বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহে। স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয় কদাপি উন্নত ও প্রশস্ত হয় না। যদ্যপি মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভে অভিলাষী হও, সংসারে পত্নী, পুত্র, কন্যা পরিবৃত হইয়া আদর্শ সংসারী হওয়াই তোমার মুখ্য লক্ষ্য হয়, যদ্যপি নিখিল জগতের স্নেহ, ভালবাসা ও ভক্তি প্রাপ্ত হইতে আশা কর, যদি পরাৎপর বিশ্বপাতার চরণাম্বুজ চিন্তার মধুরতা আস্বাদন অথবা দেহান্তে পরা-শান্তির লাভাভিলাষী হও, তাহা হইলে নিঃস্বার্থভাবে ও কায়মনবাক্যে পরো-পকারে প্রবৃত্ত হও। অপরকে আত্মীয় জ্ঞানে, স্নেহশীলকে স্নেহদানে, গুরুজন প্রতি যথার্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বদ্ধ পরিকর হও।

এইরূপে ক্রমে যখন তোমার সুকৃতি উদয় হইবে, তখন সর্ব্বজন সহাস্য-আননে তোমার সাদর সম্ভাষনে তৎপর হইবে, সকলে তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলাকাঙ্খী হইবে, যেন জগৎ তোমার কত আত্মীয়, যেন তুমি জগতের কত স্বজনরূপে পরিচিত হইবে "নিঃস্বার্থই মুখ্য উদ্দেশ্য" এই মন্ত্র হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া জগৎ সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া যাও, বীরোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যাও, কেহ যদ্যপি অজ্ঞতা প্রযুক্ত কোনরূপ বিদ্রুপাত্মক বাক্য কহে অনিমিত্ত বিরস না হইয়া উহা 'শব্দ মাত্র জ্ঞানে হৃদয়াভ্যন্তরে উহার প্রবেশাধিকার হরণ পূর্ব্বক তোমার পথে তুমি অগ্রসর হইয়া যাও, নিবৃত্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা না হারাইয়া আবার কহি জগৎ সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া যাও। এমন সুসময় স্বতঃ উদয় হইবে যাহাতে তুমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবে। জগৎ তোমার অতিপ্রিয়জন হইয়া উঠিবে। যে জগৎ পরিত্যাগার্থ যে লোক সমাগম হইতে দূরাবস্থানার্থ এক সময়ে তুমি অতিশয় বিচলিত হইয়া-ছিলে, যে জগৎ চিরশত্রু ভ্রমে তোমার নিকট যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদ হইত

তখন দেখিবে স্নেহাধিক্যবশতঃ জগৎ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না, তুমিও জগৎ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পার না, যেন উভয়ে কত সৌহার্দ্দ শৃঙ্খলে নিবদ্ধ, যেন উভয়ে জন্মজন্মান্তরে কত পরিচিত। অতএব হে পাঠকপাঠিকাগণ! এইরূপ অত্যুগ্র বিষময় ফলপ্রদ আত্মপরতাকে প্রশ্রয় না দিয়া উহা হইতে দূরে অতিদূরে অবস্থিত হইয়া আপনাক সংযত পূর্ব্বক জগৎপ্রতি প্রকৃত উদারতা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে যত্নশীল হও। দেখিবে তোমার শোক, দূরীভূত হইবে, এবং শান্তিদেবী তোমার নিত্য সহচরী হইবে।

শ্রীচুনীলাল চন্দ্র।

ভাবোচ্ছ্বাস।

—:০:—

[শ্রীশ্রীপাদপদ্ম দর্শনে]

(গান—প্রসাদী সুর)

ঠিক্ থাকা চাই আদত্ মূলে।
তবে পাবে শ্যামে হৃদ্ কমলে॥
ও সে ভাবীর কাছে, প্রাণটী ছাঁচে, ঢাল দেখি সুনির্ম্মলে।
হবে মালটী খাঁটী, পরিপাটী ; লাভালাভ্‌টী মনের বলে॥
নামেতে প্রাণ শোধন পোষণ, কাজের হাসিল চতুর হ'লে।
(ও তার) কৃষ্ণময়, প্রদীপ্ত আঁখি, ঝুরে সদা প্রেমের জলে॥
ওসে, হ'য়ে বিভোর, মায়ার, কদর, দূরে ফেলি' সাধন ফলে—
পদসেবা লেগে, অনুরাগে, জগৎ মাতায় হরি বোলে।
ও সেইভক্ত-বৎসল, কৃষ্ণ কমল, তারে ভুলতে নারে কোন কালে।
যত হৃদয় ব্যথা, করে মমতা, রাখে ভক্তে চরণ তলে॥
এ হেন প্রাণ, চির আয়ুষ্মান্, তার কি রে ভয় কোন কালে!
ও তুই রাতুল চরণ, কর্‌রে স্মরণ।—
দেখিস্ ললিত বাস্‌না ভুলে॥

দীন— শ্রীললিত মোহন মণ্ডল।

প্রশ্নের উত্তর।

—:•:—

প্রথম প্রশ্ন। ভাবুকতা এবং শঠতা এক সঙ্গে থাকা সম্ভব কিনা!

উত্তর। খুব সম্ভব। আমরা সচরাচর যে ভাবুকতা দেখিতে পাই তাহা অনেক সময় প্রশংসা লোভ প্রনোদিত; উহা ব্যক্তিগত না হইয়া জন সমাজেই বেশী ব্যক্ত হয়, সেখানে লোকের চক্ষুর সোৎসুক দৃষ্টি এবং সম্ভবত সাশ্চর্য্য প্রতীক্ষা তাহা দিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। নির্ম্মল ভগবদ্ভক্তি এমন লোক মান্যের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে যে একটাকে আর একটা হইতে তফাৎ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়; এরূপ প্রশংসা লোভ যে সব সময় খারাপ তাহা নহে। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম উন্মেষে উহা একটা প্রবল শক্তির রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে কর্ম্মের প্রবৃত্তি দেয়। কিন্তু কর্ম্ম বাহিরের জিনিষ যখন ভিতরটা পরিষ্কার করার সময় আসে, সেখানে লোকের সমালোচনা প্রবেশ করিতে পারেনা। তখন সকলেই যে সেই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে তাহা নহে অনেকেই পড়িয়া যায়; অনেকে গুহাস্তিত ধর্ম্মের সহবাস সহ্য করিতে না পারিয়া, সাম্প্রদায়িক এবং সামাজিক ভাব অবলম্বন করিয়া এক প্রকার সমাজিক ধর্ম্ম পালন করিয় চলিয়া যান। এই সকল লোক কঠিন পরীক্ষায় ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেয়। যাহারা ধর্ম্মকে দেখাইবার জিনিষ মনে করে তাহাদেরই এই দশা হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। অসৎ প্রবৃত্তি থাকিতে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব কিনা না।

উত্তর। তাহা সম্ভব নহে। ভগবানকে আমাদের অন্তর্জীবনের পরিরক্ষক হইতে না দিয়া যখন আমরাই সেই ভাব গ্রহণ করি তখন ভগবানকে আমরা আমাদের চিন্তার অনুরূপ করিয়া লই। ভগবান্ তখন আমাদের সৃষ্ট ভগবান্ তখন তিনি স্ব প্রকাশ ভগবান নহেন। ভগবান বাহিরের সর্ব্ব সংশ্রব বিরহিত হইয়া যখন নির্ম্মল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন তখন তিনি কোন কুসংস্কার, অপবিত্র ভাব অথবা সঙ্কীর্ণতা মনে রাখিতে দেন না।

ক্রমশঃ শ্রী—

ভক্তি।

শ্রাবণ মাস, ১২শ সংখ্যা—৯ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং
পতিতং ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎকুরু॥

হে শ্রীহরে! আমি সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী, তাই অতি ভয়ানক সংসার সাগরে নিপতিত। আমি গতিহীন, তাই তোমার শরণ লইলাম। কৃপা করিয়া আমাকে তোমার করিয়া লও আমি তোমার হইয়া সকল দুঃখ ও সকল যন্ত্রনার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করি।

প্রভো! আমি তোমার এই ভাবটী কবে স্থায়ী করিয়া দিবে, কবে এই ভাবটী দৃঢ় করিয়া দিবে। সময় সময় যখন আমি তোমার এইভাব আসে তখন যে কত দূর সুখ, কতদূর আনন্দ পাই তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু আবার কেন সেইভাব ভুলিয়া গিয়া যে যাতনা সেই যাতনা ভোগ করি? কেন তোমাকে ভুলিয়া যাই? আমার স্ত্রী পুত্র, আমার আত্মিয় স্বজন, আমার বিষয় বৈভব ইত্যাকার নানা প্রকার ভাবিয়া ভাবিয়া আমি যে একে-বারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এখন তোমার কৃপায় ক্রমে ক্রমে দেখিতেছি যে, যাহাদের আপন ভাবিয়া মজিয়াছি তাহারা সকলেই আমার

সর্ব্বনাশে উদ্যত। বিপদ বারণ! হায়—হায়—এঘোর বিপদে দীনহীনকে রক্ষা করিতে তোমা ভিন্ন আর কে আছে? একবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া দেখ যে, আমি তোমার কৃপার উপযোগ্য পাত্র কি না?

স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় স্বজনগণকে আমার আমার ভাবিয়া আমি সরল মনে ভাল বাসিতে গেলেও তাহারা বিষপূর্ণ কুম্ভের মুখে সামান্য মাত্র মিষ্টান্ন রাখিয়া যেমন গ্রহণকারীকে ভুলায়, সেইরূপ, কুটীলতা কপটতাদি কুৎসিৎ ভাবে দ্বারা অন্তর পূর্ণ করিয়া কেবল মুখে আমি তোমার আমি যথার্থ ই তোমাকে বড় ভালবাসি ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলোভনের দ্বারা ভুলাইয়া রাখিয়াছে ও রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। নাথ! জ্ঞান আঁখি উন্মিলন করিয়া দাও যেন উহাদের প্রলোভনে না ভুলিয়া অবিচারে তোমার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারি। সংসার সাগরে যতদূর ডুবিয়াছি আর যেন ডুবিতে না হয়, যত ভাবনা ভাবিয়াছি আর যেন ভাবিয়া আকুল হইতে না হয়, এবার তোমার প্রেম সাগরে ডুবাইয়া, রাখ, তোমার ভাবরূপ ভাবনা দিয়া ভুলাইয়া রাখ, আর আমার আমি ছাড়িয়া যাহাতে তোমার হইয়া থাকিতে পারি, তাহা কর।

প্রভো! তুমি নিজেই বলিয়াছ বটে যে, যে আমার নাম করে আমি তাহার হইয়া থাকি, তাহার সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে আমিই তাহাকে রক্ষা করি। কিন্তু নাথ! আমি তো নাম করিতেও জানিনা, দয়া করিয়া নাম করিবার শক্তি দাও এবং করিতে শিখাইয়া দাও। প্রাণ নাথ! তুমিত আমার আপন হইয়াই আছ কিন্তু মায়ার ছলনায় আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা তুমি বুঝাইয়া দাও। জাগতিক অন্য কোন বিপদ আপদের হাত হইতে রক্ষা হইবার জন্য আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিনা; কেবল এই ছয়টা দস্যুর হাতে পড়িয়া আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি তথাপিও ইহারা ছাড়িতেছে না; তুমি দয়া করিয়া ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া, দীনতারণ, বিপদবারণ, প্রভৃতি ভক্তদত্ত নামের সার্থকতা কর। আজ আমি এই ভীষণ সংসার সাগরে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রনা পাইয়াও যদি তোমার কৃপা লাভে বঞ্চিত হই, তবে বুঝিব তুমি অধমতারণ, বিপদ বারণ, দীন দুঃখহারী নয়, তবে বুঝিব যে বিপদে পতিত হইয়া তোমাকে ডাকিলে তুমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারনা।

হরি হে! আমি অতি দীনহীন আমার যে কি গতি হইবে জানিনা। তাই বোধ হয় অন্তর্য্যামি পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেব অন্তরের বেদনা বুঝিয়া আমাদের প্রার্থনার জন্যই প্রেমভরে গাহিয়া ছিলেন :—

হরি আমি অতি দীন, পাপেতে মলিন,
　　কি হবে উপায় বলনা।
বল আর কোথা যাব, কারে বা ডাকিব
　　কে জানিবে মন বেদনা॥

বিষয় বাসনা বড়ই প্রবল,
কি করি উপায় নাহি সাধন বল,
আমায় যেনে দীনহীন, ভজন বিহীন
　　যেন তুমি নিদয় হ'ওনা॥

সংসার সাগরে পড়েছি এবারে,
উঠিবার আশা করিনা,
যদি নিজে কৃপা করি, দাও চরণ তরি
　　তবে বুঝি ডুবে মরিনা॥

রিপু ছয় জনে লইয়ে এবার,
কোথা যাবে তাতো জানি না,
দীন এই ভীক্ষা চায়, যথা তথা যায়,
　　মন যেন তোমায় ভোলেনা॥

হরি হে! আজ আমিও প্রার্থনা করি যেন সংসার সাগরে ডুবিয়া না মরি, যেন সাধন ভজনহীন বলিয়া তোমার কৃপালাভে বঞ্চিত না হই, যে কোন অবস্থাতেই থাকিনা কেন, যেন মন তোমাকে না ভোলে। দয়াময়! দয়াকর! দয়াকর!!

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

" বর্ষশেষে প্রকাশকের নিবেদন।"

—:•:—

প্রিয় সহৃদয় ভক্ত পাঠক মহোদয়গণ! মঙ্গলময় করুণানিদান শ্রীহরির কৃপায় দেখিতে দেখিতে শত শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাদের আদরে পালিতা "ভক্তি" পত্রিকা খানি আজ ৯ম বর্ষ অতিক্রম করিলেন। আগামী ভাদ্রমাস হইতে ১০ম বর্ষে পদার্পণ করিবেন। এবার বর্ষ আরম্ভ হইবার পর মাত্র তিন সংখ্যা কাগজ বাহির করিয়াই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মমাগ্রজ পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয় মানবলীলা সম্বরণ করতঃ শান্তিময় নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কীটানুকীট পত্রিকা প্রকাশে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও কলি পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ সম্ভূত প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় পত্রিকা পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিয়া ভক্ত মণ্ডলীকে যে আনন্দ দান করিয়াছেন তজ্জন্য ভক্তগণও এ অধম তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ।

আমি অতি নগন্য তথাপি পূজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভক্তি খানি ছাড়িয়া দিব দিব ভাবিয়া প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল ঐ সময় অনেকেই আমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানিয় ভক্তগণ ও বিদেশ হইতে যাঁহারা আসিতে পারিয়াছেন তাঁহারা আসিয়া দর্শনদিয়া আর যাঁহারা আসিতে পারেন নাই তাঁহারা পত্রাদি দ্বারা সহানুভূতি ও পত্রিকা প্রচারের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিব।

বন্ধুগণ! জীব মাত্রেই আশার দাস, আশার যদি ক্রমে বৃদ্ধি না হইত তবে মানুষ কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হইতনা সুতরাং আশাই সকল কার্য্যের মুল। আমিও শ্রীগুরুদেবের চরণ স্মরণ করিয়া আগামী বর্ষে ও যাহাতে ভক্তি পত্রিকা-খানি নানা প্রকার সরল প্রাণের ভাবোচ্ছ্বাসাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া আপনা-দিগের করে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, সেই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া পত্রিকা প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইলাম ও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম, এক্ষণে শ্রীভগ-

বানের কৃপা এবং আপনাদিগের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও সহানুভূতিই আমার একমাত্র ভরসা।

এরূপ পত্রিকা প্রচার কার্য্যে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য, কেন যে প্রভু আমাকে এরূপ বৃহৎকর্ম্ম সাগরে নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন, তিনি ইচ্ছাময় তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমার বিদ্যাবুদ্ধি, ভাব ভক্তিতো নাই—ই এমনকি দুটা মিষ্টি কথা বলিয়া যে আপনাদের মনোরঞ্জন করিব সে ক্ষমতাও নাই। তবু বামনের চাঁদ ধরিবার আশা করার ন্যায় আজ বামন অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়া ভক্তি চন্দ্রমাকে ধরিয়া আনন্দ পাইব বলিয়া অগ্রসর হইতেছি, জানিনা আশাপূর্ণ হইবে কি না। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট বিনীত নিবদেন যে, আপনারা প্রবন্ধাদির দোষগুণ বিচার না করিয়া ভাব গ্রহণ করিয়া আপনাপন মহত্বের পরিচয় প্রদানে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

অগ্রজ মহাশয় যে উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন যদিও তিনি অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন, অবশিষ্ট কত দিনে যে আমাদের দ্বারা পূর্ণ হইবে তাহা জানি না আর পূর্ণ হইবে কিনা তাহাও বলিতে পারিনা, তবে ভরসা আছে যে "সৎ ইচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান" দেখি তাঁহার কি ইচ্ছা।

নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার উপকার সূচক পত্রাদি আসিয়াছে ও আসিতেছে যে, তাপিত প্রাণে শান্তি দিতে, ভাবভক্তিহীন পাষাণ-সম-হৃদয় ভক্তি-রসে বিগলিত করিতে গুরু স্থানিয়া ভক্তি যেন বন্ধ না হয়। যদিও খ্যাতি প্রতিপত্তি বা অর্থোপার্জ্জনই এই পত্রিকা প্রচারের মূখ্য উদ্দেশ্য নয় তথাপি ভক্ত-গণের নানা প্রকার উপকার সূচক পত্রাদিপ্রাপ্তে উৎসাহিত হইয়া পত্রিকা প্রচারে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলাম, জানিনা ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা, জানিনা সর্ব্বান্ত-র্য্যামি শ্রীভগবান কতদিন এরূপ ভাবে ভক্ত মণ্ডলীর সহিত ভক্তির আলো-চনায় নিযুক্ত রাখিবেন।

ভক্ত পাঠক মহোদয়গণ! আর বৃথা বাচালতা করিয়া আপনাদিগের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিনা। পরিশেষে আপনাদিগের নিকট নিবেদন যে, এই নয় বৎসর যাবৎ যেরূপ স্নেহের চক্ষে "ভক্তি"কে দেখিয়া আসিতেছেন এবং বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে যথাসাধ্য প্রচার করিয়া আসিতেছেন ও যাঁহার

যেমন শক্তি ও ভাবোচ্ছ্বাস তিনি তদনুরূপ প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া ভক্তির কলেবর পুষ্ট করিয়া আসিতেছেন, আগামী বর্ষেও যেন সেইরূপ সাহায্য লাভে বঞ্চিত না হই। "ভক্তি" আরম্বর পূর্ণ প্রবন্ধ প্রার্থনা করেনা কেবল পবিত্র হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসই প্রার্থনা করে। আমার ও বিশ্বাস যে, এইরূপ ভাবের উপদেশ পূর্ণ প্রবন্ধে অনেকেরই উপকার সাধিত হয়।

এবার নানা প্রকার বিপদাপদের জন্য পত্রিকা প্রকাশে কয়েক মাস বিলম্ব হইয়াছে এবং দুস্পরিহার্য্য রূপে যাহা মুদ্রাকরের প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে আশা করি সে সকলের দোষ গ্রহণ না করিয়া আপনাপন উদারতাগুণে প্রবন্ধের ভাব গ্রহণ করিয়া ও বন্ধুদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া সদাশয়তার পরিচয় দানে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। ভক্তগণের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শ্রীভগবানের কৃপাই আমার ন্যায় জ্ঞানহীন লেখকের একমাত্র সম্বল।

বিনীত প্রকাশক :—
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

যুগল-রূপ।

——:o:——

শ্যাম নব নব, শ্রীমতী তড়িত,
বিজড়িত দোঁহ দোঁহা।
অপরূপ রূপ, মধুর মিলনে,
কিবা,-অভিন দু'দেহা॥
মর কত মণি, মেঘ মনে গণি,
দামিনী চুমিছে তায়,—
অথবা যেমন, সুবর্ণ লতিকা,
শ্যামল তমাল গায়॥
(কিবা) কালিন্দির জলে, কণক কমল,
যেমন ফুটিছে হায়!
মিলন মারুতে, জলের হিল্লোলে,

কাঁপিছে কমল কায়॥
হিমাঙ্গের ছটা, শ্যামাঙ্গে পশিছে,
চমকে চপলা হেন।
পূর্ণমিক চাঁদ, সাগর তরঙ্গে,
ভাঙ্গা,—ভাঙ্গা, শোভে যেন॥
শ্যামাঙ্গের রশ্মি, হেমাঙ্গেতে পশি,
এমতি শোভিছে মরি!
হেম দরপণে, মর কত মণি,
যেমতি,—রয়েছে পড়ি॥
আধ শিরে চূড়া, মালতী মণ্ডিত,
শোভিত ময়ূর পাখে।
আধ শিরে বেণী, ফুলের গাঁথুনী,
অলিউড়ে,—ঝাঁকে ঝাঁকে॥
আধ ভালে, আধ,—চাঁদের উদয়,
কলঙ্কের ভাগ ছাড়া।
উষার অরুণ, আধেক উদিয়া,
চাঁদের সহিত যোড়া॥
আধ গলে শোভে,—কুসুমের হার,
আধ গলে,—গজ মতি।
মতির মাঝারে' ফুলের সাপিনী,
সে বড় সুন্দর অতি॥
আধেক উরসে, কণক কউটা,
বিচিত্র কাঁচলী ঢাকা।
আধ নীল ক্ষেত্র, তাহাতে বিচিত্র,
অসীমর শশী আঁকা॥
আধ কটি বেড়া, কণক কাঞ্চী,
কিঙ্কিণী বেষ্টিত আছে।
সুনীলসুপীত, সুন্দর কৌশেয়,

মরি কিবা আধে,—আধে !!
এক পদ তলে, মলয়জমাখা,
আরে,—অলক্তক রাগ।
মণির মঞ্জীর, যুগল চরণে
কৈছন করম ভাগ !!
রসের নাগর, রসের নাগরী,
মিলল নিকুঞ্জ মাঝে।
সখিগণ সবে, দেই কর তালী,
মদন পালায় লাজে ॥
চামর দোলায়, তাম্বুল যোগায়,
প্রিয় নম্র সখিগণে।
শ্রীরূপ মঞ্জরী, তাঁহার কিঙ্করী,
কাঙ্গাল বিজয় ভণে ॥

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

দয়াময় না নিঠুর ?

দয়াময় নাম, প্রভু, কে দিল তোমার ?
এত টুকু দয়া, মায়া নাহি তব হৃদে।
বড় ভালবাস তুমি কাঁদাতে ভক্তেরে ;
তোমা লাগি শত ভক্ত দিবানিশি কাঁদে।
বিবিধ বিচিত্র হর্ম্ম্য ছিল গো তাদের,
অমল ধবল শয্যা ছিল বিরাজিত;
অধিপতি ছিল তারা অতুল বিত্তের,
কত শত দাস, দাসী আদেশ পালিত।
মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা করিত যতন,
তুষিত প্রাণের প্রিয়া অমিয় সম্ভাষে ;
এইরূপ সম্ভোগে তারা করি তুচ্ছ জ্ঞান,
কতই যাতনা সহে তব কৃপা আশে !
হেন ভক্তে রাখ কেন তোমা হতে দূর ?
বড়ই নিঠুর তুমি বড়ই নিঠুর !

শ্রীচুনীলাল চন্দ্র।

ভক্তি সম্বন্ধে কাঙ্গালের প্রার্থনা।

—:০:—

প্রভু শচীনন্দন! এই যে,—অরুণাম্বর পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী দেবী প্রতিমাটী, অবনত মস্তকে কৃপা প্রার্থিনীর ন্যায়, তোমার শচীন্দ্র সেব্য চরণান্তিকে দণ্ডায়মানা,—ইনি কে,—চিনিয়াছ কি? ইনি তোমারই চরণ কমলাশ্রিতা,—অমৃত স্বরূপা "ভক্তি।" ইনি, তোমারই ভক্ত-হৃদয়-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

প্রভো! দেখ,—দেখ,—বারেক চাহিয়া দেখ,—ইঁহার নয়ন জলে পৃথিবী পৃষ্ঠ পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। আত্যন্তিক মনবেদনার দারুণ উত্তাপে, ইঁহার হৃদয় সরোবরের সমস্ত জল রাশি বাষ্পাকারে উর্দ্ধে উঠিয়া, কণ্ঠ রোধ করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং ইনি যাহা বলিতেছিলেন,—তাহা আর বলিতে পারিতেছেন না।

সতী—যেন লাঞ্ছিতা বি-তাড়িতা হইয়া অবমাননায় আত্ম-নিবেদন করিতে ও তোমার চরণে মিশিয়া থাকিতেই আসিয়াছেন;—এমন বোধ হয়।

দয়াময়! তোমারই প্রেষিতা ভক্তি, আজ কোথাও তিষ্ঠিতে না পারিয়া, তোমারই শ্রীচরণ সমীপে উপনীতা। কথা কহিতে না পারিলেও, অবস্থা দর্শনে উঁহার মনের কথাগুলি, আপনা আপনি দর্শকের কারুণ্য-রস-মার্জ্জিত হৃদয় পটে সহসা অঙ্কিত হইয়া পড়ে।

প্রভো! দেখ,—দেখ, একবার কৃপানেত্রে চাহিয়া দেখ;—ভক্তি দেবীর আজ কি অসাধারণ দুরবস্থা, দর্শনে পাষাণও ফাটিয়া যায়। তর্ক বিতর্কের নিদারুণ উষ্ম-রশ্মিতে সতীর সর্ব্বাঙ্গ যেমন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

ঐ দেখ,—মুখ কমল বৃন্তভ্রষ্টাশ্রয়-পীড়িত। কমল দলের ন্যায় শুষ্ক ও মলিন। এখন আর সেই ভক্ত-জন নয়নানন্দিবিদ্যুদ্বিনিন্দী সুমধুর হাস্যছটা নাই! শরীরের সে, ঢল ঢল লাবণ্য-লহরী নাই! সে, ভুবন মোহন সৌন্দর্য্য অলোক সামান্য মাধুর্য্য নাই! সে কোমলতা, স্নিগ্ধতা নাই! মালতী মণ্ডিত মস্তকের সে বেণী বিলাস নাই! অসম্ভব অঙ্গ প্রভা নাই। কি

আছে? নাই বলিতে কিছুই নাই!!! কেবল প্রাণ মাত্র লইয়া কোন মতে তোমার সমীপস্থা।

মনে করিয়াছিলাম, জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন, এই ভক্তি চিন্ময়ীর চরণ ছায়ায় থাকিয়া, তোমার লীলা গুণ গান করিব, তোমার প্রেমামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইব, কিন্তু তা আর পোড়া কপালে ঘটিয়া উঠিল না। অদম্য শত্রুর নিপীড়নে, দেবী আর জীব জগতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

জ্ঞানচর্চ্চা, বিচার বুদ্ধি, সাম্প্রদায়িকতা, কুল, শীল, জাতি, বিদ্যা, রূপ, যৌবন প্রভৃতি সমূহ শত্রু ভক্তির বিপক্ষে দণ্ডায়মান। এদিকে আবার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি কুমতির মন্ত্রণা বলে, ভক্তি দেবীর যে বিশ্রাম ভবন ভক্ত হৃদয়, তাহা কাড়িয়া লইয়া, তাহাতে কুমতির আনন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উঃ! কি পরিতাপের বিষয়! কি মর্ম্ম বিদারক দারুণ কষ্ট!! এই ভক্তি দেবী, শত্রু তাড়নে বিচ্যুতা হইয়া, কাঙ্গালিনীর বেশে, অবশেষে তোমারই চরণ ছায়ায় আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন।

আরোও একবার, এই ভক্ত হৃদয় বিহারিণী ভক্তি, শঙ্কর ও বৌদ্ধ দলের অবৈধ উৎপাতে, নরলোক হইতে অন্তর্হিতা প্রায় হইয়াছিলেন। যখন যবন রাজার যথেচ্ছাচারে জগত বিকম্পিত হইতেছিল, তখনকার কথা মনে ভাবিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে, হৃদয়ের শোণিত ধারা শুকাইয়া যায়। মানুষের মন, মরিচিকাময়ী মরু ভূমির ন্যায় হইয়া গেল!! প্রেম ভক্তি কি? তাহা মানুষে জাগ্রত দূরে থাকুক স্বপ্নেও ভাবিত না। তখন, অর্থাৎ সেই দুর্দ্দিনে, সেই বিপ্লবের দিনে, তুমিই তোমার ভক্তিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমিই বিপক্ষ বিমর্দ্দন পূর্ব্বক, তাঁহার (ভক্তির) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতঃ এই কলি-কলুষ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত জগতে নামের সহিত প্রেমামৃত বর্ষণ করিয়াছিলে। সাঙ্গো-পাঙ্গসহ, শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়া, ত্রিতাপদগ্ধ দুর্ব্বল জীবের প্রাণ, ভক্তির শীতল জল সেকে জুড়াইয়া দিয়াছিলে। দুর্দ্দিন ঘুচিয়া জীবের সু-দিন আসিল; চির বিষাদিত মলিন বদনে, মধুর হাঁসি ফুটিল। ভক্তি-সুন্দরীর আঁচল ধরিয়া ধরিয়া, অশ্রু কম্প পুলক দেখাদিল। কুমতির পাষাণ প্রাসাদ ভক্তগণের ভৈরব গর্জ্জনে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল জ্ঞানের গর্ব্ব খর্ব্ব! অভিজাত্য সমূলে উৎপাটিত। ভেদ বুদ্ধি, অভিমান,

আত্ম শ্লাঘা, হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতা কোথায় চলিয়া গেল, তাঁহার আর খোজ খবর নাই।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি রিপুগণ, বিষশূন্য বিষধরের মত ভক্তগণের পদতলে পড়িয়া দলিত হইতে লাগিল !! আর সাড়াশব্দ নাই। দংশনতো-দূরের কথা, তখন আর "ফোস্ ফোস্" শব্দটী করিবার শক্তিও রহিল না।

ক্ষমা, ধৈর্য্য, তিতীক্ষা, শম, দম, বিবেক, বৈরাগ্য আসিয়া "জয় ভক্তির জয়, জয় ভক্তের জয়, জয় ভগবানের জয়" বলিয়া মনের আনন্দে ঘন ঘন, নাগরা পিটীতে লাগিল। জগত আনন্দে ডুবিয়া গেল, প্রেমে পাগল হইয়া উঠিল। আর কেবল জয় জয় গৌরাঙ্গ, জয় জয় গৌরাঙ্গ এই সুধা-নামের ক্ষুধা বিধ্বংসী মধুর নিনাদে, দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। হরি নামের প্রলয়ঙ্করী তুফান ছুটিয়া, নিন্দুক, পাষণ্ড প্রভৃতি বড় বড় গাছগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শেষ করিয়া দিল।

কই-,প্রভো! সে দিন কই? যে দিন তুমি এই ভক্তি প্রবর্ত্তনের জন্য, পতিত পাষণ্ডের উদ্ধারের জন্য, কাঙ্গাল বেশে, দেশে দেশে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলে যেদিন। এই ভক্তির বিস্তার কল্পে, অল্পে অল্পে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলে। যে দিন ভক্তির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সকলের নমস্য শিব! বতার অতি বৃদ্ধ পিতৃতুল্য সীতানাথকে তুমি প্রহার করিয়াছিলে। সহায় শূন্যা বৃদ্ধা জননী এবং পতিগত প্রাণা নব যৌবন সম্পন্না পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে। কই? প্রভো! সে দিন কৈ? যে দিন, হরি নামের তুমুল তরঙ্গে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত তরঙ্গায়িত হইতে ছিল, বৈষ্ণব, সাধু, সন্ন্যাসীর অকিঞ্চনা ভক্তির প্রভাব দর্শনে, জ্ঞান মার্গাবলম্বী দৈত্যদল পলায়ন পর হইয়াছিল।

কালের আবর্ত্তন চক্রে পড়িয়া, আজ চারিশত বর্ষাতীত হইল, সে সু-দিন, সেশুভযোগ অতীতের অন্ধকার কুক্ষিতে বিলয় প্রাপ্ত হইলেও, এখন পর্য্যন্ত সেই ভক্তি বিস্তারিণী লীলা মাধুর্য্যের চমক ভাঙ্গে নাই, সে, আস্বাদ অপসৃত হয় নাই। এখনও সেই আনন্দকোলাহলের দূরগত ধ্বনি, 'রিম্-রিম্-ঝিম-ঝিম" করিয়া, কাণের ভিতর না বাজিতেছে, এমন নহে।

সেই মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি, সেই ভক্ত কণ্ঠোচ্চারিত সু-মধুর হরি নামের ধ্বনি, এখনও আকাশের গায় মেঘের মত মিশাইয়া যায় নাই।

বিদ্যুৎ বহিয়া গেলে, খুব অন্ধকার হয় বটে; মানুষ বজ্রশঙ্কায় চক্ষু বুঁজিয়া থাকিলেও যেমন সেই বিদ্যুল্লতার আলেখ্যটী নয়ন পটে অঙ্কিত থাকে, তদ্রূপ, যদি তোমার ভক্তি-বিস্তারিণী অপূর্ব্ব লীলা, কাল মাহাত্ম্যে অতীতের অন্তরস্থ হইয়াছে, তথাচ জীব হৃদয়ে এখনও যে তাহার ক্ষীণ রশ্মি সময় সময় না ঝলসিতেছে, এমন নহে।

তথাপি তোমার ভক্তির অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরা, মুখ্যা, অহৈতুকা রূপে না হউক্, গৌণীরূপেও আর মায়া মুগ্ধ স্বার্থপর জগতে স্থান পাইতেছেন না। তাহা তো তুমি সাক্ষাতেই প্রত্যক্ষ করিতেছ। সাম্প্রদায়িকতার, দাম্ভিকতার, আত্ম-শ্লাঘার অসম্ভব অত্যাচারে, দেবীর দুর্গতির এক শেষ হইয়াছে।

প্রভুগো! দেখ, দেখ, এই উপায় বিহীনা অবনত বদনা ভক্তি সুন্দরী, কেমন স্তিমিত নেত্রে তোমার সুরেন্দ্র সেব্য চরণারবিন্দপানে চাহিয়া রহিয়াছেন!! আর উঁহার নয়ন পদ্ম নিঃসৃত ফোটা ফোটা উত্তপ্ত জল, তোমার চরণ পদ্মের কর্ণিকাভ্যান্তরে পতিত হইয়া, শ্রীচরণ শৈত্য, সু-শীতল, হইবার পর, চরণোদ্ভবা জাহ্নবীর ন্যায় অঙ্গুলীরূপ পদ্ম দল বাহিয়া ভূ-গাত্রে পতিত হইতেছে।

দয়াময় দীনবন্ধো! পতিতপাবন! আমরা ভক্তি হারা হইয়া বড় দুর্দ্দিনে পড়িয়াছি। এই দুর্দ্দিনে, তুমি বিনে আর কার কাছে দঁাড়াইব! প্রভুগো! তুমি বিনে পতিত জীবের উদ্ধার কর্ত্তা আর কে আছে? আমরা তুমি বিনে আর কার কাছে কাঁদিব? কার কৃপাশ্রিত হইতে যাইব। প্রভুগো! ভক্তি বিহীনের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও। দেখিয়া যাও, আমরা কলির জীব ভক্তি শূন্য হইয়া, দিবানিশি সলিল শূন্য সরোবরের মীনের মত ছট্ কট্ করিয়া মরিতেছি। প্রভু দয়াময়! আমরা জন্মে জন্মে তোমার শ্রীপাদ পদ্মে অপরাধী! তাই বলিয়া কি আমাদিগকে রিপুর হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া, তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে নাকি? ভক্তি শূন্য জগত যে কি ভয়ানক স্থান, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব!!

প্রভু কৃপাময়! কৃপা কর; কৃপা করিয়া আর এক বার এস। আসিয়া কলি পীড়িত দুর্ব্বল জীবের হৃদয়ে ভক্তি দেবীর অটলাসন প্রতীষ্ঠা কর। আর এক বারের মত, ভক্তির বিজয় পতাকা উড়াইয়া শ্রীহরি নামের মঙ্গল রোলে জগত পূর্ণ করিয়া দাও। অকিঞ্চনা ভক্তির বিস্তার করিয়া, তোমার ভক্তগণকে আবার অশ্রু কম্প পুলকাদি অষ্টালঙ্কারে সাজাইয়া দাও। তোমার ভক্ত-গণ নাচিয়া গাহিয়া তোমার মহিমা কীর্ত্তন, ও ভক্তির জয় ঘোষণা করুক্। প্রভো! এস, আর একবার এস। "সেবা রামের" স্বপ্ন সফল করিয়া দাও। আমরা পাপী তাপী ভক্তির শীতল ছায়া পাইয়া বাঁচিয়া উঠি, হরি বলিয়া নাচিয়া উঠি!!

আমরা আর তোমাকে পূর্ব্বের মত সন্ন্যাসী সাজাইবনা। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে দিব না। গম্ভীরায় মুখ ঘসিতে কি সমুদ্রে ঝাঁপ্ দিয়া পড়িতে দিবনা। এবার রাজা সাজাইব। প্রভু গো! আসিয়া আমাদিগকে ভক্তি দেও। আমরা এবার তোমার শ্রীচরণে কেবল ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি।

ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র, স্বর্গ, মোক্ষ, কি অষ্ট সিদ্ধি, আমরা তাহার কিছুই চাইনা। কেবল তোমার শ্রীপাদ পদ্মে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি। আর এই ভক্তিকে বুকে লইয়া ভক্তি প্রণত চিত্তে, রসিকের ধন তোমার রাঙ্গা পাদুখানি ভাবিতে ভাবিতে যেন মরিয়া যাই। হরি বোল! হরি বোল!! হরি বোল!!!।

জয় জয় শ্রীশচী নন্দন।
গোলকের ধন গোলক হৈতে, অবতীর্ণ অবনীতে,
আনন্দে ভরিল ত্রিভুবন॥
জয় জয় চারি পাশে, হরি নাম প্রেমোল্লাসে,
মাতিল অমর নরগণ।
পতিত পাষণ্ড যত, তারা হ'য়ে উনমত,

* এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। রসিকের ধন রাঙ্গা পা দু'খানি কবে গৃহে গৃহে বিরাজমান দেখিব? জগতে এ হেন শুভ দিনের উদয় হইবে কি? দয়াল নিতাই প্রাণ গোরাঙ্গের ইচ্ছা। ভক্তি-সম্পাদক

অবিরত করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
নদীয়া নগর মাঝে, ভক্তগণ সঙ্গে সাজে,
—শচীর দুলাল গোরা চাঁদ।
কি পুরুষ,-কিবা নারী, অপরূপ রূপ হেরি,
মনে গণে,—বড় পরমাদ ॥
রাধিকার রসে মাখা, নদীয়ার ভাবে ঢাকা,
—আবেশেতে "গর গর" মন।
কাঙ্গাল বিজয় বলে, ভাসিয়ে নয়ন জলে,
—কবে পাব হেন গোরা ধন ॥

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

প্রশ্নের উত্তর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

আমরা যখন ভগবানকে ভাবি তখন নানা বিষয়ে জড়িত করিয়া তাঁহাকে ভাবি, ভগবদ্ প্রাপ্তির অবস্থা 'সিদ্ধ' এই কথার ভিতর সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। ভগবানকে পাইলে সে সিদ্ধ হয়, যেমন কোন জিনিষ সিদ্ধ হইলে তাহার অবস্থান্তর লাভ হয়। শুধু একদিকে ভাব পরিবর্ত্তন হয় না তাহার অন্তর বাহির সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সেই অবস্থার ফল ভগবদ অনুভূতি। ভগবদনুভূতির ফল সে অবস্থা এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিনা কেন পারিনা বলিতেছি ভগবদ্দর্শন হইলে মানুষের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয় এবং সকল পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় একথা শুনিতে বেশ কিন্তু এর ভিতর একটা কথা আছে যাহা লোকে অন্যভাবে গ্রহণ করে; ভগবদ্দর্শন অর্থ যেন চোখ দিয়া কিছু দেখার মত সাময়িক এবং চকিত একটা কিছু। চোখ দিয়া দেখা আর অন্তর্দর্শন এদুইয়ের পার্থক্য

এত বেশী যে তাহা প্রকাশ করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। যাহারা ভগবদ্দর্শনকে চোক দিয়া দেখার মত একটা কিছু মনে করেন তাহারা উহাকে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক অনুভূতির মত প্রত্যক্ষ করিতে চান, তাহাতে যেন একটা অন্ধ, মুগ্ধ, এবং প্লাবিত বিস্ময় জীবনকে অভিভূত করিয়া দিবে। উহা যেন একটা কার্য্য কারণ হীন সৌভাগ্যের আকস্মিক আশীর্ব্বাদ। যেমন দশজনে একস্থানে বসিয়া অনন্ত নক্ষত্র মালা সমুজ্জল নৈশ আকাশে চাহিয়া আছেন তার মধ্যে একজন একটী উল্কা গমন দর্শন করিলেন; কারণ ঐরূপ দেখা তাহার অদৃষ্টে ছিল। ভগবদ্দর্শনকে যাহারা এই ভাবে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হন তখন তাঁহাদের প্রারম্ভিক সৎকর্ম্ম প্রসূত আত্ম প্রসাদ এবং আনন্দের সহিত একটা কল্পনা ময়ী ইপ্সা আসিয়া উপস্থিত হয়। সে কল্পনাকে বাস্তব জাগতের সীমা আকর্ষণ করিয়া নৈতিক জীবনের সম্বন্ধ বিচ্যুত করত শুধু একটা অনির্দ্দেশ্য আনন্দের সেবায় নিয়োজিত কর হয়। কিন্তু সেই রহস্যময় আনন্দে জড়তার অধিকারী বড় বেশী থাকে। তাহার সহিত ইন্দ্রিয়াদির আকাঙ্খা এবং পরিতৃপ্তির অনুকুল বিষয়ের মানষিক চিত্রের ছায়ায় তাহা বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত মনটাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে সমস্ত সত্বাকে আবৃত করিয়া ফেলিতে পারে। এই অবস্থা হইলে উহ দ্বারা আত্মার প্রসার আপনা আপনি হয় না। মানুষের সহিত সংসর্গই ইহার প্রাণ। মনুষ্য সমাজে অনুকুল বন্ধু সংসর্গে ইহার বৃদ্ধি হয় এবং বিপরীত অবস্থায় ইহার সঙ্কোচ হয়। একা একা ইহার মূল্য বড় বেশী থাকেনা। সাধারণ লোকে যাহাকে লোক দেখান ধর্ম্ম বলিয়া একটু কঠোর নিন্দা করে এ সেই অবস্থা। ধর্ম্মবন্ধু সহবাসে যখন এই প্রকার আনন্দের অনুশীলন হইতে থাকে তখন যে একটা প্রসারিত ভাব প্রাণে আসে তাহা; ব্রহ্ম ভাবে চিত্তের যে ব্যাপ্তি হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। এরূপ চিত্তের প্রসারতায় আর দশজন আমার সহিত সহায়ানুভূতি করিতেছে এই ধারনা প্রচ্ছন্ন থাকে। আমি ভগবানকে ভালবাসি ইহা সকলে জানে আর আমি ভগবানকে ভালবাসি ইহাকেহ জানেনা এদুই বড় পৃথক পদার্থ। কি আশ্চর্য্য ভাবে এই সকল ভাব ভগবদ্ভাব বলিয়া গৃহীত হয় তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন, লোক সমাজে আমার ভক্তির প্রশংসা হইতেছে শুধু ইহাদ্বারা

প্রাণে নানা প্রকার সুন্দর ভাব আসিতে পারে। কিন্তু তাহা অনিত্য; ফুংকারে তাহার জীবন, ফুংকারে তাহার মরণ।

ঈশ্বর দর্শন করিতেছেন অথবা অমৃত পান করিতেছেন উহা এই প্রকার ফুংকারে সর্ব্বস্ব ইহা ভাবময়ী আত্ম বিস্মৃতি মাত্র। বিস্মৃতি মোহ বিহ্বলতা ধর্ম্ম নহে, স্মৃতি, শান্তি, অতন্দ্রিত ভাব ইহার ধর্ম্ম। "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তেসর্ব্বসং শয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন দৃষ্টে পরা বরে"। ভগবদ্দর্শনের লক্ষণ ইহাই শ্রেষ্ঠতম পূর্ণতম। উহার বাহিরে কেহ বলিতে পারেনা। যখন ভগবদ্দর্শন হইবে তখন হৃদয়ের সমস্ত সং বৃত্তিগুলি সতেজ পূর্ণ থাকিবে। তখন অনাবিল কল্পনা বিরহিত অথচ অনন্ত, আত্ম পরিতৃপ্ত রূপে আভরণ হীন সত্য হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিশ্ব ব্যাপার কে দর্শন করাইবে। তাহাতে কিছু বাদ পড়িবেনা, কিছু অতিরিক্ত আসিবেনা। তখন প্রেম, আনন্দ এবং জ্ঞান এক সঙ্গে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বের অন্তরে যে বিশ্বের জীবন বাস করিতেছে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করাইবে। হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা এসকল কি ভগবদ্দর্শনে সম্ভব? হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অধীনতায় চির অচৈতন্য লৌহ শৃঙ্খল, আর ধর্ম্ম, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম সদৃশ স্বাধীন। তাহার বন্ধন নাই, তাহার নিদ্রা নাই, তাহার তন্দ্রা নাই, তাহার অসংযত, সামঞ্জস্যহীন, ভাব বিস্মৃতি নাই। সে কেবল স্থির নিত্য প্রবোধিত আনন্দ সত্ত্বায় নিমগ্ন। আমাদের অন্তরের মঙ্গল স্বভাব বৃত্তিগুলি যখন আনন্দে আপনাদিগের পূর্ণ অবয়ব লাভ করে যখন তাহাদের প্রত্যেকের সচেতন ক্রিয়া স্বাতন্ত্রে এক অখণ্ড সত্যানুভূতি গঠিত হয় তখনই ভগবদ্দর্শন হয়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ একথা আমাদের শাস্ত্রে আছে। কিন্তু সে অনুভব কল্পনা অথবা স্বপ্ন নহে। যাহা সত্য এবং প্রত্যক্ষ অনুভব ও কেবল তাহাই। আমার এই অবস্থাকে কেমন মনে হয় তাহা বলিতেছি। যেন একস্থানে নানা প্রকার পদার্থ পচিয়া সার প্রস্তুত হইল সেখানে কোথা হইতে বীজপতিত হইল, ক্রমে জল সেচনাদি দ্বারা আলোক উত্তাপ বায়ুর সাহায্যে তাহা হইতে একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল; বৃক্ষ পল্লবিত হইল অতঃপর এক মনোহর মধু মাসে তাহাতে মুকুল হইল। অবশেষে দিব্য পরিমল বিভূষিত একটী পুষ্প সঞ্জাত হইল। পুষ্পকে ধর্ম্ম

স্থানীয় মনে করুণ। পুষ্পটী বৃক্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় সর্ব্ব-সার-ভূত সর্ব্বশেষ পরিণতি; উহাতে যত কিছু উপাদান আনীত হইয়াছিল তাহার সকলেরই অংশ অংশ কেন শ্রেষ্ঠতম; চেষ্টা রহিয়াছে তবে না ফুল ফুটিয়াছে? এখন গুছাইয়া বলিলে বলিব, সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠতম এবং পরিপূর্ণ পরিণতি ধর্ম্ম। উহা বৃত্তি বিশেষের অনায়ত্ত কি অপরিমিত বিকাশ নহে। উহা কেবল সত্য দ্বারা বিধৃত, উহাতে জড়ীয় কল্পনা স্থান পাইতে পারেনা। উহাতে ইন্দ্রিয়ের সুখ বাসনা অথবা পরিতৃপ্তির ছায়া পাত করাও অন্যায়। অসংযম ধর্ম্ম নহে, মিথ্যায় ধর্ম্ম থাকিতে পারেনা, কারণ মিথ্যা আমাদের আত্মসিদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃতি নহে। হিংসায় ধর্ম্ম থাকিতে পারেনা। কারণ হিংসা আমাদের স্বাভাবিক প্রেম প্রবণতার বিরোধী অবস্থা। ঘৃণায় ধর্ম্ম নাই কারণ উহাতে অহঙ্কারের পূর্ণ প্রভাব আর অহঙ্কার একটী অতি ভয়ঙ্কর। অধীনতা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম আত্মানুভব সিদ্ধ উহা প্রমাণের বিষয় নহে উহার সত্যতা সে নিজেই। সত্যের প্রমাণ সত্য নিজেই, অসত্যের প্রমাণ অসত্য নিজেই। ধর্ম্মলাভ সহজে হয় না স্বাধীন না হইলে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্ম না হইলে স্বাধীন হয় না। সমস্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ না করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

শ্রী—

উপায় কি?

—:০:—

নমোঽকিঞ্চন নাথায় নমোঽমৃত নমোঽভয়।
ভুবন্ ভবাব্ধি কাণ্ডারিন্ ভবভীতি হরায় চ॥
নমো ভক্তবৎসলায় নমো ভুবন মোহন।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥

নানা প্রকার পাপ তাপ ময় সংসারের কোলাহল হইতে যখনই একটু অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়—

সংসারে বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি যথেষ্ট ভোগ করিলাম বাল্যকালে খেলা ধূলা যৌবনের বিষয় পিপাসা বার্দ্ধক্যের বিশ্রাম ভোগ ইত্যাদি সমস্তই হইল ক্রমে জরা আসিয়া দেহ আক্রমণ করিল সকলি হইল, কিন্তু, তবুও মনে একটা খট্‌কা রহিয়া গেল; এই সংসার দুদিনের জন্য ধন জন বিষয় বৈভব কেহই চিরস্থায়ী নহে, কেহই তোমার সঙ্গে যাইবেনা। যে অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছ; দুদিন পরে যদি সমস্তই হারাইতে হইবে তবে তাহার জন্য এত মায়া করিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ তোমাকে যে কখন ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, কেননা,—

নলিনী-দলগত-জলমতি-তরলম্।

তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্॥

তখন বিষয়ের জন্য সদাসশঙ্কিত ভাবে কাল যাপন করা অপেক্ষা আর কষ্টকর বিষয় কি আছে? মরণ এক সময়ে আসিবেই আসিবে তখন কে তোমার সঙ্গে যাইবে তাহার সম্বল কিছু করিলে কি? জীবন তরী একটানা ভাটায় পড়িয়া অবিরাম গতিতেই চলিয়াছে সম্মুখে ভীষণ আবর্ত্ত ঐ আবর্ত্তে পড়িলে আর রক্ষা নাই কিন্তু সকলের চক্ষু মোহতমশাচ্ছন্ন, কেহ দেখিয়াও দেখিলনা, অথচ প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই নৌকা সেই ভয়ঙ্কর আবর্ত্তের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতেছে, নৌকার গতি কিন্তু ফিরিলনা বোধ হয় আর নৌকা রক্ষা হইল না, এক্ষন উপায় কি?

মানব! ভীত হইও না, উপায় তোমার নিকটেই রহিয়াছে। কিন্তু তুমি এতক্ষণ সে উপায় অবলম্বন না করিয়া ভ্রমান্ধকারে পড়িয়া উন্মার্গগামী হইয়া ছিলে। এখন সে উপায় অবলম্বন কর সেই কাণ্ডারী সেই কৃপাময় ভব সাগরের কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ কর নৌকার গতি ফিরিবে নৌকা রক্ষা হইবে। জীব! বলিতে পার কি কে সেই কাণ্ডারী?

জীব! তুমি চক্ষুতে মায়ার ঠুলি লাগাইয়া বসিয়া আছ। তরণীর কাণ্ডারী যে তোমার নিকটেই অবস্থিত। কিন্তু তুমি দেখিতে পাইতেছনা। মায়ার ঠুলিটা চোখ হইতে খুলিয়া ফেল, তখন দেখিতে পাইবে॥

জীব! "মুক্তি" "মুক্তি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কোথাগেলে মুক্তি পাই।" "কোথা গেলে মুক্তি পাই" এই বলিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়াছ। কিন্ত

তুমি দেখিতে পাইতেছনা। জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন কর। ওই যে তোমার সাত রাজার ধনমানিক তোমারই নিকটে দাড়াইয়া রহিয়াছেন।

জীব! তুমি মরীচিকা ভ্রান্ত পথিকের স্থায় "ঐ জল" ঐ "জল" করিয়া অবিরাম গতিতে ছুটিয়া যাইতেছ কিন্তু কখনও জলের নিকটও আসিতে পারিতেছনা। চোখের ঠুলি খুলিয়া ফেল, দেখিবে উহা জল নয়, তীব্র হলাহল তোমাকে দূর হইতে প্রলুব্ধ করিতেছে আর আশে পাশে নিরাশা রাক্ষসী অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া বেড়াইতেছে। তুমি দেহের যাতনা জুড়াইবার জন্য শান্তি বারির অন্বেষণ করিতেছ। কিন্তু দেখিতে পাইতেছনা, তুমি যে ক্রমেই জলন্ত অগ্নি রাশির মধ্যে আসিয়া পড়িতেছ! ওই তোমার পাশে সুশীতল সুবিমল শান্তিবারি! কিন্তু তুমি ফিরিয়াও চাহিতেছ না, তুমি কেবলই মায়াবিনী মরীচিকার আবিষ্কারেই ছুটিয়াছ! ঐ শান্তি বারিতে একটা ডুব দিয়া আসিতে পারিলেই দেহ সুশীতল হয়, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনার নিবৃত্তি হয়। ফিরিয়া চাও, জ্ঞান চক্ষুতে চাহিয়া দেখ!

মানব! তুমি পূতিগন্ধময় ভব কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আর্তনাদ করিতেছ? কে তোমার বন্ধন মোচন করিবে?

হে ভ্রান্ত মানব! হরিকে ডাক, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবেন, কারণ তিনি দয়াময়। তিনি তোমার বন্ধন মোচন করিয়া দিবেন। তিনি তোমাকে মরীচিকা হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তিবারি দেখাইয়া দিবেন, কারণ তিনি ভক্তবৎসল। তখন মুক্তি তোমার দ্বারের ভিখারী হইবে। একবার সেই পতিত পাবন সই দয়াময় সেই দীনবন্ধু হরিকে ডাক? একবার হরি হরি বল॥

দীন—শ্রীনিশিকান্ত ভৌমিক।

প্রতিশোধ।

—:•:—

রমনী মোহন এক জন ধনীর সন্তান। তাঁহার প্রাসাদ অতি সু-বিস্তৃত এবং বহুমূল্য আসবাবে সুশোভিত। প্রাসাদের পশ্চাৎ ভাগে বিস্তৃত

উদ্যান বাটী; প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় রমণী বাবু উদ্যান বাটীতে যাইয়া সমস্ত রাত্রি আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করেন। প্রাসাদের চতুর্দ্দিক কম্পাউণ্ড; কম্পাউণ্ডের এক পার্শ্বে অশ্বশালা, অপর পার্শ্বে গোশালা; এইরূপ কত শত বিবিধ প্রকার পশু পক্ষী তাঁহার বাস ভবনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, তাহার কে নির্ণয় করিতে পারে? দাস দাসীর ত অভাবই নাই। এইরূপে ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া রমণী বাবু কালাতিপাত করেন।

এক দিবস রাত্রে উদ্যান বাটী মধ্যে বন্ধুবর্গ সহ রমণী বাবু আমোদে বিভোর হইয়া আছেন, নাচ গান খুবই চলিতেছে এবং সময়ে সময়ে 'বাহবা' ধ্বনি উত্থিত হইয়া নৈশ কালীন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গগন মার্গ নিনাদিত করিয়া তুলিতেছে। ঘড়িতে ঠং করিয়া একটা বাজিয়া উঠিল। তখন নাচ গান বন্ধ করিয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত রমণী বাবু আহারে বসিলেন। আহারে বসিয়া নানারূপ হাস্য পরিহাস চলিতেছে, গল্পের পর গল্পের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল "দেখুন রমণী বাবু! আপনার এই উদ্যান বাটীটী বড়ই সুন্দর বেশ নির্জ্জন, চতুর্দ্দিকে যত দূর চক্ষু যায় ততদূর মুক্ত জমি; কি দিব্য ও রমণীয় দৃশ্য! কিন্তু মহাশয় চাঁদের মধ্যেও কৃষ্ণবর্ণ রেখা থাকিয়া চাঁদকেও কলঙ্কিত করিয়াছে। আপনার বাগান বাটীর নিকট কোনও ঘর বাটী নাই, সমস্তই আপনার মুক্ত জমি। কেবল ঐ যে কুঁড়ে ঘরটী ঠিক আপনার এই উদ্যান বাটীর পার্শ্বেই সংলগ্ন রহিয়াছে, কেবল মাত্র ঐ কুঁড়ে ঘরটীর নিমিত্ত আপনার বাগানের সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। এটী যদ্যপি না থাকিত তাহা হইলে এই উদ্যানের চতুর্পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত জমি উদ্যান বাটীকে আরও সুন্দর ও মনোরম করিয়া তুলিত। তা আগেই বলিয়াছি চাঁদের মধ্যেও কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে। সেই জন্য বলি ইহাতে বড় কিছু আসে যায় না, তবে এমন সুন্দর প্রাসাদের সংলগ্নেই ঐ বিশ্রী কুঁড়ে ঘরটী না থাকিলে আপনার উদ্যানের শোভা আরও দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইত ইহা আমি শতবার বলিব।" তখন সমস্ত বন্ধু বান্ধব বলিয়া উঠিল "ঠিক বলেছ ভাই, আমরাও রমণী বাবুকে ঐ কথা বলি বলি করিয়া মনে করিতেছিলাম তা তুমিই বাবুকে বলিয়া ফেলিলে। রমণী বাবু, যদ্যপি কোনরূপে ঐ কুঁড়ে ঘরটী ঐস্থান হইতে সরাইতে পারেন

তাহা হইলে এই বাগানটী বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও সুন্দর হইয়া উঠিবে।

ঠং ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিল। একে একে সকলে নিজ নিজ আলয়ে চলিয়া গেল। রমণী বাবুও স্বীয় শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু রাত্রে নিদ্রাদেবী তাঁহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিলেন না। কিরূপে ব্রাহ্মণের কুঁড়ে ঘরটী তথা হইতে স্থানান্তরিত করিবেন এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। কি উপায়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, কিসে তাঁহার উদ্যান বাটী অধিকতর সুন্দর হইবে, কেবল ইহাই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। নানারূপ দুশ্চিন্তার পর রমণী বাবু গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর ভৃত্য দ্বারা উক্ত ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রমণী বাবু তাহাকে তাহার বাস ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সাহায্যও করিবেন বলিলেন। ব্রাহ্মণ এই প্রস্তাবে কোনরূপেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ইহাতে রমণী বাবু ব্রাহ্মণের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্রাহ্মণের উপর প্রত্যহ এরূপ উপদ্রব্যাদ আরম্ভ করিলেন ব্রাহ্মণ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দরিদ্র ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে তৎপ্রতি সাহানুভূতি প্রকাশের আশা করিতে পারে না। কারণ দরিদ্র ব্যক্তির দুঃখে দুঃখিত হইয়া তৎপ্রতি সাহানুভূতি প্রকাশ করিবার লোক এই মরজগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। রমণী বাবুর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার ব্রাহ্মণীকে কহিলেন "দেখ, আমরা আর রমণী বাবুর অত্যাচার সহ্য করিতে পারিনা; বলিতে কি আমরা বার্দ্ধক্যেও উপনীত হইয়াছি। চল আমরা দুই জনে নিকটবর্ত্তী কোনও অরণ্যে যাইয়া তথায় পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া সুখে কালাতিপাত করি। তিনি যদ্যপি দিন দেন তবে ইহার প্রতিশোধ একদিন তুলিয়া হৃদয়ের সকল জ্বালা দূর করিব।" ব্রাহ্মণীও ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাহার পর একদিবস ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী স্বীয় বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্য মধ্যে পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং দুই জনে ভগবানের নাম জপ করিয়া তথায় সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগি-

লেন। এদিকে রমণী বাবু ব্রাহ্মণের কুঁড়ে ঘরটী ভগ্ন করিয়া স্বীয় উদ্যান বাটীর সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধু বান্ধব সহ তথায় আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের নিকট আপনাকে অতিশয় চতুর ও প্রতাপান্বিত বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। বেচারা ব্রাহ্মণের যে কি দুর্দ্দশা হইল, কোথায় যাইল, বাঁচিল কি মরিল হায়! এই চিন্তা ক্ষণিকের নিমিত্ত ভ্রমেও তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পাইল না।

দুই তিন মাস গত হইলে একদিবস রমণী বাবু কয়েক জন সঙ্গীসহ শীকারান্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীগণ সকলেই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন; শিকার করিতে করিতে রমণী বাবু তাঁহার দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যাদেবীর ধীরে ধীরে আবির্ভাব হইতেছিল। রমণী বাবু শীঘ্রই পথ ভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় বহির্গমনোপায় স্থির করিতে পারিলেন না এবং তন্নিমিত্ত কেবল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে জলের নিমিত্ত তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও একবিন্দু জল তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল না। তমসাবৃত অরণ্য মধ্যে একে পথ ভ্রষ্ট, তাহার উপর তৃষ্ণার্ত্ত; রমণী বাবু বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে অথচ তৃষ্ণাদূরীকরণার্থ কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া রমণী বাবু সেই অরণ্যস্থিত এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "এখানে কে আছে আমাকে রক্ষা কর। এই ভীতি পূর্ণ অরণ্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর; তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, এক পাত্র জল দিয়া আমাকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা কর। বড় তৃষ্ণা, প্রাণ যায়। উঃ কি যাতনা। জল, জ-ল, জ-অ-ল।" রমণী বাবু আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। মূর্চ্ছিত হইয়া তথায় পড়িয়া গেলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ! রমণী বাবু কর্ত্তৃক সেই লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে আপনাদের স্মরণ আছে কি? তাঁহারা স্বামী স্ত্রী দুই জনে এই নির্জ্জন ও শান্তিপদ অরণ্য মধ্যস্থ এক জীর্ণ পর্ণ কুটীরে দিনাতিপাত করেন। তাহারা রমণী বাবুর কাতর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্বর অনুসরণ করিল এবং কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে এক ব্যক্তি বৃক্ষতলে অজ্ঞানা-

বস্থায় পতিত রহিয়াছে। তাহার মুখ হইতে শ্বেতবর্ণ ফেন নির্গত হইতেছে। তাঁহারা ঐ ব্যক্তির অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে তাহাদের পূর্ব্বপরিচিত রমণী বাবু। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীকে এক কলস জল আনিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণী চলিয়া যাইলে ব্রাহ্মণ নতজানু হইয়া করযোড়ে ঈশ্বরকে কহিল দয়াময়! এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমরা কতই না প্রপীড়িত হইয়াছি, এই ব্যক্তি হইতে কতই না যাতনা ভোগ করিয়াছি। হে দীন-বন্ধু! তখন ইহার প্রতিশোধের নিমিত্ত তোমার নিকট দিবারাত্র প্রার্থনা করিতাম। আজ সত্যই তুমি প্রতিশোধ লইবার দিন দিয়াছ এবং আজ আমারও হৃদয় প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য করিতেছে। প্রতি-শোধ, অদ্য ভীষণ প্রতিশোধ লইব। প্রতিশোধ লইবার জন্য আমার হৃদয় অহরহ প্রতিহিংসানলে দগ্ধীভূত হইতেছিল। হে ভগবন্! আজ তুমি কৃপা-পরবশ হইয়া সেই দিন মিলাইয়া দিয়াছ। রমণী বাবু! আজ আমার প্রতিশোধ লইবার দিন। আপনি আপনার উদ্যান বাটীর শোভা বর্দ্ধনার্থ আমাদের জীর্ণ কুটীর খানি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। আজ আপনি নিরস্ত্র, পথভ্রষ্ট এবং আমার সম্পূর্ণ করায়ত্ত। প্রতিশোধ লইবার অদ্যই প্রকৃষ্ট দিন।"

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী কলসে করিয়া জল লইয়া তথায় উপস্থিহ হইলে দুই জনে মিলিত হইয়া রমণী বাবুর সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মুখে ও চক্ষে জলের ছিটা দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে মুখ বিস্তার করিয়া অল্প অল্প শীতল বারি পান করাইয়া দিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে রমণী বাবুর ধীরে ধীরে জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ায় চক্ষু উন্মিলিত করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বাকৃশক্তি রহিত হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন তাঁহার প্রাসাদ সংলগ্ন কুটীর বাসী সেই ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে এবং ব্রাহ্মণী তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। তখন তিনি কৃতজ্ঞতাভরে তাহা-দের উভয়ের নিকট তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের নিমিত্ত কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখুন রমণী বাবু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। সে

বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে আর কি হইবে? এখন আপনি সম্পূর্ণ অসুস্থ, আসুন আমাদের কুটীরে অদ্য রাত্রি অতিবাহিত করুন। পরদিন প্রাতে আপনাকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যের বহির্গমনপথ বলিয়া দিব; আপনি সেই পথে অক্লেশে আপনার বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন। এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক স্বীয় কুটীরে লইয়া গিয়া তাঁহার নিমিত্ত পৃথক শয্যা রচনা করিয়া দিলেন এবং তথায় রমণী বাবু শয়ন করিয়া নিশা যাপন করিলেন। পরদিবস প্রভাতে রমণী বাবু যখন গাত্রোত্থান করিয়া আপনাকে বেশ সবল ও সুস্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন তখন তিনি ব্রাহ্মণকে করযোড়ে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন "মহাশয় আপনার ব্যবহারে কি পর্য্যন্ত আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারে না। এখন বুঝিতে পারিতেছি আপনি দেবতুল্য, আপনার হৃদয় কত উচ্চ তাহা আমাসম নরাধমের চিন্তা করিবারও ক্ষমতা নাই। হায়, না জানিয়া আমি আপনার প্রতি কতই না অত্যাচার করিয়াছি, কতই না যাতনা দিয়াছি। আমি কি নিষ্ঠুর, কি পাষণ্ড। এই সকল অপরাধ সত্ত্বেও আজ যে আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণ দান দিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি আপনার নিকট কি বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব, এবং কি রূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা জানি না। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করুন, আমার পূর্ব্বকৃত সকল অপরাধ ভুলিয়া যান ইহাই আমার প্রার্থনা। আর আমি বাটীতে প্রত্যাগমন করিব না; আপনার আশ্রমেই জীবনের শেষাংশ আপনাদের চরণ সেবা করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। কৃপা করিয়া এ দীনকে চরণে ঠেলিবেন না।" এই বলিয়া রমণী বাবু ব্রাহ্মণের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া তাঁহার পদদ্বয় দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তুলিয়া সস্নেহে কহিল "মহাশয় অধীর হইবেন না আপনি যে আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আমি দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম। প্রসন্ন হইয়া তিনি সেই প্রতিশোধের দিন মিলাইয়া দিয়াছেন। আমি ত আপনার কিছুই উপকার সাধন করি নাই। আপনি আমার প্রতি যে কঠোর অত্যাচার করিয়াছিলেন, আমি আপনাকে বিপন্নাবস্থায় দর্শন করিয়া আপনার সেবা শুশ্রূষা

করিয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইয়াছি মাত্র। এইরূপ প্রতিশোধ লইতে আমার গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার হৃদয় শান্ত হইল। যান্, মহাশয়! আপনার নিজ ভবনে যান্। আপনার স্ত্রী পুত্র আপনার অদর্শনে কতই না চিন্তা করিতেছে।” তখন রমণী বাবু কোষ হইতে স্বীয় অসি উন্মুক্ত করিয়া কহিলেন, “দেব! তবে কি সত্যই এ দীনকে আপনার চরণ সেবা হইতে বঞ্চিত করিবেন? যদ্যপি নিতান্তই আমাকে বাটী ফিরিতে হয় তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদ্যপি আপনি স্বপরিবারে আমার সহিত আমার বাস ভবনে পদার্পণ না করেন তাহা হইলে শ্রবণ করুন; এই যে উলঙ্গ অসি দেখিতেছেন এই অসি সাহায্যে আমার স্বীয় শির আমার ধর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার চরণে বিলুণ্ঠিত হইবে।” ব্রাহ্মণ কি করেন, অগত্যা তাঁহার বাটীতে যাইবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। তখন রমণী বাবু, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তিন জন একত্রে রমণী বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীর সকলে রমণী বাবুর সহিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল; কিন্তু রমণী বাবু কাহাকেও কিছু না কহিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার উদ্যান বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এবং সমগ্র উদ্যান ও উদ্যান বাটী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। উক্ত দিবস হইতে রমণী বাবু যাবতীয় ভোগ বিলাস ও বন্ধু বান্ধবের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সেবাদি করিতে লাগিলেন। এবং তন্নিমিত্ত আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিলেন। ধন্য ব্রাহ্মণ ধন্য তোমায়, ধন্য তোমার প্রতিশোধের। লোকে যেন তোমার ন্যায় উচ্চ হৃদয় লাভ করিতে পারে, জগৎ যেন তোমার প্রতিশোধের ন্যায় প্রতিশোধ লইতে শিক্ষা করে। শ্রীচুনীলাল চন্দ্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহক মহোদয়গণ। সৎপ্রসঙ্গ লেখক মহাত্মা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ কোনও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ব্যস্ত থাকায় ২ মাস যাবৎ সৎপ্রসঙ্গ লিখিতে পারিতেছেন না আগামী ভাদ্র মাস হইতে যাহাতে রীতিমত সৎপ্রসঙ্গ প্রকাশ হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্নশীল থাকিব কেহ হতাশ হইবেন না। অন্যান্য ক্রমশঃ প্রবন্ধ ও ক্রমান্বয় ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশিত হইবে। বিনীত ঃ—প্রকাশক।

নিত্যধামগত প্রেমিক ভক্ত প্রবর

দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

—:০:—

(জীবনী-প্রসঙ্গ।)

(২)

ছাত্র জীবন।

প্রাচীন আর্য্য সন্তান দিগের পাঠদশায় গুরু গৃহে বাস কালে, যে সংযম, যে ব্রহ্মচর্য্য, যে সরলতা, জীবনকে মধুময়, আনন্দময়, পবিত্রময় করিয়া তুলিত, দীনবন্ধুর ছাত্র জীবনেও সেই ভাব বিকশিত হইয়াছিল তাঁহার অসাধারণ বিদ্যানুরাগ, জ্ঞান লাভের জন্য অবিচলিত একাগ্রতা, হাসি মুখে সহস্র প্রতিকুল অবস্থাকে আয়ত্তাধীন করা, চিত্তের সুদৃঢ় একনিষ্ঠতা বলে, অর্থাভাব বা অন্যবিধ অভাবকে বিদ্রূপ করিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া, প্রভৃতির কথা আলোচনা করিলে, বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

যৌবনে, যখন পুর্ণেন্দু-উদয়ে উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গের ন্যায়, মানব দেহে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল, সতেজ হইয়া ঘোর মানসিক পরিবর্ত্তন করে, যখন চিত্ত ভোগ-বিলাসের দিকে স্বভাবতই ধাবিত হয়, যখন প্রাণে একটা অভি নব সুখের বাসনা জ্বলিয়া উঠে, সেই সময়—জীবনের সেই মহা সন্ধি স্থলে উপনীত হইয়া প্রকৃত সৎপথাবলম্বী হওয়া, মনুষ্যত্বের আদর্শ অনুসরণ করা, ও চিত্তকে শত মুখ প্রলোভনের কবল হইতে উর্দ্ধে-উন্নত করা, সহজ সাধ্য নহে। কিন্তু দীনবন্ধু সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সাগর গামিনী তটিনীর ন্যায়, তাঁহার চিত্ত-প্রবাহ, জ্ঞানাম্বুধির অন্বেষণে উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল। সে প্রবাহ—বাধা মানে না, বিঘ্নে বিমুখ হয় না।

এই নব যৌবনে, বিশেষতঃ বিবাহের পরেও—দীনবন্ধু, মানব জীবনে উপযোগী জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া, যে ভাবে, দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং

ভবানীপুরের বরদা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট তিনি যে কাব্য শাস্ত্র আলো-
চনা করিতে আসিয়া ছিলেন, তাহাও বলা হইয়াছে।

ভবানীপুরে, উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাটীতে তিনি বাস করিতেন।
এই নব আবাস স্থানে আগমনের অল্প কাল পরে, কোন এক জোৎস্নাময়ী
রজনীতে, যুবক দীনবন্ধু ছাদের উপর বসিয়া, উন্মুক্ত প্রকৃতির উজ্জ্বল চিত্র
দর্শনে আনন্দ চিত্তে বিহ্বলিত মধুর কণ্ঠে আনন্দময়ের আনন্দ লীলামৃত গান
করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু বাহ্য প্রকৃতির আনন্দের সহিত অন্তরের আনন্দ
অনুভব করিয়া, তন্ময় হইয়া গেলেন। ভাবের ভোরে যে প্রাণ মাতানো মধুর
স্বর, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইতেছিল, তৎশ্রবণে বিদ্যারত্ন ও তাঁহার
পত্নী মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায়, ভাবোন্মত্ত দীনবন্ধুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
সে তো সাধারণ গীত নহে, সে যে প্রাণের টান্, আকুল আহ্বান, অব্যর্থ
সন্ধান। তৎশ্রবণে, শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয় যে আকর্ষিত হইবেন ইহাতে আর
সন্দেহ কি?

এমন মন প্রাণ বিমোহনকারী, মধুর কীর্ত্তন দীনবন্ধুকে শিখাইল কে?
কে ওস্তাদ রাখিয়া, কত রসের, কত টপ্পা, প্রভৃতি বৈঠকী সুরের সাধনা
করে; যন্ত্র যোগে সকল সঙ্গীত শুনিতে মিষ্ট লাগিলেও,—"কাণের ভিতর
দিয়া মরমে" প্রবেশ করেনা। যতক্ষণ শুনি, ততক্ষণ উহা মিষ্ট লাগে;
কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলে, বা মানসিক অবসাদ উপস্থিত হইলে সে সকল
সঙ্গীত মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেনা। কিন্তু দীনবন্ধুর,
ভাবময়ী সঙ্গীতের প্রভাব এরূপ মর্ম্ম স্পর্শী, এমন চিত্ত বিনোদনকারী ছিল
যে, তাহা একবার যাহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে—ই আত্মহারা হই-
য়াছে, ভাবে তন্ময় হইয়াছে, গায়কের চরণ রেণু স্পর্শে আপনাকে কৃত
কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত, দীনবন্ধুর মধুর সঙ্গীত,
শ্রোতৃবর্গের মনের উপর অপূর্ব্ব আধিপত্য বিস্তার করিত। সে গীত
শ্রবণে, ভক্তের প্রাণে আরাধ্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বিকশিত হইত, তৃষিত,
তাপিত মায়া মুগ্ধ জীবের প্রাণে, এক অননুভূত আনন্দের উদয় হইত।
যে একবার মাত্র সে গীত শ্রবণে ধন্য হইয়াছে, সে তাহা ভোলে নাই,

ভুলিতে পারেনা; তাহার হৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে সে সুধা মাখা স্বরলহরী প্রতি ধ্বনিত হইতেছে।

অনেকে হয়তো বলিবেন, ছাত্র জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে সঙ্গীতের কথা কেন? তদুত্তরে আমরা বলিব, বীণাপাণির বরপুত্র দিগের নিকট সঙ্গীত ও একটী সাধনার অঙ্গ। গানে প্রাণের তাপ শীতল হয়,—কাতর প্রার্থনায়, প্রাণের আকুল আহ্বানে, আনন্দ ময়ের আনন্দ প্রবাহ আকর্ষিত হয়। সঙ্গীতে সে মধুর রস আস্বাদিত হয়, আর ভাব ঢল ঢল নৃত্যে সে অনুভূতির বাহ্য বিকাশ হয় মাত্র।

দীনবন্ধুর বাল্য জীবনে এই গীত সাধনা বৃত্তি অন্যান্য বৃত্তি বিকাশের সঙ্গে কেমন স্বাভাবিক ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এই সঙ্গীত সাধনা বৃত্তিও, উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি নিজের মনের ভাবগুলি সরল প্রাণের পবিত্র উচ্ছ্বাস গুলি, নিজের ভাষায় প্রকাশ করিয়া গীত রচনা করিতেন; আর বংশ খণ্ড ও নারিকেল মালা যোগে, স্বহস্তে "একতারা" যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া গান করিতেন। তাঁহার ছাত্র জীবনে রচিত সেই পবিত্র ভাব পূর্ণ গীত গুলি, বর্ত্তমান কালে "উপাসনা-সঙ্গীত" নামে প্রকাশিত হইয়াছে, আর তাঁহার সেই স্বহস্ত নির্ম্মিত "একতারা" যন্ত্রটী এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই "উপাসনা সঙ্গীত" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, দীনবন্ধুর ছাত্র জীবনে, নব-যৌবন-কালে, কি পবিত্র ভাবের ছায়াপাত হইয়াছিল। আদর্শ ব্রাহ্মণের হৃদয়, কেমন সরল ভাবে, আত্মবিকাশের পথে পরিচালিত হইয়াছিল।

ভবানীপুরের বরদা বিদ্যারত্ন মহাশয়, দীনবন্ধুর সেই প্রাণোন্মাদিনী সঙ্গীত সুধা পান করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। বিশেষতঃ সেই রাত্রে সেই গীত শ্রবণে, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আত্মীয় বিয়োগ জনিত নব-শোক বিদূরিত হইল, এবং সেই দিন হইতে তিনি দীনবন্ধুকে অপত্য স্নেহে প্রতি পালন ও পরম যত্নে কাব্য শাস্ত্রাদি পাঠ করাইতে লাগিলেন।

মেধাবী দীনবন্ধু অতি অল্প কাল মধ্যে, কাব্য শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া সংস্কৃত কলেজে পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তদানীন্তন নিয়ম

অনুসারে, এক বৎসর ধরিয়া এক পণ্ডিতের নিকট কাব্য পাঠ না করিলে কেহ উপাধি পরীক্ষায় প্রবেশ অধিকার পাইত না। এদিকে দীনবন্ধু মোটে ছয় মাস কাল পাঠ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং তখন তাঁহার উপাধি পরীক্ষা দেওয়ার, ইহাই এক প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। কিন্তু দীনবন্ধু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সেই বৎসর তিন যেমন করিয়াই হউক পরীক্ষা দিবেন। এবং এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার মানসে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক, মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে আপন মনোভাব জানাইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়, দীনবন্ধুর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও সেই বৎসর সংস্কৃত কলেজের কাব্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "কাব্যতীর্থ" উপাধি লাভ করিলেন।

তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। এই বয়সে দীনবন্ধু, ন্যায়, স্মৃতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া, দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। হিন্দু-দর্শন পাঠ না করিলে, ধর্ম্মে উচ্চ অঙ্গ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আর মানুষ যদি আত্ম জীবনে উদ্দেশ্য না বুঝিল, যাহা ধারণ করিয়া আছে বলিয়া তাহার অস্তিত্ব, তাহা সম্যক্ তত্ব না বুঝিল, তাহা হইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। দীনবন্ধু এমন সাধের মানব জন্ম, বৃথা অপব্যয়িত হইতে দিলেন না। যেখানে ও যাঁহার কাছে যাইলে, ধর্ম্ম শাস্ত্র বিশেষ রূপে পাঠ করিতে পারিবে বলিয়া তাঁহার ধারণা হইত, যে সাধক বা যোগী পুরুষের কৃপালাভ করিলে ধর্ম্ম জীবনের সহায়তা হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইত, তিনি তৎক্ষণা তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইতেন ও অবনত মস্তকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্র করিতেন। শত বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রাহ্য করিতেন না, সং অভাবকে উপেক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মণোচিত ধৈর্য্য সহকারে অভীষ্ট সাধনে অ সর হইতেন। তাঁহার ছাত্র জীবনের কাহিনী, তিনি স্বয়ং প্রত্যহ সংস্কৃ ভাষায় একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। বিদ্যাভ্যাসের দিন হইতে আ করিয়া পাঠ শেষ পর্য্যন্ত, তাঁহার জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হই তাহা এই সংস্কৃত "ডায়েরী" বা দিন কাহিনীতে লিপিবদ্ধ ছিল।

বিষয় উহা এখন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া, আমরা তাঁহার ছাত্রজীবনের ঘটনা বিস্তৃত ভাবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলাম। আপনাদের আনন্দ বিধানার্থ।

তাঁহার একাগ্রতা, তাঁহার ধৈর্য্য, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার অতুল অধ্যবসায় প্রভৃতির পরিচায়ক একটী মাত্র ঘটনা এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিব। তিনি যখন, ব্যাকরণ পাঠ করিতেছিলেন তখন তাঁহার পুস্তকের অভাব হয়; হাতে অর্থ নাই, অর্থ না হইলে পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব পর নহে। সুতরাং দীনবন্ধু কোন অধ্যাপকের নিকট গমন করিয়া পুস্তক প্রার্থনা করেন। যে কোন কারণে হউক, উক্ত অধ্যাপক মহাশয়, পুস্তক দিতে সম্মত হইলেন না। তখন সেই মেধাবী দীনবন্ধুর আত্ম-নির্ভরতা শক্তি উদ্দীপ্ত হইল; তিনি ভাবিলেন এই পুস্তকের অভাবে তাঁহার পাঠাভ্যাস কখনও বন্ধ হইতে পারিবেনা। সামান্য অর্থাভাব কি কখন ও তাঁহার মনের সৎ প্রবৃত্তিকে স্তব্ধ করিয়া রাখিতে পারে? দীনবন্ধু সে অভাবকে উপেক্ষা করিবার এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ঐ অধ্যাপক মহাশয় যখন ব্যাকরণ পড়াইতেন, তখন তিনি টোলের পার্শ্বের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন ও মনযোগ সহকারে অধ্যাপক মুখ নিঃসৃত সূত্রাবলি শ্রবণ করিতেন। মেধাবী দীনবন্ধু অপূর্ব্ব স্মৃতি শক্তি বলে, একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহাই মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। এইরূপে নিত্য যাহা শুনিয়া আসিতেন, তাহা পদ্ম পত্রে লিখিয়া রাখিতেন। অর্থাভাবে কাগজ ক্রয় করিতে না পারিলেও, তাহার অধ্যবসায় প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। তিনি জানিতেন মনের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। এবং প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে কৃপণতা নাই। এই উদ্দাম উৎসাহ, এবং আত্ম নির্ভরতা বলে, তিনি পদ্ম পত্রে, সমগ্র "গণ-মালা" এবং বকুল-বল্কলে "কলাপ ব্যাকরণের" অধিকাংশ লিখিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত পুঁথি দুই খানি এখনও তাঁহার স্বভবনে যত্নে সুরক্ষিত হইতেছে।

আজকাল, ছাত্র জীবনে যে বিলাসিতা প্রবেশ লাভ করিয়া, দেহ ও মন ক্ষয় করিতেছে, তাহা তিনি একেবারে ঘৃণা করিতেন। তিনি ভাবিতেন একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য ছাত্র জীবনের আদর্শ। তিনি স্বয়ং বাল্যাবধি এই

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কোনরূপ ক্লেশ বোধ হইত না; হাসি মুখে দারুণ পরিশ্রম করিতেন, বিপদ হইলে, দৃঢ়চিত্তে তাহাকে উপেক্ষা করিতেন। সামান্য ধুতি চাদর পরিধান করিয়া, দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, তাঁহার শরীরে যে তেজছিল, হৃদয়ে যে বল ছিল, তাহা আজকাল কয়জন ছাত্রের দেখিতে পাওয়া যায়? একবার কোটালি পাড়ায় কোনও গ্রামে অবস্থান কালে তিনি লোক মুখে তাঁহার পিতার অসুস্থতার সংবাদ পান। তখন রাত্রিকাল তাহাতে আবার দারুণ বর্ষায় চারিদিকে জল বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু দীনবন্ধু পিতৃ অসুস্থতার সম্বাদ শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই বাটী যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীরা ও গ্রামের অন্যান্য লোক, তাঁহাকে কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া যাইতে বলিলেন, কারণ তখন নৌকা বা অন্য কোন যান পাইবার সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু আত্ম-নির্ভর-শীল, ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী দীনবন্ধু সে নিষেধ বাক্য না শুনিয়া সেই রাত্রে কোটালি পাড়া হইতে একাকী হরি-সোনা গ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন, পিতৃ সন্দর্শনে জন্য তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল, সুতরাং নৌকার অভাবে, তিনি সন্তরণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল পার হইয়া স্বভবনে গমন করিয়াছিলেন। সামান্য আতপ তণ্ডুল ও কদলী সিদ্ধ ভক্ষণ করিয়া ছাত্র দীনবন্ধুর শরীরে এত বল ছিল! আর আজকালের ছাত্রেরা মৎস্য, মাংস ও কত তেজস্কর দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াও, সামান্য ক্ষণ, উন্মুক্ত বায়ু সেবন করিলে, গলায় ব্যাথা হয়।

এই, অধ্যবসায়, আত্ম নির্ভরতা ও উৎসাহ বলে, যুবক দীনবন্ধু কাব্য, সাহিত্য, প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া বেদান্ত পাঠ করিবার জন্য, প্রথমে ৺কালীঘাট নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পরম বাগ্মী পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তথায় সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, "বেদান্ত রত্ন" উপাধি লাভ করেন। এই বেদান্ত পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি বেদান্ত পাঠ করিতে করিতে, সময়ে সময়ে ভগবদ্ভক্তি ভাবে এরূপ উন্মত্ত হইতেন যে, চতুষ্পাঠীর প্রাঙ্গনে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়া, মধুর রস আস্বাদে হৃদয় সুশীতল করিতেন।

বেদান্ত পাঠের পর, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন পাঠ করিবার জন্য, তিনি বিশেষ ব্যগ্র হয়েন। এবং সেই উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য তিনি প্রথমে ৺কাশীধামে গমন করেন। তথায় সম্ভবতঃ দীনানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট প্রথমে সাংখ্য দর্শন পাঠ করেন। অবশেষে হরিদ্বারে গমন পূর্ব্বক তদানীন্তন কালের মহান্ত-সম্রাট পরম যোগী, কোনও স্বামীজীউর নিকট পাতঞ্জল যোগ-সূত্র অবগত হইবার বাসনা প্রকাশ করেন। এবং তাঁহার সাহায্যে হরিদ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গুহাবাসী কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই যোগী পুরুষের সেবা করিয়া, দীনবন্ধু, তাঁহার কৃপায় পাতঞ্জল যোগসূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম ও উপদেশ লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন। এই কৃপা লাভ সহজে হয় নাই। কয়েক মাস ধরিয়া সাধুর সেবা করিয়া, তিনি যখন প্রসন্ন হইতেন, তখন মধ্যে মধ্যে দুই একটী সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেন মাত্র। অবশেষে দীনবন্ধুর তিতিক্ষা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় একাগ্রতা, ও অন্তরের ব্যাকুলতা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া, অবশেষে ঐ যোগীবর, তাঁহাকে যোগ প্রকরণের গূঢ় রহস্য অবগত করাইয়াছিলেন। তাঁহাকে যে রূপ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই সাধুর সেবা করিতে হইয়াছিল তাহা শুনিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। সুদূর স্থান হইতে পর্ব্বত গুহা[illegible] কলসী করিয়া জল আনিয়া গুহাটী পরিস্কার করিতে হইত ও সাধুর মনস্তুষ্টি[illegible] জন্য অত্যধিক পরিমাণে কায়িকশ্রম করিতে হইত। এমন কি, সময়ে ফলাভাবে, কেবল বৃক্ষপত্র চর্ব্বণ করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিতে হইত তথাপি সাধু এক[illegible]টী কথা কহিতেন না; তাঁহার মনের ভাব, কেবল দীনবন্ধু[illegible] শিষ্যত্বের পরীক্ষা[illegible]। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বোধ হয় দীনবন্ধু এই পরি[illegible] শ্রম ও উপেক্ষা দর্শন করিয়া ভগ্ন মনোরথ হইয়া চলিয়া যাইবেন। কি[illegible] অবশেষে, দীনবন্ধু তাঁহার কপট পরীক্ষায় জয়লাভ করিলে, তিনি প্রস[illegible] য়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়